দ্বিতীয় অধ্যায়

নির্বাচিত গল্পকারদের নির্বাচিত ও বিশিষ্ট গল্পগুলির আলোকে রাঢ়ভূমির সমাজজীবন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা ছোটগল্পের উজ্জ্বল ধারাটি রবীন্দ্রনাথ-শরৎ চন্দ্রের সৃজন কৌশলের পথ পেরিয়ে উপনীত হয়েছে বিভূতিভূষণ-মাণিক ও তারাশঙ্করের সাহিত্য বাগিচায়। যদিও এই তিনজন বিভিন্ন পথে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন থেকেছেন। যেখানে বিভূতিভূষণ ছিলেন রোমান্টিকতার আবেশে অরণ্যপ্রেমী, মানিক মার্কসীয় ও ফ্রয়েডীয় চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী; সেখানে তারাশঙ্কর ক্ষয়িষ্ণু অতীতের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে বর্তমানকে গ্রহণ করার জন্য অপেক্ষমান ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের পরিচয় যেমন ব্যক্ত হয়েছে, সেখানে শরৎ সাহিত্যে সাধারণ মানুষেরা বর্ণনীয় হয়ে উঠেছে। আরো পরে প্রথম মহাযুদ্ধ পরবর্তী কল্লোল, 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'-র পৃষ্ঠায় সাহিত্যের রাজপথে অভদ্র ইতর জনের সমাবেশের ফলে সমাজের অনালোচিত ও অনালোকিত দিক ও বিষয়গুলি শিল্পের মর্যাদা পায়। নীচের তলার মানুষ সাহিত্যের পাতায় ঠাঁই পেয়ে নগরকেন্দ্রিক জীবনকাহিনীর বিপরীতে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি সাহিত্যের স্রষ্টা ও সৃষ্টি যেন একাকার হয়েছে। ব্রাত্য গোত্রহীন মানুষেরা (ডোম-বাউরি-বাগ্‌দী-কাহার-বেদে-সাঁওতাল) নতুন সাহিত্য সৃজনে জায়গা পেয়েছে।

তারাশঙ্করের সাহিত্য একদিকে আদর্শের কল্যাণময় ভাবলোকে বিস্তরণ করে, অন্যদিকে জীবনের প্রান্তভাগে ভূতলাশ্রয়ী বাস্তবতায় প্রকৃত আদর্শ উপস্থাপিত করেন। আসলে বিশ্বাসযোগ্য বাস্তবতায় একজন শিল্পী সাহিত্য আস্বাদনে স্বাভাবিক জীবনরস খুঁজে পান। টমাস হার্ডি আঞ্চলিক উপন্যাসের মধ্যে ওয়েসেক্সের পল্লী অঞ্চলকে যেমন সাহিত্য কর্ম হিসেবে বেছেছিলেন, তারাশঙ্করও তেমনি রাঢ় অঞ্চল ও তার বিচিত্র জনজীবনের মূল রহস্য অনুসন্ধানে মগ্ন থেকেছেন। তাঁর সাহিত্যের চরিত্রের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও চিত্রের দ্বন্দ্ব নেই। তাঁর সাহিত্য কর্মের মূল পটভূমি উত্তর রাঢ় অঞ্চল তথা বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও বর্ধমান জেলার সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক অঞ্চল। এই স্বক্ষেত্রে তিনি সম্রাট। এই অঞ্চলের ভেতরেই তিনি বিশ্বের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় এই অঞ্চলের মানুষজনের ছবি তাঁর গল্পে এঁকেছিলেন। কিন্তু রাঢ়ভূমির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, হতাশা-ব্যর্থতা, জৈব-কামনা-বাসনা-রুচির ঘনিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ী উপস্থাপন যথার্থভাবে দেখা যায় তারাশঙ্করের মধ্যে। শাক্ত ও বৈষ্ণব, শ্যাম-শ্যামার মিলন ক্ষেত্র হল বীরভূম, এখানে পঞ্চশক্তিপীঠ সহ শাক্ততীর্থ তারাপীঠ, আবার নিত্যানন্দের বীরচন্দ্রপুর-বৈষ্ণবতীর্থ ময়নাডাল এবং জয়দেব লালিত কেঁদুলী আজও মিলনক্ষেত্র। বীরভূমের এই প্রকৃতিগত ভূগোলের সাথে মিশে রয়েছে রাঢ়ের ইতিহাস ও রাঢ়ের মানুষদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের ছবি।

তারাশঙ্কর ছিলেন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ পরিপূর্ণ বিজ্ঞ এক মানুষ। তার জীবনে যে সব বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ ও তাদের জীবন ধারণের নানান সমস্যা প্রত্যক্ষ গোচর হয়েছে তারাই তাঁর সাহিত্যের

পাতায় ভিড় করেছে। আর সেই সব বিচিত্র পেশার ও বৈশিষ্ট্য মানুষদের তাঁর রচনায় মুখ্য স্থান দিয়েছেন। আত্মস্মৃতিতে তিনি বলেন—

> "জমিদার শ্রেণি ছাড়াও বেদে, পটুয়া মালাকার, লাঠিয়াল, চৌকিদার, ডাকহরকরা প্রভৃতি যারা সমাজের বিশেষ অংশ জুড়ে ছিল তাদের নিয়ে গল্প রচনা করবার প্রেরণাই হোক বা অভিপ্রায়ই হোক আমার মধ্যে এসেছিল; বোধ করি এদের কথা কেউ বিশেষ করে আগে লেখেন নি বা লেখেন না বলে।" [১]

রাঢ়ের লোকসাহিত্যের রসে পুষ্ট, লোককথা ও রূপকথার আবেষ্টনীতে ভৌগোলিক পটভূমিতে প্রতিভাত হয়েছে তারাশঙ্করের সাহিত্য সম্ভার। যেখানের রাঢ়ের রুক্ষ্ম লালমাটিতে মানস সন্তানেরা বাস্তবে পা ফেলে বিচরণ করেছে— ভৈরবী, রাধা, বসন, স্বর্ণ, পদ্মরা। তাছাড়া, সাপুড়ে, দরবেশ, বাউল, বাজিকর, কবিয়াল, কীর্তনিয়া, ঝুমুরিয়ারা শিল্পীর কলমে অমর রয়েছে। আবার অনিরুদ্ধ কামার, ছিরু পাল, দেবু বা জগন ডাক্তারেরা রাঢ় অঞ্চলের কাহিনির প্রতিনিধি হয়েও সর্বকালের সর্বস্থানের রক্তমাংসের মানুষের প্রতিনিধি হয়ে রয়েছে। শিল্পের চেয়েও শিল্পী বড়, জীবন বড় এই বিশ্বাসময় সত্যের মুখোমুখি হয়ে রাঢ়দেশের পটভূমিতে চরিত্রগুলির সাথে আন্তরিক সম্পর্কের বন্ধনে যে জীবন কথা তা যেন কথকতায় আজীবন লিখে গেছেন। তারাশঙ্কর দুচোখে যা দেখেছেন রাঢ় প্রকৃতিময় সামাজিক জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ ছবি তুলে ধরেছেন। সিউড়িতে বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তকে একবার বলেন—

> "আমার বই বলুন আর যাই বলুন, সেটা হচ্ছে আমার এই রাঢ় দেশ। এর ভেতর থেকেই আমার যা কিছু সঞ্চয়। এখানকার মানুষ এখানকার জীবন নিয়ে লিখেছি। তার বেশি আমার আর কিছু নয়।" [২]

তিনি সব সময়ই আপনার হৃদস্পন্দনের সঙ্গে রাঢ়ের হৃদস্পন্দন মিলিয়ে বিশ্বমানবেরই অন্য এক অভিন্ন প্রতিনিধি রূপে নিজেকে হাজির করেছেন। 'তারিণী মাঝি' গল্পের ময়ূরাক্ষী নদীকে একটি জীবন্ত চরিত্রের মতো দেখেছেন। জন্মসূত্রে জমিদারী রক্তকে ভুলে গিয়ে রুক্ষ্ম রাঢ়ের কাঁকর বিছানো মাটির রূঢ় বাস্তবতায় অতি সাধারণ মানুষের পাশে কাছের প্রিয় মানুষ হয়ে থেকেছেন। ফলে সাধারণ মানুষের নানান সমস্যার শরিক হয়ে আশা-ভালোবাসাকে উপভোগ করেছেন। তাই কাহার-বাউরী-নিঃস্ব-রিক্ত নারী-নাগিনীরা মিলেমিশে তাঁর চৈতন্যে ভিন্ন অনুভব ও সমাধানের সূত্র যুগিয়েছে। গল্পের বিষয় ভাবনা ও কাঠামোর চেয়ে বর্ণ বৈচিত্র্য প্রধান কিনা এ সম্পর্কে তিনি ৮ মার্চ, ১৯৩৭ সালে রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে বলেন—

> "গল্পের মধ্যে কি আখ্যান ভাগ থাকবে না ?— মানুষ থাকবে না, থাকবে শুধু মানুষের মনের একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস, অথবা পুলকিত দৃষ্টির একটি পলক ? ...সাহিত্যের আসরে স্থূল বলে তার আদর কম হবে ?" [৩]

অবশ্য এই সব প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই বলে দিয়েছেন। গল্পের ভেতর আখ্যান বৈচিত্র্য ও মানুষের রূপের নানান পক্ষপাতই সাহিত্য সৃজনের বিষয় ভাবনার মূল এলাকা বলে বিবেচিত। আর এই

পরিপ্রেক্ষিতে জীবনাভিজ্ঞতার সাথে শিল্পীর নির্মাণ কৌশল একচ্ছত্রে শিল্প রচনা করেছে। তাঁর ছোটগল্পের বিষয়ভাবনা ও শিল্পবোধের সংশয় দূর করে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে তাঁকে প্রশংসিত করেন—

> "কল্যাণীয়েষু,
>
> তোমার ছোটগল্পের কতকগুলি আমার বিশেষ ভাল লেগেছে— দু একটা আছে কষ্টকল্পিত। তোমার স্থূলদৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্মস্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমর বাঁধা ভান নেই। গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাওনি এতে খুশি হয়েছি। লেখার অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ। ইতি ১২.৩.৩৭, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" [৪]

বিশ্বকবির কাছে পাওয়া এই সম্মান যেমন আনন্দের তেমনি প্রেরণারও। তারাশঙ্করের গল্পের অন্তর্বয়নের সাথে বর্ণবৈচিত্র্য যেমন রয়েছে তেমনি নির্মাণ কৌশলে যে ঘাটতি ছিল না রবীন্দ্রনাথের কথায় তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকেই শিল্পীর সৃষ্টি সত্যরূপে উজ্জ্বল হয়, চিরন্তন হয়। জীবন মন্থনজাত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যখন সহানুভূতির রসে জারিত হয়ে প্রকাশ পায় তখনই তা বিশ্বাসযোগ্য রূপে সমাজে স্বীকৃতি পায়। মহৎ স্রষ্টার রচনায় সমাজ বিপ্লবের ছায়া ক্রিয়াশীল হয়। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনায় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন দেখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে মন্বন্তর দাঙ্গা, দেশবিভাগ, স্বাধীনতা ও স্বাধীনতাত্তোর কালপর্বে স্বাধীনদেশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেছেন। ফলে তাঁর সাহিত্যে সময় ও কালের নির্ভুল পদচিহ্ন রয়ে গেছে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনের ছবিকে তিনি বিশাল ক্যানভাসে ফুটিয়ে তুলেছেন। যুগের একজন প্রতিনিধি হয়ে নিরপেক্ষ স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি ও তার আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিমন্ডলে শিল্পের প্রকৃত স্বরূপকে সচেতন তথা স্বচ্ছন্দ ও সাবলিল বিন্যাস দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্য রচনায় বৃহত্তর পটভূমি ও সমাজ চিত্রণ উঠে এসেছে। গ্রামীণ সমাজের ছবি 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে যেমন রয়েছে, তেমনি 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথায়' আঞ্চলিকতা উঠে এসেছে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তে বেদের জীবনকাহিনির সাথে 'রাইকমল'-এ বৈষ্ণবীয় জীবনচর্যার পরিচয় ধরা রয়েছে। আবার নিম্নবর্গীয় সমাজের জীবনচিত্র 'কবি' উপন্যাস। লেখকের তীক্ষ্ণ সমাজদৃষ্টির পূর্ণ স্বাক্ষর উপন্যাসগুলির সাথে গল্পের মধ্যেও প্রতিফলিত। তারাশঙ্করের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তি ও বিশালতা বিস্ময়কর। চলমান জীবনের বিচিত্র সমাজকে তুলে ধরার পাশাপাশি অতীত ইতিহাসের ধূসর ছায়া ঘেরা সমাজকে 'গন্নাবেগম' উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। কেবল গ্রামীণ জীবন, নাগরিক জীবনের চিত্রকর নন, দেশজ হয়েও লেখক বিশ্বনাগরিক, নিজের কালের মানুষ হয়েও চিরকালের ব্যক্তিসচেতন পুরুষ। সাহিত্যের পটে কল্পনার রঙে যে ছবি তিনি আঁকেন— তা জীবনের রক্তিম উষ্ণতায় সর্বকালীন সত্য উপলব্ধিতে চিরায়ত হয়ে অনন্ত সত্যের বন্ধনে আটকে থাকে। আটপৌরে সাধারণ জীবন যে মানুষের, সেও আসলে মানব সন্তান। প্রকৃতি ও সমাজকে ভালোবাসার

গোপন রসায়নে তাঁর সৃষ্ট চরিত্র নিতাই কবিয়ালের খেদোক্তি— 'জীবন এত ছোট কেনে ?'— গ্রাম্য কবিয়ালের সমাজ প্রেক্ষিত থেকে সর্বজনীন জীবনসত্য দুঃখময়তায় আবেগ সর্বস্ব হয়ে যায়।

তারাশঙ্করের প্রতিটি গল্পে জীবনবোধের পরিচয় রয়েছে। ১৯৫০ সালে লেখা 'বাঙ্গাপূরণ' থেকে ১৯৭০ সালে লেখা শেষ গল্প 'সখী ঠাকরুণ' পর্যন্ত ৪৯টি গল্পের বিষয় ভাবনার শিল্পীত বাস্তবতার মহিমা উজ্জ্বল হয়েছে নানান টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে। গল্পে তত্ত্বের আধিক্যের সাথে কিশোরদের জন্য বেশ কিছু রচনা বার্ধক্যের শিল্প সম্পদ হয়েছে। বিচিত্র বৃত্তি, পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষজন লেখকের শিল্পের সম্পদ হয়েছে। বিশিষ্ট গল্পগুলির মধ্যে 'বাঙ্গাপূরণ' গল্পে যাত্রার সাতে যুক্ত বাউন্ডুলে বোষ্টম, 'ময়দান' গল্পে বৃত্তিহীন নারী, 'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা'য় সুদের কারাবারী বোষ্টম, 'বরফলাগের মাঠ'-এ তেভাগার চাষী ও জমিদার, 'বিষ্টু চক্রবর্তীর কাহিনী' তে যুক্তিবাদী ভদ্রলোক, 'হেডমাস্টার' গল্পে সনাতন আদর্শবাদী শিক্ষকের জীবনকথা, 'জন্মান্তর'এ জমিদার ও শ্রেণি রূপান্তরের কথা, 'কালো মেয়ে' গল্পে কলকাতার দারিদ্র্য পরিবারের মেয়ের স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা, 'জটায়ু' গল্পে কালীভক্তের ছদ্মবেশে ডাকাত ও আধপাগলা গ্রাম্য যুবক, 'বিষপাথর' গল্পে প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী গ্রামীণ জীবন কথা, 'কমল মাঝির গল্পে' সাঁওতাল সর্দার, 'রবিবারের আসর'-এ আধুনিক যুবক দল, 'মানুষের মন' গল্পে ভ্রষ্ট স্বদেশী কর্মী ও তার বিপরীতধর্মী পত্নী, 'সাপুড়ের গল্প' কথায় বেদের মেয়ে ও সাপুড়ে সন্ন্যাসী, 'অ্যাক্সিডেন্ট' গল্পে ভদ্রলোক শ্রেণি বদলে হয়ে যায় লরির ড্রাইভার, 'শেষ অভিনয়'-এ যাত্রার অভিনেতা অভিনেত্রী, 'গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনীতে' দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিস্থিতির শিকারে চাকুরীর জন্য ধর্মান্তরিত হয়। আবার 'একটি মেয়ের গল্প' কথায় সাঁওতাল রমণী ও তার সমাজ, 'এ মেয়ে কেমন মেয়ে' গল্পে সমাজসেবকের সাথে চোর ও চোরের স্ত্রী, গ্রামীণ অন্ত্যজ মানুষের জীবনকথা ধরা রয়েছে 'শঙ্করীতলার জঙ্গলে', 'একপশলা বৃষ্টিতে' শ্রমজীবী গ্রামীণ নারী, তাছাড়া 'সখী ঠাকরুণ'-এ নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা পেয়েছে দেবী মন্দিরে। শ্রেণিগত পরিচয়ের পাশাপাশি এইসব গল্পে বেকার শ্রমজীবী, অন্ত্যজ সম্প্রদায় গুরুত্ব সহকারে জায়গা করে নিয়েছে।

'বাঙ্গাপূরণ' গল্পটি এক বোষ্টমী বৈরাগীর জীবনকথা। কৃষ্ণযাত্রার মাধ্যমে যৌবনবোধের প্রথম অস্পষ্ট উপলব্ধিকে লেখক শিশু চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক আপন ভোলা বৈষ্ণব গোটা জীবনটাই রাধা অন্বেষণে কাটিয়ে দেয়—

> "ও আমার মনের রাধায় খুঁজে মরি তিন ভুবনে" [৫]

বহু বল্লভ নামে এক বৈরাগীর গোটা জীবনের অনুসন্ধান কামনাদীপ্ত আবেগে চমকপ্রদ হয়েছে। প্রথম জীবন থেকেই তার নিরুদ্দেশ হওয়ার বাসনা দেখা যায়। বিচিত্র ও অদ্ভুত চরিত্র এই বহুবল্লভ। সাজানো ঘর ও সাজানো বাগান রেখেই সে অদৃশ্য হয়। রাধার অনুসন্ধানে, এক প্রেমময় গভীর অনুভবে মাসের পর মাস বাড়ির বাইরে থাকে। আর তখন—

> "বাড়িতে ধুলো জমে, কাপড়খানা অদৃশ্য হয়, খেজুর চ্যাটাই ও মাদুরখানাকে ঘিরে উইপোকার ঘর ওঠে, জলচৌকিখানাও যায়, জালাটাও ভাঙ্গে, রান্নাঘরের দাওয়ায়

কাঁচা গোবর শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়, ঘুঁটেগুলো কাঠগুলো ধূলোয় ঢাকা পড়ে।" [৬]

হঠাৎ একদিন 'রাধারাণীর জয়হোক!' বলে বহুবল্লভের আবির্ভাব ঘটে। হাতে একতারা আর বাঁয়া। 'পরনে পরিপাটী পরিচ্ছন্ন কাপড়, গায়ে চাদর, কপালে তিলক, সোজা সরু সিঁথি কাটা সযত্ন বিন্যস্ত লম্বা চুল, মুখে হাসি।' বৈষ্ণবীয় ভেকে আসল চেহারা ঢেকে পদাবলী, শ্যামা বিষয়ক, দেহতত্ত্বের গান— সবই তার সুমধুর কণ্ঠে বেরিয়ে আসে। বহুবল্লভের এই বৈরাগীর জীবন শুরু দশ বছর বয়স থেকে। সে যখন গ্রামের লোকের সাথে রায়বল্লভপুরের বাবুদের বাড়ি যাত্রাগান শুনতে গিয়ে মাথুর ভাবনায় রাধাকে দেখেছিল। আশ্চর্য রাধাময় হয়ে গিয়েছিল সে—

> "সাতটা দিন পর পর স্বপ্ন দেখেছিল রাধাকে। তারপর আবার সহজ হ'ল ক্রমে ক্রমে। কিন্তু যখনই শুনত কীর্তন গান, ভাগবতের কথা, রাধাকৃষ্ণের নাম, তখনই মনে পড়ে যেত।" [৭]

কৃষ্ণযাত্রার অভিনয় করত যে মেয়েটি সে যে আসলে মেয়ে নয় মেয়ে সেজে অভিনয় করত এই সত্য উপলব্ধি করতে করতেই বহুবল্লভের গোটা জীবন অতিবাহিত হয়। রাধা অন্বেষণে তার জীবন কাটলেও কৃষ্ণযাত্রার রাধা সাজা মেয়েটির রহস্য উন্মোচন যেন যৌবনের তাড়নায় অস্পষ্ট উপলব্ধি। কিন্তু বাস্তব জীবনে নারীর সাহচর্য ও উপলব্ধি তাকে নতুন ভাবনায় উন্নীত করে। প্রথমে আসে সাঁওতালদের একমেয়ে। গাছের উপর উঠে সে আঁচল ভরে বটবিচি সংগ্রহ করছিল। বহুবল্লভের রাধাময় জীবনে সেই মেয়ে দুদন্ডের প্রশান্তি দিয়েছিল একটু ভিন্ন ভাবে—

> "ভুল করে সোনায় না গ'ড়ে রাধাকে কালো কষ্টিপাথরে গড়লে কোন কারিগর ? মাথায় লাল জবাফুল ? অবাক হয়ে চেয়ে রইল বহুবল্লভ।" [৮]

তার আরাধ্য রাধা এই সাঁওতাল মেয়েটি। সে ভাবল তাকে গান শোনাবার জন্যই এতদিন ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো, হন্যে হয়ে খোঁজা। তারপর এক মাসের মধ্যেই মতের বদল ঘটে। এই রাধা ছি-ছি তে তিরস্কৃত হয়। কিছুদিন পর সে গুরু সতীশ মুখুজ্যের কথায় বিয়ে করে সংসারী হয়। বউয়ের নাম কুসুম হলেও সে ডাকত রাধা বলে। আর মনে মনে ভাবত এবার সত্যিই রাধার সন্ধান পেলাম। কিন্তু কিছুদিন পর কি বিশ্রী দাগ ধরা দাঁত তাকে চমকিত করে। সে ভাবে তার আরাধ্যা রাধা এমন হতেই পারে না।

একবার হাটচরণপুরের ইষ্টিশানের মুসাফেরখানায় গান গাইতে যায় বহুবল্লভ। গানের আবেশে চোখ বন্ধ করতেই 'বুকের ভেতরটা চমকে ওঠে বহুবল্লভের— আসরে রাধা ঢুকল!' তারপর চোখ খুলতেই প্লাটফর্মে লোকারণ্য। কোথায় রাধা। এতো—

> "কি কুৎসিত মেয়ে! কি তেল চকচকে মুখ, মাথার চুল বাঁধার কি বিশ্রী ভঙ্গি। আরে রাম রাম, পাশ দিয়ে চলে গেল, ছড়িয়ে গেল কি উৎকট গন্ধ!" [৯]

বহুবল্লভকে তার গুরু যাত্রার দল থেকে ছাড়িয়ে গাঁয়ে ঘর বেঁধে দেয়। গুরুর দেহরক্ষার পর মাস-তিনেকের মধ্যেই বউ কুসুম ওই মেয়েগুলির মতো কদাকার হয়ে যায়। সে তখন দাঁতে দাঁত ঘষে আপন মনে। কিছুদিন পরই আর এক নারীর সঙ্গ তাকে প্রকৃত রাধার সন্ধান দেয়। সে হল কাদু তথা কাদম্বিনী।

তরুণী বিধবা মেয়েটি কলরব মুখর করে গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। কাদুকে দেখে বহুবল্লভের মনে হ'ল— "এই তো। একেই তো সে একদিন কামনা ক'রে এসেছিল।"

কিন্তু মাস তিনেক যেতে না যেতেই বহুবল্লভ বুঝতে পারল কাদু আর কুসুমের কোনো তফাত নেই। তারপর সুবাসী নামের মেয়েটিও তার কাছে আপন হয়ে ওঠেনি। তাই একতারা বাজিয়ে গান ধরে। অবশেষে শেষ বয়সে সে ঝুমুরের দলে মিশে যায়। দলের বিলাসিনী 'গোলাপ' এই বুড়ো বৈরাগীর হাবভাব দেখে বিরক্ত হয়।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় বৈষ্ণবীয় তত্ত্বাদর্শনকে বহুবল্লভের মাধ্যমে সত্যানুসন্ধানের উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছেন। মোহাবিষ্ট বৈরাগীর জীবন রাধাময় হলেও বাস্তব সমাজ জীবন, নারীর অনুষঙ্গ ও সখ্যতার অনুভব, রোমান্টিক মন, প্রথম যৌবনানুভবে উচাটন মনের আলোড়ন, নারীর দেহ রূপের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা ও আকৃষ্ট হওয়ার প্রবণতা থেকে চরিত্রটি ক্রমশ নানান অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবনের বিচিত্র স্বাদের পরিচয় গল্পে তুলে ধরেছে। অনন্ত কাল ধরে রাধা অন্বেষণের ছেদ নেই, নেই অনুভবের ঘাটতি। এই সত্যের পথে বেঁচে থাকে। মনের মানুষ সঙ্গোপনে মনের মধ্যেই দীর্ঘকাল বেঁচে থাকবে বলে তারাশঙ্কর প্রত্যাশা করেছেন। এক অজানা বেদনা, অচেনা মানুষ যেন কামনা বাসনাময় স্বরূপ সন্ধানের পরিচয়ে নিজেকে প্রমাণ করবে— এই অনুসন্ধানেই লেখকের মতো পাঠকও অনন্তকাল খুঁজেই চলবে— 'রাধা এসেছে' এই সরস ও সকাতর প্রতীক্ষায়।

'ময়দান' গল্পে বৃত্তিহীন এক নারীর জীবনকথা চিত্রিত। ময়দান অর্থাৎ কলকাতার গড়ের মাঠকে কেন্দ্র করে বড় গল্প 'কান্না'-র ছোট সংস্করণ যেন এই 'ময়দান'। সেখানের বিমল চরিত্র ভাবুক প্রকৃতির, শ্রোতার ভূমিকায় গল্প জমিয়ে দিয়েছিল। সেই বিমল চরিত্রকে তারাশঙ্কর ময়দান গল্পের মধ্যেও নিয়ে এসেছেন— অন্য চরিত্রের প্রাঞ্জলতার জন্য, সমাজ সচেতক হিসেবে। একটি দুঃখী মেয়ের গল্পের শ্রোতা হয়েছে বিমল। নিতান্ত সাদামাটা গল্পের প্লটে মেয়েটি রহস্যের অন্তরালে বিমলকে চমকে দেয়। ময়দানের আলো-আঁধারী রাস্তায় আলেয়ার মতোই চকিতে চমকিত করে মেয়েটির রহস্যময় জীবনকথা। যেখানে নিজের মা-ও সমাজে সম্মান পেত না, কুৎসার অভিশাপে ও অপমানের বিপরীতে মেয়েকে তৈরী করতে চেয়েছিল সে। তাই মেয়েকেও মিথ্যে বলতে শিখিয়েছিল—

> "পাড়ায় বলবি চাকরি পেয়েছিস সকাল-সন্ধ্যে ডিউটি। ফিরবি আটটা ন'টায়। আবার বেরুবি সাড়ে পাঁচটায়। বুঝেছিস ?" [১০]

এই মিথ্যাচারের জীবন থেকে একটু মুক্তির সন্ধানে সে ময়দানে এসেছিল। অবশেষে ওস্তাদ নামের ব্যক্তি টাকা আদায়ের কৌশলে এক যুবককে ভিড়িয়ে দেয়। কিন্তু সে যুবক মেয়েটিকে দেখে বুঝেছিল, মেয়েটির মধ্যে এখনও পবিত্রতা সুরক্ষিত আছে। যুবকটি তাকে স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের হদিশ দিতে চেয়েছিল। সেই থেকে এই নারী ময়দানে খুঁজে বেড়ায় যুবকের সন্ধানে। রাতের ময়দানের নানান ভয় সত্ত্বেও সে খুঁজে চলে প্রতিদিন—

> "যে সম্বলের কথা ভাবছি— সে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে চলে যাচ্ছে। শুধু একবার তার

সঙ্গে দেখা করতে চাই। এখানে তার আসার কথা। আগে সে আসত। কিন্তু কে জানে— সে বেঁচে আছে কিনা!" [১১]

এই বিস্ময় ও রহস্যকে সামনে রেখে মেয়েটির বেঁচে থাকা। এক অনন্ত রহস্যের অনুসন্ধানে প্রিয়তমের প্রত্যাশ্যায় তার বেঁচে থাকা। এই পথ তথা সত্যানুসন্ধান করাই হয়তো মেয়েটির একমাত্র লক্ষ্য ছিল। বলা ভালো মানুষের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন প্রতীকী সত্যের সন্ধানে মগ্ন এই মেয়েটি। তার এই অন্বেষণ আর সবার জন্য, মানুষের সুস্থ জীবনবোধে বেঁচে থাকার জন্য। বিমলের মতো বিবেকবান মানুষ ঐ বেহিসেবি ভবঘুরে মেয়েটির জীবনবৃত্তান্তে উৎসুক হয়েছে ঠিকই কিন্তু অজানা রহস্যে নিজের ভাবনাকে পথ দেখাতে পারেনি— ঐ রহস্যময়ীর মতোই—

"সে কিছু ঘোরে। কাঁকে ছেলে নিয়ে একটু কাত হয়ে পদক্ষেপে ক্লান্তি এবং কাতরতা ফুটিয়ে ঘোরে। আজ ঘোরে কাল ঘোরে রোজ ঘোরে— কার্জন পার্কের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমদিকে চলে যায় গাছের তলার অন্ধকারে মিশে যায়, আবার আলোর নীচে ফুটে ওঠে আবার ডুবে যায় অন্ধকারে— একটু কাত হয়ে ক্লান্ত পদক্ষেপে— ওই চলে গেল পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তে।" [১২]

এইসব আলো-অন্ধকারের সীমানার বিপরীতে একটি প্রাণের আবেগে সময় অতিবাহিত করা মেয়েটির গল্পকথায় বিমল যেন প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হয়ে বিশ্বাস-অবিশ্বাস-এর দোটানায় পড়ে। একটি কুমারী মেয়ের স্বপ্ন ও বাস্তবের মেল বন্ধনে বিমলও খুঁজে বেড়িয়েছে দীর্ঘ সহযাত্রীর ভূমিকা নিয়ে। একদিন দশ টাকা দিয়ে বিমল ধন্য মনে করেছিল নিজেকে। অথচ ঐ মেয়েটির জীবনকাহিনী অসত্য ও মামুলি মনে হয়েছে তার। তাছাড়া সত্য হলেও বিবেকের কাছে দায়বদ্ধতার কাছে সমাজের কাছে প্রশ্ন থেকে যায় কেন এমন হয়— এ জটিল রহস্যময় জীবনাবিজ্ঞতার শরিক বিমল হলেও গল্পকার তারাশঙ্কর অন্তরাত্মার সত্যানুসন্ধানের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন বলা যায়।

ভালো-মন্দ, আলো আঁধার, রুদ্র ও শান্ত, স্থিতি ও ধ্বংস সব মিলিয়েই মানব জীবন। তারাশঙ্কর গ্রাম্য লোকায়ত জীবনকে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। অবশ্য তাঁর পূর্বে শিলাইদহের যুগে রচিত রবীন্দ্র ছোটগল্পে গ্রাম্য মানুষেরা ভিড় করছিল। আর ঠিক পরেই শরৎ চন্দ্রের রচনায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক ভাবনা 'মহেশ', 'অভাগীর স্বর্গের' মতো গল্পে সার্থক রূপে দেখা যায়। এমনকি যথেষ্ট সচেতন ভাবেই অন্ত্যজ, ব্রাত্য ও অপাংক্তেয় মানব সমাজের প্রতি দৃষ্টি নিয়োজিত করেছেন শরৎ চন্দ্র। সময় ও সমাজের ভাবনার সাথে নাগরিক জীবনকথায় সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা প্রধান রূপে দেখা গেলে অনালোকিত ও অনালোচিত থেকে যায় প্রান্ত-মানুষের জীবন কথা, যা শরৎ চন্দ্র পরবর্তী তারাশঙ্করের সরস গদ্য কথনে চিত্রিত হয়েছে। আর এই সব অচেনা অদেখা মানুষজনের কথা তারাশঙ্কর তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন। আসলে সামাজিক বৃত্তির পার্থক্যের ফলে সৃষ্ট বিশেষ শ্রেণির মানুষের স্বাতন্ত্র্য ও অভিনবত্বের প্রতি তারাশঙ্করের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল এবং প্রধানত সে কারণেই তিনি তাদের জীবনের রসরূপ উদ্ঘাটনে সচেষ্ট থেকেছেন আজীবন।

'গার্ড চ্যাটারসনের কাহিনী' গল্পের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে দরিদ্র ব্রাহ্মণ ও তার বেঁচে থাকার কৌশল হিসেবে চাকরির জন্য ধর্মান্তর। বাংলার গ্রাম্য জীবনের দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তির উপায়ের একটি প্রেক্ষাপট যেন এখানে ধরা রয়েছে। এক অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান রেলওয়ে গার্ড চ্যাটারসনের দুঃখের কাহিনী, হৃদয়বত্তার কাহিনী পরম আন্তরিকতায়, সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। গ্রামে প্রথম রেলগাড়ি আসার ব্যবস্থার কথা দিয়ে গল্পের কাহিনী গড়ে উঠেছে। তারপর মি. চ্যাটারসন ও মাস্টার মুকুর্জীর কথোপকথনে দেশের নারীদের সামাজিক অবস্থান, পণপ্রথার ভয়াবহ রূপের কথা উঠে এসেছে। রেলগাড়ির এই গার্ড আসলে জনার্দন চট্টোপাধ্যায়। যে কিনা গার্ড জন আর্ডেন চ্যাটারসন, উমার পিতা। একদিন অভাবের সংসারে মেয়ের সুপাত্রে বিবাহ দিতে না পারার জন্য মেয়ে রমা আত্মহত্যা করে মারা যায়। তারপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে নিরুদ্দেশ হয় জনার্দন। লোকে জানে সে নাকি সন্ন্যাসী হয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই ছদ্মবেশী জনার্দনের ভবঘুরে জীবনের নানা কথা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর—

> "তারপর চাকরির খোঁজে কত ঘুরলাম— কিছু হল না। শেষে এক পাদরি বললেন— তুমি যদি ক্রীশ্চান হও তবে তোমাকে চাকরি করে দিতে পারি। ভাবলাম কি হবে আমার জাতে ? ক্রীশ্চান হলাম। এই গার্ড গিরি চাকরি নিলাম।" [১৩]

সে প্রতি মাসের মাইনে জমা করত তার ছোট মেয়ে উমার বিবাহের জন্য। সে জাত খুইয়ে, নেশা না করে কেবল সুখী সংসার জীবনের আশায় টাকা জমিয়েছ। আর ধর্ম ও জাতিগত ব্যবধান দূর করে মানবিকতায় যোগ্য পিতা হবার সংকল্পে জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে চেয়েছে। লেখক দরদ দিয়ে এই ছদ্মবেশী অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের ছবি এঁকেছেন। ধনী মুখার্জীদের শিক্ষিত ছেলে অরুণের সাথে জনার্দনের ছোট মেয়ে উমার বিয়ে হয়। এতে ছদ্মবেশী জনার্দনের আনন্দ ও বেদনামিশ্রিত অনুভূতি ধরা পড়ে— "উমাকে একবার বুকে টেনে নেবে অরুণ।" গল্পের অন্তর্বলয়ে সুস্থির জীবনবোধের সাথে মানবিক মূল্যবোধ বৃহৎ ও মহত্বের সাথে জটিল বা সরল এরূপ সীমারেখা বা পক্ষপাত করা যায় না। বরং বলা যায় লেখক মানবিকতাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। গার্ড চ্যাটারসন চরিত্রটি সরল হলেও তার আনন্দময়তা, মদ্যপানের আকাঙ্ক্ষা ও সংকোচ, অন্তরের বেদনা ও বাস্তবিক ভাবনা পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। ঘটনাক্রমে রেলগাড়ীর যাত্রী বন্ধু অরুণের সাথেই উমার বিবাহে নাটকীয় চমকের মতো উপসংহারে মানানসই মেলবন্ধন চিরন্তন সামাজিক পরিকাঠামোর সাথে রাজযোটক হয়েছে বলা যায়।

'বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা' গল্পে দাম্পত্য সমস্যার সাথে রাঢ় অঞ্চলের বৈষ্ণব ধর্মাশ্রয়ী আখড়ার কথা উঠে এসেছে। আখড়ার মালিক গোবিন্দদাস ছিল ব্রাহ্মণ, ভেক বদলে সে বৈষ্ণব হয়। সে দেখতে অতিশয় কুৎসিত ছিল। কিন্তু তার গানের গলা ছিল অতি চমৎকার। বিয়ের রাত্রেই নবোঢ়া সতী তাকে তার কুরূপের জন্য প্রত্যাখ্যান করে। গোবিন্দ মেয়ে পণ-স্বরূপ সতীর পিতাকে হাজার টাকা পণ দিয়েছিল কেবল সতীর রূপের জন্য। অবশ্য তাতেও কোনও লাভ হয়নি। যাত্রাদলের নায়ক কৃষ্ণদাস বৈষ্টমের রূপে মুগ্ধ হয়ে সতী তার সাথে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। সে কণ্ঠীবদল করে কৃষ্ণদাসকে বিবাহ করে, আর

পুরানো নাম সতী বদলে ভামিনী নামে পরিচিতি পায়। এদিকে গোবিন্দদাস সতীর দুঃখে নিজেও বৈষ্ণব হয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। কিছু দিনের মধ্যেই সে সতীর আখড়ার খবর পায়। গোবিন্দ নিজেই কৃষ্ণদাসের আখড়ার কাছেই নতুন আখড়া তৈরী করে বসবাস করতে থাকে, টাকা জমায়। এদিকে কৃষ্ণদাসের লাম্পট্য ও কদাচারের পরিচয় স্পষ্ট হয় ভামিনীর কাছে। কৃষ্ণদাস ভামিনীকে বাড়িতে রেখে নানা রমণীর সঙ্গলাভে আনন্দে মেতে থাকে। কৃষ্ণদাস নিঃস্ব হয়ে যায়। গোবিন্দদাস কৃষ্ণদাসের আখড়ার দখল নেয়। এই সব পূর্বকথার পরই গোবিন্দদাসের ব্যক্তিগত জীবনকথা তথা দাম্পত্য প্রেমের তীব্র আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রসঙ্গ গল্পের গতিকে ত্বরান্বিত করে দেয়।

সৌন্দর্যরূপিনী ও পূজারিণী ভামিনী আখড়ার প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখার জন্য আশ্রয় ভিক্ষা চায় গোবিন্দদাসের কাছে। গোবিন্দ তা দেয়নি। ভামিনীকে বের করে দরজার কুলুপ এঁটে দেয় তার লোকেরা। আসলে বার বছর ধরে তার অন্তরের জমানো ভালোবাসা কেবল প্রত্যাখ্যাত নয়, চরম অপমানে প্রতিবাদী হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাইরে প্রতিবাদী হলেও গোবিন্দদাস ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত। সে অন্তর দিয়ে চেয়েছিল ভামিনীকে— অতীতের পত্নী সতীকে। এই চাওয়া পাওয়ার জন্যই সে ঘর ছেড়ে বৈষ্ণব হয়, আর এর জন্যই টাকা সঞ্চয় করে সমস্যার মোকাবিলার অপেক্ষায় থাকে। কেবল বাইরের লোক জেনেছে কৃষ্ণদাসের আখড়া দখল ও বিগ্রহটি দখল করার মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনীয়তার কথা। কিন্তু গোবিন্দ জানে আসলে অসতী পত্নীর উপরে প্রতিশোধ ও অপমানের জ্বালা নেভানোই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এক লোভী স্বার্থপর সুদখোর বোষ্টমের নিষ্ঠুরতার কথাই লোকসমাজ কেবল জেনেছে। তার হৃদয়বত্তার কথা হাহাকারের কথা অব্যক্তই থেকে গেছে।

আর এদিকে ভামিনী অভিমানিনী হয়ে আখড়ার পিছন দিক দিয়ে আখড়ায় ঢুকে গোবিন্দর গান শুনে বিভোর ও পাগলিনী হয়। সে বলে—

> "বিগ্রহ যদি পাই তবে তোমার সঙ্গে বাসর সেরে তাঁর পায়ে বিলিয়ে দেব নিজেকে।
> না হ'লে ওই কলসীটা নিয়ে নামব গিয়ে অজয়ের কলঙ্কিনীর দহে।" [১৪]

এরপর গোবিন্দ আর নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি। মনের অব্যক্ত কথায় ধরা দিয়েছে—

"গোবিন্দ। শোন সতী। আমি তোমার জন্য তপস্যা করেছি।

ভামিনী খিলখিল করে হেসে উঠল।

গোবিন্দ। হেসো না সতী, হেসো না শোন।

ভামিনী। ভালো, আর হাসব না বল।

গোবিন্দ। আজ আমিও বৈষ্ণব, তুমিও বৈষ্ণব। গৃহস্থ নই, আখড়াধারী। আমাদের প্রথা যখন আছে তখন তুমি ফিরে এস। এ-ঘর, আয়োজন সব তোমার জন্যে সতী।

ভামিনী। না।

গোবিন্দ। সতী!

ভামিনী। না-না তাছাড়া আমি আর সতী নই, আমি ভামিনী— কৃষ্ণ ভামিনী।

গোবিন্দ। তবে তুমি বিগ্রহ পাবে না ভামিনী। কলসীই তোমাকে নিতে হবে।

ভামিনী। তাই দিয়ো।'' [১৫]

তবে ভামিনী উচ্চকণ্ঠে বলেছে 'গোঁসাই, আমি তোমাকে দুঃখ দিয়েছি। কিন্তু ঠকাই নি।' বিয়ের প্রথম দিন থেকেই রূপজমোহের সাথে বিগ্রহের সেবায়েত ও আখড়ার অধিকার সংক্রান্ত সমস্যায় বৈষ্ণব সমাজভাবনা যথেষ্ট প্রত্যক্ষগোচর হয়েছে। আর তার সাথে ভামিনীর রূপতৃষ্ণায় ঘর-সংসার ত্যাগ, দীর্ঘস্থায়ী দুঃখের সাথে বাস্তব জীবনাভিজ্ঞার পরিচয় ধরা রয়েছে। ভামিনীর তীক্ষ্ণ প্রত্যাখ্যান— কুরূপ গোবিন্দদাসের প্রতি বিরূপতা সত্ত্বেও তার কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণ গোবিন্দদাসের সংরাগতপ্ত হৃদয়কে ট্র্যাজেডির গৌরবে উজ্জ্বল করেছে।

গল্পের ঘটনাপরম্পরায় ভামিনীর গর্ভের সন্তান গোবিন্দদাসের হওয়ায় অতি নাটকীয়তা থাকলেও গল্পকার কাহিনী বয়ানে তা মিলিয়ে দিয়েছেন। গোবিন্দ আহ্লাদীর বাড়ি যেত দেহের সম্ভোগের তাড়নায়। একদিন আহ্লাদী সেজে ভামিনী রাতের অন্ধকারে গোবিন্দদাসের শয্যাসঙ্গী হয়েছিল কৃষ্ণদাসের বাড়ির বিগ্রহ সেবার অর্থ উপার্জনের জন্য। আহ্লাদীর শর্তানুসারে প্রদীপহীন বাসরে আহ্লাদী রূপী ভামিনীর গর্ভে গোবিন্দদাসের সন্তান হয়। অবশ্য এই খবর শুনে গোবিন্দদাস নিজের ভুল বুঝতে পারে। আর শুনতে হয় ভামিনীর কথা—

> ''গোঁসাই, টাকা দিয়ে আমাকে কিনেছ ভেবে তুমি নিজেকে নিজে ঠকিয়েছিলে। গোঁসাই, তারপর এখানে এসে জাত দিয়ে টাকা জমিয়ে ভেবেছিলে আমার তপস্যা করছ। গোঁসাই তুমি আহ্লাদীর নেশায় পড়েছিলে, মনে পড়ছে ?'' [১৬]

গোবিন্দ আহ্লাদীকে প্রতি বাসরে দশ টাকা দিত। তাই সেই টাকা পাওয়া লোভেই ভামিনী তার বাসর শয্যায় অংশ নেয়। আর সোহাগ ভরে সেইদিন গোবিন্দ ভামিনীকে একটি বন্ধকী আংটি দেয়। ভামিনী তাই সতী। ভামিনীর এ সন্তান পঞ্চতপার ফল— প্রভুর দান। জীবন যুদ্ধে গোবিন্দ সতীর কথায় হার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। তার পরাজয় রূপের নয় সংযমের কাছে বুদ্ধির কাছে। তাই তার তপস্যা কেবল বিগ্রহের জন্য নয় বিকৃত সৌন্দর্যের অভিপ্রায়ে, আত্ম অনুশোচনায়। সেই তীব্র অভিমান তাকে আত্মহননের দিকে নিয়ে গেছে। ভামিনীর সন্তান ও বিগ্রহ নতুন জীবন পথের সহায়ক হলেও গোবিন্দ অসহিষ্ণু মনকে সংযত করতে পারেনি। টাকা দিয়ে সে একদিন সতীকে তথা রূপসীকে কিনে এনেছিল। আবার বারো বছর ধরে সেই টাকার অহংকারে আহ্লাদী, ভামিনীর মনকে শরীরকে কিনে নিতে চেয়েছে। কিন্তু প্রকৃত সত্যের পরিচয় পেয়ে অভিমানে আত্মহননের পথকেই বেছে নিয়েছে সে। গল্পকার বৈষ্ণব ধর্মের বিবাহ প্রথার স্বাভাবিক ব্যবস্থার কথা দাম্পত্য প্রেমের টানাপোড়েনের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন।

অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে তারশঙ্করের সেরা গল্পগুলির মধ্যে 'ডাইনী' উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এই বিষয় ভাবনা নিয়ে লেখকের তিনটি গল্প রয়েছে— ''ডাইনীর বাঁশি' (১৯৩৩), 'ডাইনী' (১৯৪০) এবং 'ডাইনী' (১৯৫১)। প্রথম গল্পের মধ্যে বর্ণিত গ্রামের অনাথা আত্মীয়হীন এক বিধবার

মর্মান্তিক জীবন কথা। দ্বিতীয় গল্পের মধ্যে প্রথম গল্পের পরিণত ও পরিকল্পিত প্রকাশ সমাজ প্রেক্ষিতে ধরা পড়ে। যেখানে একঘরে ডাইনীর কল্পিত নারীর অসহায় জীবন কথা প্রকাশ পেয়েছে। ডাইনীর জন্ম (সুরধুনীর), বিয়ে, মৃত্যু— তার কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্যের একটি পূর্ণ রূপ ধরা রয়েছে। গ্রামের লোকের মিথ্যা ধারণার ফলে ক্রমাগত দোষারোপ ও নিজের বিশ্বাসের ফলে ডাইনীর প্রথাগত মনোভাব, অনুভূতি ইত্যাদি নিজের মধ্যে অনুভবের পূর্ণতা পেয়ে গল্প গড়ে উঠেছে। আর আমাদের আলোচ্য 'ডাইনী' গল্পে সেই বিশ্বাস নিজের মধ্যে চরম পরিণতি পেয়েছে স্বর্ণ ডাইনী তথা 'স্বনা ডান'। গল্পের প্রথমেই লেখক চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে ডাইনী, ডাকিনী, মায়াবিনীর ভয়ে অন্তরাত্মা শুকিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ এনেছেন। আমাদের দেশে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের কারণে এই প্রথার প্রচলন রয়ে গেছে। এই বদ্ধমূল কুসংস্কার আজও শিক্ষিত সমাজের মানুষের মধ্যে সংগোপনে যত্নশীল। যুক্তিবাদী মানুষেরা অপবিশ্বাসকে সযত্নে আজও লালন করে নিজেদের অন্ধ শিক্ষার জাহির করে চলছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লোকায়ত সমাজের এই অন্ধবিশ্বাসকে সামনে রেখে সমাজের জটিল সমস্যাকে পাঠকের প্রত্যক্ষগোচর করেছেন—

> "আমাদের গ্রামে আমাদেরই বাড়ির পূর্বপ্রান্তে বড় একটা পুকুর, বড় বড় তালগাছে ঘেরা। তাদের উত্তর-পূর্ব কোণে ছিল স্বর্ণ ডাইনীর ঘর।" [১৭]

এই স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনী হয়ে ওঠার কাহিনি রোমাঞ্চে ভরা। সে তিন চার ক্রোশ দূরের হাট থেকে তরিতরকারি কিনে এনে আশেপাশের গ্রামে বিক্রয় করত। কারও বাড়িতে ঢুকতে চাইত না অনিষ্টের ভয়ে। আসলে তার লোভ-লালসা তার নিয়ন্ত্রণে নয় বলে সাবধানে থাকার চেষ্টা করত—

> "ওর ভিতরের ডাইনীটা তো ওর অধীন নয়! সেই তো ওর জীবনের মালিক, তারই হুকুমে ওকে চলতে হয়। তার হুকুম ছাড়া ওর মরবারও অধিকার নেই।" [১৮]

এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্তী স্বর্ণ ডাইনী। স্বর্ণের মাসী ডাইনী ছিল কিনা এই সন্দেহে মৃত্যুকালে স্বর্ণ ভয়ে দেখা পর্যন্ত করতে যায়নি। পাছে এই ভয়ঙ্কর ডাইনী বিদ্যা কৌশলে তাকে নিতে না হয়। অবশেষে মৃত্যুর খবর নিশ্চিত জেনেই স্বর্ণ গেল মাসীকে দেখতে। হঠাৎ ম্যাও ম্যাও শব্দে মাসীর পোষা বেড়ালটা তার পা ঘেঁষে বসে, গরগর শব্দ করে, লেজ উঁচু করে নাকে মুখে ঠেকায়। স্বর্ণের মায়া হল। সে বেড়ালকে বাড়ি নিয়ে আসে। তাকে নিয়েই সে জেলেপাড়ায় গেলে জেলেদের কচি ছেলে ধনুকের মতো বেঁকে যায় আর কাঁদে বেড়ালের স্বর করে। গুণীন এসে বলে ডাইনী প্রকোপে ছেলের এই রোগ হয়েছে। সবাই জানল বেড়ালটাই ডাইন। একটা জোয়ান ছেলে রাগের মাথায় বেড়ালটার মাথায় লাঠি বসালে মাথাটা থেঁতলে যায়, না মরে নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়। গুণীন তার লেজ ধরে গ্রামের প্রান্তে ফেলে দেয়, কিন্তু তাতেও তার মৃত্যু হয় না। বিধবা তরুণী স্বর্ণ মায়া মমতায় সাদা দুধের মত বেড়ালটার খোঁজে এক পা-দু'পা করে এগিয়ে তাকে ধরতে যায়। তারপর ঘটে নাটকীয় অঘটন—

> "তাকে স্পর্শ করলে। বেড়ালটা মরে গেল। স্বর্ণের একি হল ? স্বর্ণের চোখে একি দৃষ্টি! একি হ'ল তার ? এ সব সে কি দেখছে ? ওই যে গর্ভবতী ছাগলটা যাচ্ছে— তার

গর্ভের মধ্যে দুটি ছাগল ছানাকে দেখতে পাচ্ছে। ওই যে কলাগাছটা ওর ভেতর দেখতে পাচ্ছে— কলার মোচা" [১৯]

ডাইনী হয়ে ওঠার এই গল্পের পরম্পরা থেকেই যায়। সে আবার কাউকে ডাইনী বিদ্যে দিলে তবেই তারে মরণ হবে।

গল্পকার স্বর্ণ ডাইনী হয়ে ওঠার কাহিনির পর স্বর্ণ ডাইনীর কীর্তির কথা তথা শক্তির কথা শুনিয়েছেন। লেখক স্বয়ং কথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। উত্তম পুরুষের জবানীতে গল্পের রস জমিয়েছেন লেখক। অবিনাশদাদাকে স্বর্ণ ডাইনী ধরার মধ্য দিয়ে এবং ডাইনী তাড়ানোর বিদ্যা জানা গোঁসাইবাবার পরিচয়ে অন্ধবিশ্বাস যেন সত্যের মুখোমুখি রূপে চিত্রিত।

অবিনাশ প্রবল জ্বরে বেঁহুশ হয়ে স্বীকার করে যে সে স্বর্ণ ডাইনী। বিখ্যাত গুণীন গোঁসাইবাবার সাহায্যে অবিনাশদাদার ডাইনী তাড়ানোর ব্যবস্থা হয়। একটা জলপূর্ণ কলসী দাঁতে কামড়ে তুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাইরের দরজায় অবিনাশ আসতেই দাঁত থেকে কলসীটা খসে পড়ে যায়। সাথে সাথে অবিনাশও পড়ে যায়—

"কয়েকঘন্টার মধ্যেই অবিনাশদাদার জ্বর ছেড়ে গেল। আমার শিশুচিত্তে ডাইনী আতঙ্ক দৃঢ়বদ্ধ হয়ে গেল।" [২০]

গল্পকার চিরকালীন অন্ধপ্রথাকে বিশ্বাস করেছেন ঠিকই কিন্তু স্বর্ণ ডাইনীর ডাইনীত্ব চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিক জীবন কথারও পরিচয় দিয়েছেন। যেখানে সামাজিক সমস্যা কেবল ডাইনী প্রথা নয় ডাইনী হওয়া ব্যক্তির স্বাভাবিক জীবন যাপনের দায়বদ্ধতার প্রশ্নও উঠে এসেছে এখানে। আর সে জন্যই স্বর্ণ নামের মেয়েটিকে সমাজের মূল স্রোতে মিলিয়ে দিয়েছেন—

"অনেক দিন পর। তখন আমার বয়স তের-চোদ্দ বৎসর। স্বর্ণ হঠাৎ আমাদের বাড়ি যাওয়া আসা শুরু করল। পান তরকারি নিয়ে আসত। শুনলাম, ফুল্লরাতলায় যাওয়া-আসার পথে মায়ের সঙ্গে স্বর্ণের কথাবার্তা হয়েছে। মা তাকে বলতেন ঠাকুরঝি। ওইটুকুতেই সে কৃতার্থ।" [২১]

স্বর্ণ শেষ জীবনে দাওয়ায় বসে আকাশের দিকে চেয়ে থাকত— 'নিঃসঙ্গ পৃথিবী-পরিত্যক্ত স্বর্ণ।'

এই গল্পের মধ্যেই গুণীনের মন্ত্র শক্তির পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। তারা মন্ত্র বলে বট অশ্বত্থ গাছ শিকড় সমেত উড়িয়ে আনতে পারত। ডাকিনীবিদ্যার এই সব ভয়াবহ রূপ গ্রামবাংলার অন্ধবিশ্বাস কেন্দ্রিক মানুষের মনে চিরকাল জাগ্রত রয়েছে। কারো অপঘাতে মৃত্যু শিশুর হঠাৎ মৃত্যু, গাছের হঠাৎ স্থান বদলে অবস্থান এমন নানান বিশ্বাস লোকসমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। লেখকের নিজস্ব উপলব্ধি গল্পের শেষে ব্যক্ত হয়েছে।—

"আজ সেকালের পরিবর্তন হয়েছে। ডাইনীতে বিশ্বাস ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে আসছে। ডাইনীও আজ আর নাই বললেই হয়। অশিক্ষার গাঢ় অন্ধকারে যারা আজ ডুবে

আছে তাদের মধ্যে হয়তো আছে। সেকালের ডাইনীর বিচিত্র গল্পও আজ লোকে ভুলে আসছে। এই গল্পগুলির মধ্যে শুধু অন্ধবিশ্বাসই তো নাই— আছে কত মানুষের মর্মান্তিক বেদনা। সারাটা জীবন তারা এই অপবাদের গ্লানি বহন করে চলত।" [২২]

এই অপবাদের বোঝা বয়ে নিয়ে চলত সারাটা জীবন। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাদের অপবাদ ঘুচত। কিন্তু তারাও ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত এই ভয়ঙ্কর জীবনের অবসান হওয়ার জন্য। গল্পকার এই ভয়াল অপবিশ্বাসের সঙ্গে বাস্তবের সমাজকে মিলিয়ে দিয়ে জীবনকে ভালোবাসার বন্ধনে চিরন্তন করেছেন।

'বরমলাগের মাঠ' গল্পে নানা বিষয়ের উপস্থাপনা দেখা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের সামাজিক পরিকাঠামোয় অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা জমিদারতন্ত্র ও কমিউনিস্ট আন্দোলন, সাপ ও বেদেনীর প্রসঙ্গ তাছাড়া অনাবাদী জমিকে সুফলা জমিতে রূপান্তরের গল্পে আঞ্চলিক মিথ গল্পটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রচলিত নৈতিকতার বিপরীতে নর-নারীর সম্পর্ক— এই সব বিষয় ভাবনা গল্পের উপাদান হিসেবে কার্যকরী ভূমিকা পালন করেছে। জমির ভাগের অধিকার প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে তেভাগা আন্দোলনের কথা। কমিউনিস্টদের দ্বারা পরিচালিত এই জনমুখী আন্দোলনকে লেখক ঘৃণা ও ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখতেন। যার প্রতিফলন গল্পের মধ্যে রয়েছে। শিবনাথ এই গল্পের জমিদার। জমিদারী ব্যবস্থায় লোভলালসার ছবি এই গল্পে শিবনাথের মধ্যে দেখা গেছে।

শিবনাথ জমিদার বরমলাগের মাঠের জমি কিনে জমিদারীর প্রসার বাড়ায়। আর ঐ মাঠের জমি চাষ করার জন্য দীর্ঘদিনের চাষী বলরাম নতুন মনিবকে তোষামোদ করে। দু'পুরুষ ধরে চাষাবাদ করা জমির মায়ায় শিবনাথের স্মরণাপন্ন হয় বলরাম। চাষী বলরামের বউ ও মেয়ে নতুন মনিবকে তোষামোদের জন্য তৎপর হয়। কিন্তু কৌশলী জমিদার শিবনাথ দিব্যদর্শনে জমিদারী মানসিকতার রূঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। লেখকের কথায়—

"শিবনাথ ভাবছিল, এ আপদকে অবিলম্বে কেমন ক'রে বিদায় করা যায়। আটদশবছর যাবৎ বিদেশবাসী হলেও এই শ্রেণির নরনারীর প্রকৃতি ও পরিচয় তার অজানা নয়। এরা সব পারে। সম্পদশালী উচ্চবর্ণের মানুষের চারিপাশে এরা মাছির মত উড়ে বেড়ায়। মনের মধ্যে দুর্বলতার ক্ষত আবিষ্কার করতে এবং সেখানে ব'সে বিষ সঞ্চারিত ক'রে দিতে ওই মাছির মতই এদের পটুত্ব এবং প্রবৃত্তি অসাধারণ ও স্বাভাবিক।" [২৩]

শিবনাথের বুদ্ধির সাথে চরিত্রের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। তার ভাবনা শ্রেণিগত বৈষম্যকে প্রাধান্য দিয়েছে বলেই জমিদার ভাগচাষীর চিরকালীন বৈষম্য ও তোষণ সামনে এসেছে। গল্পের মধ্যে শিবনাথের চাষী বলরাম গল্পের মূল কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। যেখানে শিবনাথ তথা তারাশঙ্কর যেন জমিদারি প্রথার শেষ প্রতিনিধি। লাঙল যার জমি তার এই ভাবনায় আবদ্ধ জমিদারী ব্যবস্থা। এদিকে বলরাম তিনপুরুষ ধরে ভাগচাষী। জমিদারতন্ত্রের সমর্থক তারাশঙ্করের মধ্যে শ্রমজীবী কৃষিজীবী মানুষের চিরন্তন দুঃখবেদনার কথা ব্যক্ত হয়েছে। মানুষের সত্য জীবন ও মনের সরল স্বাভাবিক চাহিদাগুলির রূপচিত্র

এঁকেছেন তারাশঙ্কর। তাই দেখা যায় বলরামের ঠাকুর্দা নটবর থেকে কাহিনির সূত্র মেলানো হয়েছে। তার জীবনের একটি অধ্যায়ে লালমণি নামে এক বেদের মেয়ের আকর্ষণে ঘর জমি চাষাবাদ ছেড়ে দেশান্তরীর কথা আছে। পনের বছরের যাযাবর জীবনে নটবর পুত্র-পত্নীকে ভুলতে পারলেও তার কৃষিজমিকে ভুলতে পারেনি কোনো দিন। সে চেয়েছিল জমি চাষে সুখী জীবন যাপন করবে। কিন্তু তার শ্রমে ও ঘামে ফলানো ফসল যখন সিংহভাগ জমিদার মহাজনেরা ভাগ করে নেয় তখন লালমণি বেদেনী এই বঞ্চনা ও শোষণে ক্ষিপ্ত হয়ে নটবরকে নিয়ে যাযাবরবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। গোলামীর কৃষক জীবন ছেড়ে যাযাবরীর মুক্তি জীবনে অভাবের যন্ত্রণা দূরে চলে যাবে— এই ছিল তার ভাবনা। কিন্তু নটবরের রক্তে মাটি ও চাষের তৃষ্ণা জড়িয়ে রয়েছে। কিছু দিনের মধ্যেই লালমণি মারা যেতে সে ফিরে যায় বাড়িতে। পুরানো জীবনে অভ্যস্ত হতে চায় সে। দীর্ঘদিন যাযাবরবৃত্তির ফলে তার মধ্যে অদম্য সাহস ও দুর্ধর্ষশক্তির সঞ্চার ঘটেছে। সে বিশ্বাস করত লালমণির কাঁউর-বিদ্যায়। সে লালমণির কাছে অনেক গুপ্ত বিদ্যা রপ্ত করেছিল। সে গুণীন নামে পরিচিতি পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করত। তারপর বরমলাগের মাঠের অজস্র সাপকে বধ করে চাষযোগ্য করেছে সে। বলরামকে তার বাপ এই সব কথা বলেছে—

> "নাগ হলেন দেবতা। নাগের আত্মা ছাড়বেন না, শোধ দেবেন। মাটির ওপরে হঠাৎ কোনদিন সামনে ফণা তুলে দাঁড়াবেন। পরাণের বদলে পরাণ লেবেন। কিন্তু তাতে চাষী ভয় করে না। মাটি কাটতে গেলেই নাগের সঙ্গে বিবাদ হয়। মাটির তলায় বাস; চাষ করতে গেলেই নাগের বাস তুলতে হয়। নাগকে বধও করতে হয়। তার বদলে মা মনসার পূজো দেয় চাষী, ভগবানকে সাক্ষী রাখে। কিন্তু নাগ যদি বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে, তবেই হয় সর্বনাশ।" [২৪]

একদিন ডাকিনী বাউরী ঐ বরমলাগের মাঠের জমিকে কেন্দ্র করে জোড়া খুন করেছিল। এই সব গল্প বলরাম শুনেছে তার বাপ ও ঠাকুমার কাছ থেকে। সে জেনেছে বরমলাগের মাঠের জমির পূর্ব ইতিহাস। মাটির প্রকৃত রূপের সাথে কার বেশী অধিকার— চাষী, না জমিদার, না প্রকৃতপক্ষে মাটি সংলগ্ন জীবন-মৃত্যুর মুখোমুখি মানুষের পরম্পরা। যা কেবল চাষী নয়, রক্ষণশীল জমিদারের কাছে মালিকানা সত্ত্ব নয়, ধরিত্রীর এই দান কেবল দেবতারই কৃপায় সে চাষী বা জমিদার দুজনেরই দিক থেকে।

বলরামের পূর্বপুরুষেরা সেই দেবতার দানকে শক্তি দিয়ে সামর্থ দিয়ে চাষযোগ্য জমিতে পরিণত করে জমিদারদের সম্পদশালী করে চলেছে। নটবর জীবন দিয়ে যা করেছে বলরামও সেই জমি আবাদের দাবী জানিয়েছে। তারা ভাবে জমিদারের কাছে বঞ্চনা-শোষণ পীড়ন মানে নাগ হত্যার পাপ। আগের বরমলাগের মাটির জমিতে সাপের বাস ছিল। বলরামের পূর্ব পুরুষেরা সেইসব সাপকে মেরে পাপ কর্ম করেছে। এই বিশ্বাস চলে এসেছে বলরামের মধ্যে। নটবর কিভাবে শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়েছে সেই ছবি এই গল্পে রয়েছে। মনিবের পক্ষ নিয়ে সারা জীবন কেটেছে তার। মাছের জন্য খুন, নিরপরাধ পুত্রবধূকে খুনের মতো ঘটনায় নটবর যথেষ্ট সাহসী ও অসহিষ্ণু হয়েছে। যে সাহস তার ছেলে পায়নি।

কিন্তু বলরাম চরিত্র যথেষ্ট সাহসী। রাগে অভিমানে জমিদার শিবনাথকে সে সরিয়ে দিতে চায় পৃথিবী থেকে—

> "মধ্যে মধ্যে কাজকর্মের বরাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘরের কোণে কাঠের র‍্যাকে ঠেসানো শিবনাথের উইন্‌চেস্টার রিপিটারটার দিকে শঙ্কাতুর বিস্ময়ের সঙ্গে চেয়ে দেখে, ঘরে লোকজন না থাকলে বন্দুকটার নলে হাত দিয়ে তার অদ্ভুত শীতল কঠিন স্পর্শ অনুভব করে।" [২৫]

বলরাম শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামী তেভাগা চাষীদের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়ে শিবনাথের বাড়ি থেকে ধান লুঠ করে উপস্থিত হয়। সে শিবনাথের চুক্তি, বিশ্বাস অস্বীকার করে সকলের সামনে এসে দাঁড়ায়। তারমধ্যে পরম্পরাগত চাষীর পিছুটান রয়েছে ঠিকই কিন্তু সমবেত চাষীর সমর্থনে সেও আন্দোলনে সামিল হয়। সে বলেছে এটা তাদের বরমলাগের অভিশাপ-পাপ। এ পাপ তার বংশের লোকের মধ্যে দিয়ে চলে এসেছে। শিল্পী তারাশঙ্কর জমিদার তন্ত্রের সাথে মানবতন্ত্রের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে দেখিয়েছেন। এই দ্বন্দ্বে কাহিনিটি জীবন্ত, বিচিত্র রস সমৃদ্ধ। মিথ ও লোককাহিনিতে পরিপূর্ণ— সাপ ও মানুষের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের মধ্যে দুঃসাহসিক, প্রতিবাদ সংগ্রামী চেতনায় নিহিত। জটিল আবর্তের মধ্যে দেবতা ও মানুষের চিরকালীন দ্বন্দ্বময় জীবন সংগ্রাম শাশ্বত বিশ্বাসে পরিপূর্ণ। পাপপুণ্যের জটিল বিশ্লেষণে জীবন সংকট প্রতি মুহূর্তে কথনতত্ত্বের জাল বিস্তার করেছে।

অসহিষ্ণু নটবর পনের বছর যাযাবরী জীবন কাটিয়ে বেদেনী লালমণির সঙ্গে ঘুরে বাড়ি ফিরে জেনেছে তার বউ আর সাঙা করেনি। মুনিবের নজরে পড়লেও নিজেকে সামলে ছেলে দুটোকে বাঁচিয়ে এখন বেঁচে রয়েছে। তাই নটবরের রাগ জন্মায় নি। বরং বেঁচে থাকার অলিখিত বিশ্বাসে সমঝোতা করেছে—

> "ফিরে আয় তু, ফিরে আয়। তোর দোষ আমি ধরব না, আমার দোষ তুই ধরিস না।" [২৬]

নটবরের এই কথায় দীর্ঘ অদর্শনের বিরহ ব্যথা নিয়ে তার স্ত্রীও আপোস করে নেয় বিনা শর্তেই। সর্প দংশনে মারা যায় নটবরের বড়ছেলে। রাতে প্রচুর মদ খেয়ে নটবর বাড়ি ফিরতেই দেখল বিধবা পুত্রবধূও বাড়ি ফিরে এল। এক ছন্নছাড়া পাপের আবর্তে সংসার জীবনে লালসা, অর্থাভাব চরম মুহূর্তে পৌঁছায়। তা সত্ত্বেও যুবতী নারী তার সম্ভ্রম বাঁচিয়ে চলে—

> "বউকে ডাকিনী সাঙা করতে দেয় নাই, বাড়িতে রেখেছিল ছেলের আদরে; কাজ করতে দিয়েছিল মনি-বাড়িতে— ভদ্র চাষীর বাড়ি, ভাল খাবে, ভাল থাকবে; মনিবের বড় ছেলে তাকে ভাল চোখে দেখে, বউটার মনও তার উপর পড়েছিল, সে কথাও অজানা ছিল না, তাতে আপত্তিও করে নাই ডাকিনী-বুড়ো; যুবতী বয়স, যাতে তার মন ভাল থাকে তাই সে করুক। মনিবের বেটা ভাবীকালে সেই হবে মনিব। সেও খুশী থাকবে গুষ্টিটার উপর। বউকে সে নিজেই চিনিয়ে দিয়েছিল গাছের শিকড়, যাতে বিধবার কলঙ্ক অনায়াসে ঘুচে যায়, মুছে যায়।" [২৭]

মানুষের বিবেক ও সামাজিক অবস্থানের টানাপোড়েনে প্রকৃত কর্মময় জীবনাচরণের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন তারাশঙ্কর। যেখানে কামনার সাথে বিরংসা, খেদের সাথে সোহাগের সৌধ, আবার দাসত্বের পবিত্রতায় পরম আনন্দের সঙ্গে পূর্বজন্মের কর্মফলের যন্ত্রণা এই সব পাপপুণ্যের নানান হিসেবের গরমিলে কাহিনির দ্বান্দ্বিকায় তারাশঙ্কর বিচিত্র ও জটিল স্বাদের গল্প উপহার দিয়েছেন। জমিদারতন্ত্রের হৃদয়ভাবনায় ধরা না থাকলেও লেখকের অন্তর্গূঢ় দৃষ্টিতে সময়ের অনুশাসনের রূপটি এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে।

বাংলাদেশের মাটি ও মানুষ তারাশঙ্করের সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রভূমি। তাঁর সাহিত্যের সত্যদর্শন নিজের চোখে দেখা এবং অন্তরের উপলব্ধির সত্যদর্শন যেন একাকারে পরিণত। 'জন্মান্তর' (১৯৫৫) গল্পে জমিদারী ব্যবস্থার মায়াজালে মানুষের প্রকৃত সম্পর্ক অনুসন্ধানের মূলতত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে বাঁচতে হবে, বাঁচবার রীতি বদলের সাথে সাথেই নানান মানুষের বিচিত্র জীবন কাহিনির সত্যতা নিজের অভিজ্ঞতার নিরিখে মেপে যাচাই করে গল্পের বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করেছেন তারাশঙ্কর। জমিদারীর অহঙ্কার, দাপটের সাথে স্পর্শকাতর সূক্ষ্ম জীবানুভূতি সময়ের অনুশাসনে সচেতন করেছে লেখককে। 'বরমলাগের মাঠ' গল্পের মতোই জমিদারতন্ত্রের প্রসঙ্গ গল্পের মূল কেন্দ্রে অবস্থান করেছে। আর হৈমবতী নিঃসন্তান বালবিধবা হয়ে সারাজীবন আগুনের মতোই জ্বলেছে। ক্ষয়িষ্ণু জমিদারী ব্যবস্থার প্রত্যক্ষ ছবি আলোচ্য গল্পে ধরা রয়েছে। হৈমবতী বলরাম চাটুজ্জের দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী। স্বামীর স্বভাব ও সম্পত্তিতে অধিষ্ঠাত্রী হয়ে হৈমবতীও একসময় খাণ্ডারাণী, দুর্গাবতী, ঝান্সীর রাণীর নাম অর্জন করে। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে অর্থনৈতিক সামাজিক গঠন বদলে যায়। বদলে যায় সরকারের আইন। ১৩৬১ সালে জমিদারী বিলোপ আইন পাশ হয়। এই লক্ষ্মীছাড়া দেশ ছেড়ে, দেশের মায়া কাটিয়ে একমাত্র ঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে সে বৃন্দাবনে বাস করতে চেয়েছে। অথচ এই হৈমবতীই—

> "জীবনে পরের মাটিতে পা দেননি। গ্রাম ছিল তাঁর জমিদারি। সব মাটিই তাঁর। গ্রাম থেকে বের হয়ে সরকারি সড়ক ধরে চলতেন। সরকারি সড়ক পরের মাটি নয়। গ্রামের বাইরে কোন পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে তিনি কোনদিন হাঁটেন নি।" [২৮]

হৈমবতী সেকালের মেয়ে। পড়াশুনা তেমন জানা নেই। তা সত্ত্বেও চোখের দৃষ্টি, বুদ্ধিমত্তায় দাপুটের সাথেই জমিদারী চালিয়েছে। জমিদারীর স্বার্থরক্ষায়, নায়েব গোমস্তাদের পরিচালনা করতে মামলা মোকদ্দমার তদারকি করার কাজে তাঁর যথেষ্ট নিপুণতা ছিল। হৈমবতী গ্রামের লোকের কাছে ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল—

> "দিনান্তে একবার তিনি গ্রাম পরিভ্রমণ করতেন। কার কোথায় নতুন ঘর হচ্ছে, কে কোথায় নতুন জমি কাটাচ্ছে, সেখানে তার সূচাগ্র পরিমাণ জমি তারা চাপিয়ে নিচ্ছে কিনা দেখে আসতেন। যেখানেই সন্দেহ হ'ত সেখানেই নিজে দাঁড়িয়ে চারহাত লম্বা দাঁড়া দিয়ে জমি মাপ করাতেন। গোমস্তা মাপত, তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। কখনও নিজেই এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াটা গোমস্তার হাত থেকে টেনে, প্রায় কেড়ে নিয়ে বলতেন—

দাঁড়া যে লাফিয়ে চলছে গো। দাঁড়া চলবে শুয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করার মত।" [২৯]

তার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে গ্রামের লোকের অজানা ছিল না। এমনকী তার স্বামী বলরামও সতীনের ছেলে নীলুকে ভালোবাসার জন্য হৈমবতীর প্রশংসা করত। হৈমবতী ও একদিন সতীনের ছেলেকে পেয়ে নিজের মা হওয়ার কথা ভুলেছিল।

নীলু নিজের মামাবাড়ি পড়তে যায়। বছর কয়েক পরে মামাবাড়ির বিষমেশানো পরামর্শে, সাহসে, আদরে নিজের স্বভাবটাই বদলে ফেলে। বৈষ্ণবের বাড়িতে পাখির হাড় দেখে বলরাম বুঝতে পারে ছেলে নীলু লুকিয়ে মাংস ভক্ষণ করেছে। তাই বিধান দেয় মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্তের। এতে নীলু অপমানিত না হলেও তার মামা অপমানিত হয়। একটি পত্রে সৎমা'র চক্রান্তে নীলু দোষী বলে উল্লেখ করে। এতে বলরাম ক্রুদ্ধ হয়ে নীলুকে শহর থেকে নিয়ে যায় গ্রামে। হৈমবতী অতি স্নেহে নীলুকে কাছে রাখতে চাইলেও নীলু হৈমবতীকে রাক্ষুসী ডাইনী বলে অপবাদ দেয়। পালিয়ে মামারবাড়িতে গিয়ে থাকে। বলরাম নীলুকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেয়। কিছুদিনের মধ্যেই হৈমবতী শয্যাশায়ী হয়, আর বলরাম হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বলরাম পুত্রকে বঞ্চিত করে হৈমবতীর নামে সমস্ত সম্পত্তি উইল করে যায়।

এদিকে নীলু আদালতে উইল নাকচের মামলা করে, উইল জাল করে। জমিদারী পুত্র হয়েও সমস্ত অপকর্মের মধ্যে নিজেকে জড়ায়। কিন্তু হৈমবতী দীর্ঘ কয়েকটি বছর জমিদারী দেখাশোনা করে ক্লান্ত। জমিদারী উচ্ছেদ আইন পাশের পর দেশের ছেলেরা দূরে ও পেছনে ঠাট্টা করত— 'মেরি ঝাঁসী নেহি দুগ্গা' অর্থাৎ ঝাঁসী বা জমিদারী ছেড়ে দিতে হবে। তাও হৈমবতী সরকারের বিরুদ্ধে লড়তে চেয়েছে।

জমিদারী ব্যবস্থার বদল তথা রূপান্তরের ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার। বীরভূমের ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বংশের সন্তান তারাশঙ্কর। জমিদারী প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-কাঠামোর প্রতি তাঁর ছিল দ্বিধামিশ্রিত আকর্ষণ। কংগ্রেস কর্মী তারাশঙ্কর জানতেন এই সমাজ-কাঠামোর বদল আসন্ন। আলোচ্য গল্পে হৈমবতীর ব্যক্তিত্ব যেন জমিদারীর জটিল বৃত্তে পড়ে হারিয়ে গেছে। আর উজ্জ্বল হয়েছে মানবিক ও নারীর স্নেহ-প্রেমের পরিচয়। তিরিশ বৎসর ধরে সৎমার সাথে সম্পত্তির দ্বন্দ্বে যে স্নেহ-প্রেম দূরে ছিল হৈমবতী বৃন্দাবন যাত্রার মধ্য দিয়ে আবার ফিরে এসেছে। পুত্রস্নেহ'কে দূরে সরিয়ে জমিদারী নিয়মে হৈমবতী স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার জন্য আইনী লড়াই করে জিতেছে ঠিকই, সরকারি নিয়মে জমিদারী লোপের খবরে হৈমবতী দমে গেছে। কিন্তু জমিদারী রক্ষার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে লড়েছে সে। আয় বাড়িয়ে সমস্ত অধিকার সঁপে দিয়েছে সৎমা'র ছেলে নীলুকে। এই পরম্পরায় হৈমবতী চরম শান্তি পেয়েছে নীলুর বছর চারেকের ছেলেকে দেখে, যে কিনা আম কুড়োতে ব্যস্ত ছিল। এই দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে লেখকের চিরন্তন দরদী মানবিক রূপটি স্পষ্ট ধরা পড়ে।

জমিদারতন্ত্রের অবসান ও বদলে যাওয়া গ্রামীণ সমাজকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে রাঢ়বঙ্গের রূপকার তারশঙ্কর রচনায় তুলে ধরেছেন। নীলুর ছেলেকে পেয়ে আজীবন সন্তান বুভুক্ষু বিধবার (হৈমবতী'র) 'জন্মান্তর' হয়েছে— প্রাপ্তির পূর্ণতায়, চরম আনন্দে।

'কালো মেয়ে' গল্পে দরিদ্র পরিবারের এক অসহায় নারীর সংগ্রামী জীবনে স্বাবলম্বী হওয়ার কাহিনি

ব্যক্ত হয়েছে। সুমতি নামে কালো মেয়ের সাফল্যের চেষ্টায়, উপলব্ধিতে ভালোমানুষ অর্থাৎ মনের মানুষ হয়ে ওঠার কাহিনি শুনিয়েছেন তারাশঙ্কর। সাংসারিক অভাব, সাহিত্যিক রূপের অভাব, শিক্ষাগ্রহণের সমস্যা, কালোর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও চাহিদার নানা প্রসঙ্গ সূত্রে সুমতি চরিত্র যথেষ্ট উজ্জ্বল হয়েছে। সামাজিক পণপ্রথার বেড়াজালে এবঙ্গের নারী কিভাবে অবহেলিত হয় তার সামাজিক রূপচিত্র এঁকেছেন লেখক। একটি মেয়ের আত্মউন্মোচনের সাথে সামাজিক স্বীকৃতি, শিক্ষা, সম্পর্কের টানাপোড়েন উন্মোচিত হয়েছে। প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে মেয়ের রং ও গড়ন কালোর নান্দনিকতায় সামাজিক স্বীকৃতিতে গল্পের মূল ভাবনা বিকশিত। ইস্কুলের শিক্ষক উপীনবাবুর তিন ছেলে বিমল, অমল ও শ্যামল এবং এক মেয়ে সুমতি মায়ের ফর্সা গায়ের রং না পেয়ে উপীনবাবুর থেকেও কালো রং নিয়ে জন্মায়। শিক্ষিত পরিবারের এই মেয়ের বড় হওয়ার সাথে শিক্ষাগ্রহণের বর্ণনা রয়েছে গল্পে। সিক্সথ্ ক্লাস থেকে পড়া ছাড়িয়ে ঘরের কাজে লাগায় বাবা। কাজের সাথে বাড়িতে পড়াশুনা করানোর কথা ভাবলেও কোন ইচ্ছা বা গুণ তার মধ্যে দেখা যায় নি। তার পায়ের গতি অস্বচ্ছন্দ, কণ্ঠস্বর মধুর নয় অনেকটা আড়ষ্টতা যুক্ত, এমনকী ছবির রেখার টান মোটা। বড়দাদা বিমল পরখ করে দেখেছিল সে নাচ, গান, ছবি আঁকায় পটু নয়। এমনকী একমাত্র মেয়ের শিক্ষক বাবার কাছেও যা বিস্ময় লেগেছিল। সমস্ত চেষ্টা করেও—

> "উপনীবাবু ইস্কুলে ওকে দিয়েছিলেন। কিন্তু ইস্কুলে ওর পড়া হল না। ক্লাসে বারবার ফেল করায় এই শিক্ষাজীবীর পরিবারটির সকলজনেই লজ্জা পেলেন। এমন একটা বিদ্যাগৌরবে গৌরবান্বিত বাড়ির উজ্জ্বল মার্জিত গৌরমুখে কালো মেয়েটি কালি দিলে বলেই মনে হল সকলের।" [৩০]

বয়স বাড়ার সাথে সাথে কালো রঙের সুমতির বোধবুদ্ধিতে যথেষ্ট প্রখরতা দেখা যায়। সুমতির মা মারা যাবার সময় সমস্ত মাঙ্গলিক ক্রিয়াকর্ম সামলেছে সুমতি। পাড়ার লোক ও বাবাকে সঙ্গে নিয়ে শ্রাদ্ধের আয়োজন করা থেকে পুরুত ডেকে দিনক্ষণ ঠিক করার মতো কাজ সামলেছে সে। তারপর বড় বয়সেই মলিনা হেডমিস্ট্রেস-এর সৌজন্যে সুমতি বিদ্যাপীঠে ভর্তি হয়। নতুন করে পড়াশুনা শুরু করে এবং বাবাকে না জানিয়ে স্কুলের কাছে পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনের সরকারি ডেয়ারী দোকানের কাজে ঢোকে। এই খবর শুনে উপীনবাবু—

> "নির্বাক হয়ে গেলেন। মনে হল, পা দুটো তো অনেক দিনই পঙ্গু হয়ে গেছে। আজ মস্তিষ্কটাও পঙ্গু হয়ে গেল। চোখ দিয়ে শুধু জল গড়াতে লাগল অনর্গল ধারে। তাঁর চোখ মুছিয়ে দিয়ে কালো মেয়েটি বললে— কাঁদবেন না বাবা।" [৩১]

রান্না করে বাবাকে খাইয়ে সে ঘর থেকে বের হয়। তার বড়দা ছোটদা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে কবেই। ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাবার সাথে থাকা কালো মেয়েটির সাহচর্যে, কর্মে, অর্থে, বুদ্ধিতে শ্রমে একটি সংসারের দৈনন্দিন জীবনযাপন সচল থেকেছে। এদিকে তার যৌবনের আগমনে উঁকি দিয়েছে ছেলে ছোকরা থেকে মোটরওয়ালা পর্যন্ত। মোটরওয়ালা ছোকরার প্রেমের আবেদন তার কাছে হাস্যকর ও প্রতারণা মনে হয়। ছেলেটি সুমতির ব্যক্তিত্ব ও দৃষ্টির গভীরতায় পালিয়ে যায় গাড়ি চড়ে।

বাড়ির কাজের চাপে, পড়ার চাপের জন্য সে মাঝে মাঝে কাঁদে। সব সমালোচনার চিন্তায় অস্থির হয়। মুখের হাসি হারিয়ে যায় তার। সে আজ অনেক বড় হয়েছে। বয়স হয়েছে তার। কাল থেকে কালান্তর পশ্চাতে বুকের ভিতর 'তার চেতনা যেন কালো সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে চলেছে— সেই আদিমকালে। রাত্রিকালে ঘন অন্ধকারে যেন ছায়ামূর্তির মত বিচরণ করে বেড়াচ্ছে কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী— ।' লেখক সরীসৃপ, পেশীবহুল মানুষের প্রসঙ্গ এনে সুমতির যৌন আবেদনের গোপন বার্তার পরিচয় দিয়েছেন। সংসারের মায়াবন্ধন কাটিয়ে তার উদাসী মন সক্রিয় হয়। অল্প বয়স থেকে জীবন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে সে লাভ করেছে পরিণত মানসিকতা।

কালো মেয়েটির কাছে প্রকৃত ন্যায় নীতির যথার্থ মূল্যায়ন ধরা থাকে। ছোটভাই শ্যামলের ভালোবাসায়, বাবার স্নেহে একটু বোকা ধরনের কালোগড়নের ভালো মনের মেয়েটি আজ সমস্ত বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে সংসারের হাল ধরে সবাইকে বাঁচিয়ে নিয়ে চলতে শিখিয়েছে। অব্যক্ত মনের কথা সংগোপনেই থেকেছে তার। পিতা উপীন বড় হয়ে যাওয়া মেয়েটির বিবাহের ব্যবস্থা করতে অসমর্থ জেনেও যৌবনের স্বাভাবিক সামাজিক বন্ধনের প্রকৃত মর্যাদা সুমতিও গ্রহণ করতে চায়নি— 'আমার বিয়ে দেবেন না বাবা! না-না-বাবা, আমি কালো।' এই কালোর মধ্যেই জগতের তথা সংসারের আলোর প্রদীপ সাজিয়েছেন গল্পকার। আর সেই প্রদীপের উজ্জ্বল আলোর তাপে বেঁচে থাকার রসদ লুকিয়ে থাকে। এই চিরন্তন বার্তার মধ্য দিয়েই গল্পের ইতি টেনেছেন—

> "তার এই অপরূপ কালো রূপকে যে ভালবাসবে, তার জীবনে যে উদীত হবে, সে হবে শ্রেষ্ঠ রূপবান। তার প্রতীক্ষা করবে সে। রাত্রির মত সূর্যের তপস্যা করবে সে।" [৩২]

গল্পকার সামাজিক সৌন্দর্যের বাহ্যিক প্রকাশের বিপরীতে মানবিক সৌন্দর্যবোধকেই প্রাধান্য দিয়েছেন একটি কালো মেয়ের সংগ্রামী জীবনের ছবিকে সামনে রেখে। রূপ নয় গুণের মহিমায় ও কর্মের পরিচয়ে সামাজিক বন্ধনের মাধুর্যে ভালোবাসার চিরন্তন দাবী এই গল্পের কাহিনি। চরিত্র নির্ভর এই গল্পের বয়ান অতি চমৎকার ও শিল্পসম্মত।

'বিস্ফোরণ' গল্পে শ্রমজীবী মানুষের জীবন কথা তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। মোটর ড্রাইভার মেকানিকদের জীবন নিয়ে কাহিনি শুরু হয়েছে। গাড়ির গ্যারেজে কাজ করার সাথে যুক্ত রামতারণ, ইসমাইল ও নটবরের মালিকেরা শোষণ ও চক্রান্তে কাহিনিবৃত্তে অবস্থান করেছে। ১৯৪৬ সালে ১৬ আগস্ট কলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলমানের যে দাঙ্গা হয় সেই দাঙ্গার একটি প্রত্যক্ষ ছবি এই গল্পে দগদগে ঘায়ের মত রূপায়িত হয়েছে। কারখানাকে কেন্দ্র করে মানুষের সংগ্রামী জীবন, তাদের দৈনন্দিন জীবন যাপন, সংসার সংগ্রাম যেন ধর্মহীন ভালোবাসায় পরিণত।

> "কারখানাটা হিন্দু আর মুসলমান পাড়ার সীমানাভূমিতে! এদিকে হিন্দু, ওদিকে মুসলমান। কারখানাটা সেদিন বন্ধ। বন্ধ থাকলেও ভিতরে তিনজন ছিল। রামতারণ, নটবর আর ইসমাইল। মদ খেয়ে ঝিমুচ্ছিল। তিনজনে পরস্পরের দিকে চেয়ে বসেছিল নির্বাক হয়ে।" [৩৩]

এরা কেউ ধর্মভীরু নয়, বেঁচে থাকার লড়াই করে এরা বাধ্য হয়ে মদ খায়। কেউ বলে— আল্লা হো আকবর! কেউ জয় হিন্দ্! আবার কেউ— বন্দে মাতরম্! ডান্ডা, পাইপগান, ছোরা, বোমা নিয়ে এ তিনটি ধর্মের মানুষের বেঁচে থাকা। মুসলিম লীগের ক্ষিপ্ত শোভাযাত্রা দেখে রামতারণ অস্থির হয়। নটবর একটা প্রকাণ্ড দল তৈরি করে প্রতিবাদের জন্য। কোমরে ছোরা, হাতে লাঠি নিয়ে ছেলের দলের সাথে চিৎকার করে চলছে বন্দে মাতরম্! জয় হিন্দ্ ! রক্তক্ষয়ের সম্ভাবনার কথা ভেবে রামতারণ চঞ্চল হয়ে ওঠে। উত্তেজনায় নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। আর বলে—

> "পাগল হয়ে গেল সব! পাগল! হে ভগবান! রক্তারক্তির পালা পড়েছে। ভেসে যাবে সব রক্তের স্রোতে, ছাই হয়ে যাবে আগুনে পুড়ে।" [৩৪]

ড্রাইভার-মেকানিক মিলে একটা গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবন। যেখানে ধর্মহীন ভালোবাসা কেবল মানবিকতায় বন্ধুত্বের সম্পর্কে আবদ্ধ। অথচ প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতো জীবন সম্পর্কে চিন্তাশীল। এদের যৌথ জীবনে কলহ-বিবাদ-বন্ধুত্বের পাশাপাশি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যে বিদ্যমান। আসলে মানুষের স্বাভাবিক সহজাত বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রিয়াশীল এদের মধ্যে। কিন্তু১৬ আগস্টের হত্যালীলা এদের ভেতরের শয়তানকে জাগিয়ে তুলেছে। এরা রাজনৈতিক দলের লোক নয়, মুসলিম লীগ-কংগ্রেস কিচ্ছুই এরা মানে না, এমনকী জানত না, এরা কোনো গুপ্তদলের সাথেও যুক্ত ছিল না। তবুও এরা রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্বে মেতে উঠেছে। গ্যারেজ থেকে মাঝেমধ্যে বেরিয়ে গিয়ে ছুরি মারা, বোমা চার্জের মতো কাজে হাত পাকিয়ে অবশেষে মানুষ মারার নেশায় অন্ধ প্রবৃত্তিতে মেতে উঠেছে তারা। রক্তের নেশায় দীর্ঘদিনের বন্ধু ইসমাইলকে খুন করে রামতারণ। হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের এই ছবি ইতিহাসের প্রকৃত সত্যকে প্রত্যক্ষ করায়। কেবল ইসমাইল নয় রামতারণের হাতের বোমায় নটবর মারা যায়, এমনকী রামতারণ নিজেও মারা যায়—

> "ছোরাটা ফেলে দিয়ে সে হাতের কাছের বোমাটা নিয়ে মেঝের উপর প্রচন্ড আঘাত দিয়ে ঠুকল। প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ইলেকট্রিক আলো নিবে গেল। গভীর অন্ধকারে ছেয়ে গেল পথ। শুধু কারখানার ভিতরে লোহা-লক্কড় টিনে প্রতিহত শব্দটা ঝনঝন করে রেশ টেনে চলেছে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন নটবর কাতরাচ্ছে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন রামতারণ বিড়বিড় করে কি বলছে! বিস্ফোরণের শব্দের রেশের মধ্যে তা বোঝা যাচ্ছে না।" [৩৫]

এই দাঙ্গার বর্ণনার পরে লেখকের দার্শনিক মন কোনো সীমারেখায় বিভক্ত হয়নি। হিন্দু-মুসলমানের প্রসঙ্গের মধ্য দিয়ে লেখক ভ্রাতৃহত্যার ছবিই তুলে ধরেছেন। কাহিনি বয়ানে ইতিহাসের প্রসঙ্গ সূত্রে চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়েছে। গল্পের মূল উদ্দেশ্য সোজাভাবে প্রচার হওয়ায় পাঠকের ভাবাবেগ সংগ্রামী মানসিকতায় আহত হয়েও সংযত থেকেছে।

কালীভক্তের ছদ্মবেশে এক ডাকাত ও আধপাগলা বুড়োর কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে 'জটায়ু' গল্পটি। রয়েছে ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের প্রসঙ্গ। কালা গুণ্ডা আর জটে পাগলা চরিত্র দুটির নির্ভরে অন্যান্য চরিত্রগুলি কাহিনি বৃত্তে অবস্থান করেছে। কালা গুণ্ডা ভোল বদলে কালা গোঁসাই হয়ে

যায়। যে গুণ্ডা একদিন মুর্শিদাবাদের রাস্তায় রাস্তায় চাঁদা তুলত মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য, আজ সে কলকাতায় এসেছে চাঁদা আদায়ের জন্য। তবে মুসলমানের ইজ্জত বাঁচাতে নয় হিন্দুর ইজ্জত বাঁচানোর জন্য। চামড়া ব্যবসায়ী এনতাজ মিঞা তাকে চিনে ফেলায় এবং পূর্ব সাক্ষাতের কথা বলায় সে চমকে ওঠে বলে—

> "কেয়া রে বিধর্মী। আমি মুসলমানের জন্য চাঁদা তুলি ? আমি মুসলমান ? গলায় রুদ্রাক্ষের মালাটা দেখিয়ে, চিমটেটা ঘোরাতে শুরু করে দিয়েছিল। আ— আ! হে মহাদেব, বম্ বৈদ্যনাথ। কালী কালী মহাকালী।" [৩৬]

এই কালা গোঁসাই নিজেকে পয়গম্বর বলে প্রচার করত। আর চাঁদা আদায়ের কৌশলে বলে বেড়াত কালভৈরবের হুকুম। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়ানোর অপরাধে দারোগা তাকে একবার হাতকড়ি পরিয়েছিল। কিন্তু ক্ষমতা বলে সে হাতকড়ি ছিন্ন করে। তারপর নবগ্রামের একটা গাছতলায় চিমটেটা পুঁতে ধ্যানস্থ হয়ে তিনদিন বসে থাকে। সে যজ্ঞ চায়, চায় শান্তি। 'হিন্দুস্থান পাকিস্থানমে শান্তি আয়েগা।' চাঁদা কেউ দিতে চাইল না। ফলে অন্য পন্থা, অন্য উপায় করল সে— কালা গোঁসাই শিব স্থাপন করল। বাবার থানে বেদী তৈরি হল। ভক্তরা জমায়েত হল। নবগ্রামের টেঁপী বা ট্যাঁপা দেবভক্তি বা পুণ্যের জন্য বিখ্যাত নাম। সেও কালা গোঁসাই-এর দর্শনে শিব বেদীতে এল। বিভিন্ন দেবতার যেমন বিভিন্ন রোগমুক্তির ঘোষণা থাকে তেমনি কালা গোঁসাইয়ের শিবস্থান ঘামাচির মহিমাতেই ভক্তের কাছে আরাধ্যদেবে পরিণত হল। মানুষের সেবার নামে এবং হিন্দুধর্মের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে এই কালা গুণ্ডা যে মস্ত বড় প্রতারক ও রাজদ্রোহী তা চিনতে পারল ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোক। দারোগার সাথে ভদ্রলোকটি কলকাতা থেকে সমস্ত প্রমাণ নিয়েই এসেছে।—

> "কালা গোঁসাই— কলকাতার বিখ্যাত নেপাল গুণ্ডা, ওকে গুণ্ডা-আইনে প্রথম কলকাতা থেকে, পরে বাঙলাদেশ থেকেই বের করে দেওয়া হয়। বেহারে গিয়ে নেপাল হয় কালা গুণ্ডা। সেখান থেকে যায় পূর্ববঙ্গ, সেখানে নাম নিয়েছিল— কাল্লু সর্দার। রাহাজানি, নৌকায় ডাকাতি, মেয়েছেলে চুরি— অনেক করেছে সে। দেশভাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে চলে এসেছে সে। এ অঞ্চলে এসে হয়েছে কালী গোঁসাই বা কালা গোঁসাই।" [৩৭]

কালা গোঁসাই গ্রেপ্তার হয়ে চালান হয়। কিন্তু মাস কয়েক পরে ফিরে এসে বলে— কালা গোঁসাইকে পাপ ছুঁতে পারে না। পুলিশ কি করবে, যা করছি ধর্মের জন্য দেশের জন্য করছি। সে শিব ও কালীর ছেলে বলে ঘোষণা করে। এরপর তার বিক্রম-পরাক্রম শতগুণ বেড়ে যায়, তার নাম হয় গোঁসাই বাবা। ক্ষ্যাপা মহিষের শিঙ ভেঙে মারা কিংবা পাগলা কুকুরকে মাথা ফাটিয়ে মেরে ফেলার মতো সাহসী কাজের মধ্যে গোঁসাই বাবা প্রাণবন্ত থেকেছে। কিন্তু এই গোঁসাইবাবাকে জটে পাগলা প্রাণে মেরেছে কি না— এই রহস্য উন্মোচনের জন্যই গল্পের কাহিনি সাজানো হয়েছে।

জটাধর বা জটে পাগলা ছিল শিবু কর্মকারের ছেলে। বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত সুস্থ থেকে বাবার

সাথে কামারশালার কাজে হাত লাগিয়েছে। তার মাথার গোলমালটা বাড়ে বাবুদের বাড়িতে থিয়েটার দেখে। 'সীতাহরণ' পালা দেখে সে কাঁদে। সাহাদের উমেশের জটায়ু চরিত্রের অভিনয় দেখে বাহবা দেয়। উমেশকে সে প্রণাম করেছিল বারবার। কিন্তু জটায়ুর অভিনয়ে উমেশ সত্যিই মরেনি। মরার ভান করে পড়ে ছিল বলে জটাধর অবাক হয়। উমেশকে জীবিত দেখে ক্ষেপে যায়—

> "তা হলে ও সত্যিকারের যুদ্ধ করেনি! প্রাণ বাঁচাবার জন্য মিছামিছি মরে যাবার ভান করে পড়ে গিয়েছিল— রাবণ মড়া ভেবেই তাকে ছেড়ে দিয়েছে। ওরে পাষন্ড! ওরে কাপুরুষ! তোর প্রাণের মায়াটাই এত বড় হল রে ?" [৩৮]

লোকে হেসে সারা হয়। তাকে সকলে বলে যাত্রা-থিয়েটারে যা হয় তা সত্যি নয়; সব মিথ্যে কথা। কিন্তু এসব কথায় জটে পাগলা বিশ্বাস করল না। তার বিশ্বাস জন্মাল শিবনাথের উপর। শিবনাথ সীতাহরণ পালায় রামের চরিত্রের অভিনয় করে জটার কাছে প্রিয় হয়ে গেছে। অন্তত উমেশের মিথ্যা অভিনয়ের চেয়ে শিবনাথ গ্রামের মুকুটহীন রাজা। গ্রামের জননেতা, অবিবাহিত, সুন্দর চেহারা তার। জটা শিবনাথের কাছে গিয়ে থিয়েটারের পার্ট নিতে চেয়েছে। অনর্গল সংলাপ মুখস্থ করে আউড়ে প্রমাণ করেছে সে পাগল নয়, উমেশের থেকে ভালো অভিনয় করতে পারে জটায়ু চরিত্রে। কিন্তু 'রাণাপ্রতাপে'র পালা হওয়ায় জটের ভাগ্যে অভিনয় করা হয়নি। হতাশ জটে শিবনাথের বাড়িতে নিত্য যাতায়াত করে— থিয়েটারের আশায়। শিবনাথ ভালো অভিনেতার জন্য বন্ধুর দৌলতে কলকাতায় একখানা ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পায়। বিখ্যাত হয়। আর জটে তথা জটাধর আশায় আশায় দিন গুণতে থাকে সে সিনেমায় নামতে চায়। শিবনাথকে ভালোবাসে। শিবনাথের অপেক্ষায় পথে পথে ঘুরে। কলকাতায় গিয়ে সিনেমায় সুযোগ পাবে এই ভাবনায় তার বেঁচে থাকা, গ্রামের প্রান্তে, রাস্তার ধারে বসে থাকা। নখ চুল দাঁড়ি গোঁফ মিলিয়ে তাকে বীভৎস দেখাত। সকলের মধ্যে একটা প্রশ্ন যে— এই জটাধর কালা গোঁসাইকে হত্যা করতে পারে কিনা। কিন্তু এর প্রমাণ পাওয়া যায় শিবনাথের স্ত্রীর কাছে।

শিবনাথ কলকাতায় জরুরি কাজে চলে যাবার পর গ্রামের মধ্যে একটি বাড়ি তৈরি পরিকল্পনায় থেকে যায় তার বউ কল্যাণী। কল্যাণী গ্রাম দেখে, লাল মাটি খোলা মাঠ দেখে গ্রামকে ভালোবেসেছে। এখানে বাড়ি বানানোর জন্য ঠিকাদার নীরদবাবু ও দেববাবুর সহায়তায় কাজ শুরু হয়। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদের দিন জটা ও দেববাবুরা কল্যাণীকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে আসে। কল্যাণী চণ্ডীপন্ডপের জীর্ণদশার কথা ভাবতে থাকে। হঠাৎ পিছন থেকে কালা গোঁসাই তার মুখ চেপে ধরে বড় গাছের ছায়ায় নিয়ে যায়। আর বলে— সিনেমাওয়ালী— 'আজ তুমকো লেকে ভাগেগা হম! হি-হি-হি!' কল্যাণীকে হাত ধরে টেনে নিয়ে এগিয়ে যায় কালা গোঁসাই। তার ভয়ঙ্কর রূপ, মুখে গাঁজার গন্ধ পেয়ে কল্যাণী চিনতে পারে। হঠাৎ সেই অন্ধকারে প্রেতের মতো একটা মূর্তি এসে কালার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কালা ছুরি দিয়ে সেই মূর্তিকে (জটাকে) হত্যা করতে চায়। কিন্তু সেই ব্যক্তি তথা জটা কালা গোঁসাইকে গলা টিপে ধরে রাখে। এসব কথা কল্যাণী জানায়—

> "সে যুদ্ধ নিষ্ঠুর যুদ্ধ। আমার মনে হ'ল অমাবস্যার অন্ধকারে ঢেকে গেল পৃথিবী। আমি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেলাম।" [৩৯]

জ্ঞান ফেরার পর কল্যাণী জানায় যে জটা আসলে পাগল ছিল না। কল্যাণীর সম্ভ্রমহানি ও অপরহরণের তীব্র প্রতিবাদ স্বরূপ, শিবনাথের ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে সে কালা গোঁসাই-এর গলা চেপে ধরেছিল। জটের নিষ্ঠুর আক্রমণ ও বজ্রের মত শক্ত হাতের মুঠির চাপে কালা গোঁসাইয়ের মৃত্যু হয়। দেশ বিভাজন, দেশে ঠক প্রতারকের উপদ্রবে সুস্থ সমাজের বিশৃঙ্খল অবস্থার পরিচয় দানের মধ্যে দিয়ে তারাশঙ্কর ভন্ড ও গুণ্ডাদের সামাজিক অবস্থান তুলে ধরেছেন।

প্রকৃত ভালোবাসার জন্য জটায়ু পাখি একদিন সীতার জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। আর জটাধর কর্মকার, অভিনয়কে ভালোবেসে নারীর স্বাধীনতা ও সম্ভ্রমহানি বাঁচিয়ে প্রকৃত বীরের মতো প্রাণ ত্যাগ করেছে। তাই সেই ভালোবাসার প্রতিদান হিসেবে শিবনাথ দারোগাবাবুর কাছে জটাধরের লাশটা দাহ করার জন্য নিতে এসেছে। এই ভালোবাসা মনুষ্যত্বের, কেবল মেকি ভালোবাসা নয়, পাগলের অভিনয় করা এক ভালোমানুষের প্রতি চিরন্তন ভালোবাসা। গল্পটি যথেষ্ট শিল্পগুণ সমৃদ্ধ। জটাধর কে লক্ষ্য রেখেই গল্পের নামকরণ হয়েছে জটায়ু।

'আলোকাভিসার' গল্পটি ছোটগল্প না বলে ছোটখাটো উপন্যাস বলাই শ্রেয়। আঙ্গিকগত অভিনবত্বের বিপরীতে তারাশঙ্কর জোনাকলালের জীবনীকে অন্ধকার থেকে আলোকের দিকে পৌঁছে দিয়েছেন। গল্পের নামকরণ তাই আলোকাভিসার রেখে সার্থক হয়েছেন। আর কাহিনি বর্ণনায় এত বেশি ঘটনার ঘনঘটা এনেছেন, নায়কের মুখে আত্মবিশ্লেষণ দিয়েছেন, তাকে তত্ত্বকথায় চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশ মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য না হয়ে আধ্যাত্মিক ভাবনায় দাঁড়িয়ে গেছে। ফলে গল্পটি একটি পরিকল্পিত আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হয়ে গেছে, হয়নি জীবনের স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিকাশের অনুকূল।

গল্পের মূল ভাবনায় এক বোখাটে ছেলের ঘর থেকে পালানোর কাহিনি ব্যক্ত হয়েছে। জোনাকলাল অতি বাল্যকাল থেকেই লেখাপড়া করত না। সে নেশা ও চুরি জোচ্চোরিতে পটু ছিল। সে গাঁয়ের আরো দুটি ছেলের সাথে পালিয়ে যায়। যাবার সময় একটি ছেলে মায়ের বাক্স ভেঙে বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে যায়। ওদের পালিয়ে যাওয়া জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লেখক আমাদের শুনিয়েছেন। বিচিত্র পাপের, লোক ঠকাবার কাহিনিতে পরিণত বয়সের বিচিত্র অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ধরা হয়েছে। বিজয় ও কালোর তুলনায় জোনাকলাল যথেষ্ট বিবেক সম্পন্ন মানুষ। লেখকের এই অঘোষিত বক্তব্যে আধ্যাত্মিকতার সাথে মানবিকতার নিবিড় সম্পর্ক ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের শেষে সাধু সাধুনীর প্রসঙ্গের মধ্যদিয়ে যে সাধু সে আসলে ভন্ড, চোর, প্রতারকের পরিচয় পায়। সাধুনীর রূপে মুগ্ধ জোনাক সঙ্গ ত্যাগ করতে চায় না। সাধু সাধুনীর সংস্পর্শে কাম ও হিংসার দ্বন্দ্বের পরিণতি জোনাক ঠিক করতে পারেনি। প্রবৃত্তির তাড়নায় নাটকীয়তায় চিত্তভাবের তীব্রতায় তারাশঙ্কর আধ্যাত্মিক অনুরাগের বেষ্টনীতে চরিত্রের বিকাশ ঘটিয়েছেন। বানানো সন্ন্যাসীর গল্পের আড়ালে কখন যেন মোহ ও মহৎ কর্ম পাশাপাশি অবস্থান করেছে। তারাশঙ্কর পুণ্য প্রচারের মধ্য দিয়ে পাপক্ষত মানুষের হৃদয় যন্ত্রণাকে বাংলা সাহিত্যের পাতায় ঠাঁই দিয়েছেন। জোনাকলাল, তরুণী সাধুনী ও সাধুর ত্রিমুখী সম্পর্কটি সরস পরিবেশনে উপভোগ্য হয়েছে—

"হঠাৎ পাখিতে যেমন কলকল ক'রে ওঠে ঠিক তেমনি ক'রে পখির মত কলকল ক'রে মেয়েটা ভজন জুড়ে দিলে—

মেরে গিরিধারী গোপাল—

সে কি গলা আর সে কি গান। গোটা গাড়িখানা সেই গানের সুরে ভাবে যেন ময়-ময় সয়ে গেল।" [৪০]

চোর থেকে সাধু, আবার সাধু চোরের পেশায় নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার প্রবণতায় প্রতারক ও ভণ্ডামির ছল চাতুরিতে চরিত্রগুলি ক্রমশ হারিয়ে গেছে। তবুও মায়াময় অলৌকিক রহস্যের মতো সাধুনীর সংসর্গ পাওয়ার প্রত্যাশায় সত্যের মুখোমুখি হয়েছে জোনাকলাল।

গল্পের শেষে জোনাকলাল সাধুর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করে তাকে চোর হিসেবে প্রমাণ করে অবাক হয়। তার লক্ষ্য কেবল প্রতিশোধ নেওয়া নয়, সাধুনীকে অধিকার করা। কিন্তু সে তা পারেনি। উপলব্ধি করেছে নিজের মধ্যেই চোর লুকিয়ে আছে। তাই সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। অন্ধকার থেকে আলোর পথে, পাপ থেকে পুণ্যের পথে, তীব্র কামনাবহ্নির বিপরীতে সহজাত সরল জীবনযাপনের পথে চরিত্রটির উত্তরণ ঘটেছে এক নিরাসক্ত প্রশান্তির মধ্যে। লেখকের নীতিগত ভাবনা অধিক মাত্রায় সত্যের পথে বিরাজ করেছে চিরকাল, যা এ গল্পের মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে। জোনাকলালের পরিণতিতে পাঠকের মনোবেদনা থেকে যায় চিরকাল। কেননা আত্মহননের পথেই সন্ন্যাস, সাধনা, বা ধ্যানের মহিমা অনুগামী হয়েছে। মানসিক অস্থিরতার নিরসন হলেও সামাজিক বেষ্টনীতে ট্র্যাজিক ভাবনা ক্রিয়াশীল। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির পরিতৃপ্তি শিল্পরসময় না হয়ে তাত্ত্বিক ভাবনার নিয়মে সমাজের পবিত্রতা বজায় রেখে শিল্পরসকে পরিবেশন করেছেন তারাশঙ্কর। তাই জোনাকলালের আত্মহননে সামাজিক শৃঙ্খলতা চিরন্তন সত্যের পথ খুঁজে পেয়েছে। তারাশঙ্কর আলোকাভিসারে শিল্পের ধ্বজা ধরে রেখেছেন।

ভ্রষ্টা স্বদেশী কর্মী ও তার বিপরীত ধর্মী পত্নীর বিচিত্র কাহিনি নিয়ে গড়ে উঠেছে 'মানুষের মন' গল্পটি। ভবেন ও সুভাষিণীর বৈপরীত্য জীবনাদর্শের পরিচয় এখানে ব্যক্ত। স্ত্রী সুভাষিণী আবাল্য স্বাভাবিক প্রবৃত্তি মতো ভোগবিলাসিতা ও সৌখিনতাকেই জীবনের মানানসই সত্য বলে জানত। গল্পে এদের জীবনাদর্শের দ্বন্দ্ব যেমন রয়েছে তেমনি সেই দ্বন্দ্ব চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে গল্পের সূচনা থেকে শেষপর্যন্ত। স্বামী স্ত্রী'র প্রবল কলহে একজন বাড়ি ছাড়ে আর স্ত্রী আত্মহত্যা করবার চেষ্টায় দরজা বন্ধ করে, চালের কাঠের দিকে তাকায় উদাসিনীর মতো নিষ্পলকভাবে। ভবেন স্বদেশীওয়ালা হয়ে ঘুরে বেড়ায় কখনো বা সন্ন্যাসী হবার সিদ্ধান্ত নেয়, কখনো বা ঠিকাদার হবার পরিকল্পনা পাকা করে। ভবঘুরে জীবনে সংসার আছে বলে ভুলেই থাকে সে। ভবেশের সাথে এগার বছর বয়সে বিয়ে হয়ছিল সুভাষিণীর। ফাঁকা আভিজাত্যের অহংকারে বেকারের গর্বে সে যেন বিন্দাস থাকত। ভিখিরি জুড়িয়ে এনে খাওয়ানোর তোড়জোড় করত। পয়সার সমস্যা হলে সুভাষিণীর দ্বারস্থ হত। উপার্জনহীন, অক্ষম, অপদার্থ স্বামীর এহেন আবদারে অতিষ্ঠ হয়ে নিরুপায়ভাবে দিন কাটাত সুভাষিণী। ভবেন দেশোদ্ধারের নাম করে মাথা উঁচু করে টো-টো করে ঘুরে বেড়াত, জেল খাটত, স্ত্রী'র টাকা দান করে দাতা সাজত। এহেন অবস্থা দেখে

সুভাষিণী বলে—

> "তোমার বাপের ভিটে দেনার দায়ে নিলামে চড়ে আমার বাপের দেওয়া টাকায় দেনা শোষ করে সে ভিটে বাঁচে। তুমি যাও সত্যাগ্রহ করতে! একবারও মনে ভেবে দেখ না, যুবতী স্ত্রী কি খাবে, কি পরবে, কে দেখবে তাকে!" [৪১]

ভবেন স্ত্রীর কাছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার টাকা নিয়ে দেনার মধ্যে পড়েছে। সে জন্মান্তরে সুদসুদ্ধ পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

সুভাষিণী একাকিত্বের সুযোগে, রাগে, অভিমানে বিষম জ্বালায় প্রতিশোধের উপায় না পেয়ে নিজেই নিজেকে শেষ করার উপায় খুঁজে পায়। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে এ জীবনযন্ত্রণার মুক্তি খুঁজেছে সে। সংসার বন্ধনের প্রারম্ভ থেকেই পরস্পরের মধ্যে সহনশীলতা ও আপোষের অভাব দেখা গেছে। যেখানে স্ত্রীকে রোজগার করে খাওয়ানোর সামর্থ হারায় ভবেন, সেখানে বিবাহের পঁচিশ হাজার টাকার অহংকারে নিজেকে চালিয়ে নেওয়ার কথা বলে সুভাষিণী। ভবেনের যুক্তিতে উভয়েই খেটে সংসারে বাঁচতে হবে; কিন্তু সুভাষিণী তা চায় নি এমনকী সমঝোতার কথা বাদ দিলেও রুচির মধ্যে বিস্তর তফাৎ ধরা পড়ে—

> "ভবেন খেত মোটা চালের ভাত। ডাল একটা তরকারি। বাড়িতে সে তার জন্যে স্বতন্ত্র রান্নার ব্যবস্থা করেছিল। সুভাষিণীর সংসারের জন্য ব্যবস্থা ছিল তার রুচিমত। এই নিয়ে অনেক অশান্তি হয়ে গেছে। সুভাষিণীর জেদ— তার রুচি অনুসারে খেতে হবে। ভবেন চলত নিজের রুচি নিয়ে।" [৪২]

ভবেন কখনো মহাত্মাজীর সত্যাগ্রহের শরিক। আবার কখনো জেল খেটে গ্রামে ফিরে এসে ছোটলোকদের নিয়ে পাঠশালা, সেবাসমিতি— এসব করেই দিন কাটায়। কিন্তু সুভাষিণী জানে সংসারে যারা অক্ষম তারাই কেবল অবিশ্বাসী। সে এও জানে স্ত্রী'র কাছে দন্ডমুন্ডের মালিক স্বামী। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের জন্য ভবেনকেই দায়ী করেছে সুভাষিণী শ্রদ্ধা ও স্পর্ধার সাথে—

> "না না, তোমার চোখ রাঙানিকে ভয় করি না আমি। নির্গুণ পুরুষের ফণা কুলোর মতই বড় হয়, ফোঁস-ফোঁসানিও তেমনি মারাত্মক হয়। কিন্তু বিষ থাকে না।" [৪৩]

ভবেন পত্নীর এই বক্তব্যে স্বীকার করে নেয় সুভাষিণী নামটি সত্যই সার্থক।

এই সুভাষিণীই ভবেনের অবর্তমানে আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। জীবনের চলমানতায় ভুল হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করতে শেখে। ভবেনের ছবি বাঁধিয়ে তারতলায় দাঁড়িয়ে দু'দণ্ডের শান্তি খুঁজে পায়, প্রণাম করে ছবিতে, যায় সেবাসমিতিতে, মেয়েদের স্কুলে, সন্ধ্যায় নৈশবিদ্যালয়ে। দীর্ঘ অদর্শনে ভবেনকে সুভাষিণীর ভায়েরা গালাগালি দেয়, আর বউয়েরা দোষ দেয় সুভাষিণীকে। ভাবতে ভাবতে সুভাষিণী অভিমানে, অনুশোচনায়, আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হয়। নূতন জীবন শুরু করার সাধ জাগে। কিন্তু জন্মান্তরে দেনাশোধ করার কথা ভেবে কাঁদতে থাকে। জেলে জেলে খোঁজ নেয়, আর নিশ্চিত হয় সন্ন্যাসীর জীবনে ভবেন হয়তো সুখী হয়েছে।

গল্পে চমক দেওয়ার মতো অনুসন্ধানের জন্য পাঠক কৌতূহলী হয়। বছরের প্রতিক্ষায় ভবেন গ্রামে ফেরে পাঁচশো টাকা দামের স্যুট ও তিরিশ হাজার টাকা দামের গাড়িতে চড়ে। দু'টি চরিত্রের এবার মানসিক পরিবর্তনে বোঝা যায় অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যেই মানসিক স্থিরতা ও ভালোবাসা লুকিয়ে রয়েছে। কেননা ভবেন সন্ন্যাসী হতে গিয়েও হতে পারে নি—

> "যাচ্ছিলাম সন্ন্যাসী হতে। বুঝেছ না; Good Luck— অফিসার আমাকে সে foolish কর্ম থেকে রক্ষা করলেন। বললেন— Young man, চল আমার সঙ্গে। তারপর মিলিটারী কন্ট্রাক্ট। একটার পর একটা। লক্ষর পর লক্ষ। সুভাষিণী was my inspiration." [৪৪]

দাম্পত্য টানাপোড়েনের যবনিকা গল্পের মধ্যে পরিহাস প্রিয়তা দিয়ে মিলিয়ে দিয়েছেন লেখক। মেকি স্বদেশিয়ানার বিপরীতে সুভাষিণীর আভিজাত্য ও দাম্পত্য প্রেম গল্পের ভরকেন্দ্রে বিরাজ করেছে।

সাপুড়েদের জীবন কাহিনি তারাশঙ্করের প্রিয় বিষয়। রাঢ়বঙ্গে লাল কাঁকুরে মাটির সাথে সাপুড়েরা জীবন অতিবাহিত করে। 'বেদের মেয়ে', 'বরম লাগের মাঠ'-এর মতো 'সাপুড়ের গল্প'-এ কোথাও বেদেনী, আবার কোথাও সাপুড়ে কন্যার চরিত্র রূপায়ণে তারাশঙ্কর সার্থকতার কারণে তার অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের প্রতি সহমর্মিতাবোধ সদাজাগ্রত থেকেছে। বেদের মেয়ে ও সাপুড়ে সন্ন্যাসীর চরিত্র নির্মাণের মধ্যদিয়ে ভালোবাসার জায়গাটি ধরে রেখেছেন লেখক। আলোচ্য গল্পে কালী বেদেনী যথেষ্ট প্রগ্‌লভ, স্বাধীনচেতা, দুঃসাহসী। কথার ধারে চলনে লাস্যময়ী সে। লোক ভোলাতে এবং পুরুষ ভোলাতে তার জুড়ি নেই। অবাধ বিচরণ মনের অসীমালোকে প্রকৃত পুরুষের সাহচর্যের বিপরীতে পুরুষ সাপ তার কাছে প্রিয় হয়েছে। আর এ কারণেই সে পুরুষ সাপকে বলে 'সাপা'। বিরাট আকারের 'সাপা' তার অতি ভালোবাসার ধন। সে মাগনের সময় একাই সাপের ঝাঁপি নিয়ে বের হয়। সবচেয়ে বেশি ভিক্ষে নিয়ে ডেরায় ফেরে আর বলে—

> ''অ কালীনাগ! তুমি নাগ হইলে ক্যানে ? নাগর হইলে না ? অঙ্গে অঙ্গে জড়াইয়া অঙ্গ জুড়াইতাম। তুমি নাগ হইলা ক্যানে ? কালীনাগ ? সাপের ঝাঁপিটার উপর কাপড় পাট করে রেখে ঘুমোয়।" [৪৫]

সাপের সাথে খেলার সাথে প্রেমানুষঙ্গ যেন গল্পের ভাবনাকে নতুন মাত্রা দিয়েছে। যৌন প্রবৃত্তির সহজাত ভাবনায় নতুন সংলাপের বয়ানে বেদেনীর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। 'নারী ও নাগিনী' গল্পের খোঁড়া শেখ-এর সাথে চরিত্র বর্ণনায় মিল পাওয়া যায়। সাপকে কেন্দ্র করে কালীর যৌবনানুরাগ এক সন্ন্যাসীর সাহচর্যে ঘটে যায়। কালীর সাপকে সেই সন্ন্যাসী মুঠোয় ধূলোর মতো বস্তু দিয়ে মেরে ফেলে। কালীরা মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, মেদিনীপুরে ঘুরে বেড়াত। অবশেষে শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে সন্ন্যাসীর সাথে কালীর ঘটে অঘটন। রাগে অভিমানে প্রতিহিংসার ছলে মনে মনে বিষ সঞ্চয় করে কালী বেদেনী। তার 'সাপা' অর্থাৎ পুরুষ সাপটি মারা যায়। তাই সন্ন্যাসীর কথামত সাপা শঙ্খচূড়ের সন্ধানে উড়িষ্যায় পাড়ি দেয় তারা। ভৈরবী ভৈরব হয়ে ঘুরে বেড়ায় খন্ডগিরি, উদয়গিরি। মদের নেশায় দিনাতিপাত করে

ভৈরব ভৈরবী। কিন্তু ভৈরবীর তাতে কিছু যায় আসে না, নেশা থেকে ক্রমশ জেগে উঠে শঙ্খচূড়ের সাপার কথা ভাবে, আর ওটাকে গলায় জড়িয়ে গান গায়—

"ও কালী নাগ গ! তুমি নাগ হইলে ক্যানে ?

নাগর হইলে না!" [৪৬]

ভৈরবকে কালী বাঘা বলেই জানে। মদের নেশায় ভালোবাসার আদরে ঠোঁটে কামড় বসিয়েছিল কালী। এ কেবল কামার্ত নারী নয়, প্রতিহিংসার জন্য অবলম্বন মাত্র মনে হয়। কালী জানে সন্ন্যাসীর জন্যই তার সাপা মারা গেছে। তার প্রেমিক-সাপা হারিয়ে গেছে চিরতরে। গল্পকার এই শয়তানীর জটিল মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা দিয়েছেন অতিসরল বাক্যের সমাধানে— 'শয়তান! ঘেন্না জন্মাচ্ছে! রাগ হচ্ছে। যত বিষ তত রাগ, তত হিংসে।' অবশ্য কালী চরিত্রটি তার পূর্ব জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছে। এত সংশয়, প্রতিশ্রুতি, তর্ক নেশাভানের বিপরীতে চরিত্রটির পিছুটান যেন পাঠকের সহানুভূতি আদায় করে। অন্তত সন্ন্যাসীর স্বাভাবিক জীবনাচরণের বিপরীতে বিচিত্রজীবন ভাবনা কালীর মধ্যে দেখা গেছে। কেবল সাপের ভালোবাসার জন্য একটি মানুষের মৃত্যু অপ্রত্যাশিত ভাবে পাঠকের ভাবাবেগকে আহত করে।

এই বেদেনী 'বেদেনী' গল্পের রাধিকার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র। সাহসে ও বিশ্বাসে জাত সাপুড়ের মেয়ে সে। আর সেই জন্য শঙ্খচূড় সাপটাকেও বাঁচিয়ে রাখেনি। অথচ তার প্রেমিক সাপার স্থান পূরণের জন্যই শঙ্খচূড় সাপাকে আনা হয়েছিল। বেদেনী জীবনের প্রসঙ্গে একটু ভিন্ন স্বাদের গল্প হলেও গল্পটি যথেষ্ট সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ। কেবলমাত্র সন্ন্যাসীর অসহায় চরিত্রের কথা বাদ দিলে অন্ত্যজ সমাজ ভাবনার সাথে ভালো গল্পের তালিকায় 'সাপুড়ের গল্প' প্রশংসার যোগ্য।

'শেষ অভিনয়' গল্পে নায়ক ও নায়িকার কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। 'মঞ্জুরী-অপেরা' প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর যাত্রার সঙ্গে যুক্ত শিল্প সম্পর্কে নানা অন্তর বাহির, সোজা ও বাঁকা পথের অনুসন্ধান করেছিলেন। মেহনতি মানুষের অতি সাধারণ জীবনকাহিনি যেমন জানতেন তেমনি বিভিন্ন বৃত্তিধারীদের কাজকর্ম সম্পর্কে চিরকাল আগ্রহ দেখিয়েছেন। বিভিন্ন পেশার মানুষ তাঁর গল্পের কুশিলব হয়ে বিচিত্র সমাজ জীবনের ছবি অঙ্কিত হয়েছে। আলোচ্য গল্পে যাত্রা সমাজের কথা তাদের প্রকৃত শিল্পী জীবনের কথা চিত্রিত হয়েছে। লেখক স্বয়ং এই গল্পের একটি চরিত্র হয়ে রয়েছেন। আত্মজীবনের পটভূমিতে যাত্রাদলের নায়ক বাপ্পা বোস লেখকের কাছে তার জীবনের অব্যক্ত কথা প্রকাশ করেছে। বক্তব্য উপস্থাপন রীতির নানান কৌশলের মধ্যে লেখকের সঙ্গে চরিত্রের সাক্ষাৎকার একটু বেমানান না হলেও গল্পটি সরাসরি বলার জায়গা ছিল। কেননা মঞ্জুরী অপেরার লেখক তারাশঙ্করকে শ্রোতা হিসেবে বিসদৃশ ঠেকেছে; অন্তত পাঠকের অনুভবের আলোকে। বাপ্পা বোস নিজের কথা বলার জন্য লেখক কথনতত্ত্বের রীতির সাথে নিজেকে না জড়িয়ে শৈল্পিক গুণের জন্য পদ্ধতির সুব্যবহার করতেই পারতেন। হয়তো শেষের দিকের গল্প রচনার ক্ষেত্রে লেখকই একটি চরিত্রের অবস্থানে সত্যাদর্শের মতো পর্যবেক্ষণ করে চলেছেন কথনতত্ত্বের নির্ভরে। ফলে পাঠক মুদ্রাদোষের তকমা থেকে গভীর মননশীল শিল্প পরিবেশক হিসেবে লেখককে দেখলে তাতে শিল্পের সাথে শিল্পীও পরিমার্জিত, ভাবকল্পনায় নতুনরূপে উদ্ভাসিত হন।

গল্পে বাপ্পা বোস একজন যাত্রাপালার দক্ষ অভিনেতা। তার জীবন কথাই গল্পের তথা যাত্রার সাথে যুক্ত। সফল নায়ক পেছনে ফিরে নিজের দুঃখময় জীবনাভিজ্ঞতার কথা বলেছে। কোনো যাত্রার দল, তার গৌরবের যুগ, তার দুঃখময় পতনের কাল— এই সবই গল্পের বয়ানে উঠে এসেছে। যাত্রাপালা অভিনয়ের সময়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া,যাত্রার পুরনো অভিনেতা-নতুন অভিনেতা, অভিনেত্রী কিভাবে দেহকে পণ্য করে উপরে আরো উপরে উঠত— এ সবই গল্পের মূল বক্তব্য। যাত্রাদলের এবং সংশ্লিষ্ট মহলের সামাজিকতা ফোটাতে গিয়ে গল্পকার বিষয়চ্যুত হন নি। গল্পের নিজস্ব সীমানার মধ্যেই অবস্থান করেছেন। গল্পে পাপ-পুণ্য বিষয়ক কোন আদর্শ প্রচার না হলেও শিল্প প্রচারের দক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ও পূর্বদিনের স্মৃতির চিরন্তন সত্যকে গল্পের মধ্যে ধরে রাখার দায়িত্বে গল্পটির সাহিত্য গুণ বেড়ে গেছে। 'মদনভস্মের পর' শীর্ষক যাত্রাপালা অভিনয়ের বিবরণ ও বর্ণনার মধ্যদিয়ে অভিনয়ের নানান বৈশিষ্ট্য ও বিচিত্র প্রকাশভঙ্গির ছবি এঁকেছেন গল্পকার। বাপ্পা বোস আলোচ্য কাহিনির নায়ক। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে গেছে গল্পের মুখ্য নারী চরিত্র যে যাত্রা জগতের এককালের নামকরা অভিনেত্রী-বিনোদিনী।

বাপ্পা বোস যাত্রাদলে পঁয়ত্রিশ বছর ধরে অভিনয় করেছে। শিশির-যুগের থিয়েটারের আমলেও যাত্রাপালায় সীতা সাবিত্রী সাজত ছেলেরা। তাদের মধ্যে রোমান্টিক ঝোঁক পবিত্র ছিল কিন্তু মেনকা, ঊর্বশীর সাজের প্রকৃত মেয়ে অভিনেত্রীদের মধ্যে পবিত্রতার অভাব ছিল বলে বাপ্পা বোসের ধারণা। এমনকী এই রোমান্টিসিজিম কলকাতার দর্শকদের মধ্যেও ছড়িয়ে ছিল অবশ্য থিয়েটারের মেয়েদের মধ্যে। কিন্তু যাত্রাদলের লোকেদের মধ্যে এই অনুভব সীমাবদ্ধ থাকায় বাপ্পা বোসের গর্ব হয়েছে। আর বিনোদিনী যে যথেষ্ট দক্ষ অভিনেত্রী সুনামধন্যা, তার বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—

> "বিনোদিনী মেয়েটা যে যুগের, বয়সে রূপে লাস্যে-হাস্যে পটিয়সী মেয়ে, সে যুগে যাত্রাদলের সকলেই বিনোদিনীর নামে চঞ্চল হয়ে উঠত। মনে মনে মেয়েটার সঙ্গে প্রেমে পড়েই ছিল সবাই। যে সুযোগ পেত সেই খুশি হত।" [৪৭]

তৎকালীন সমাজে শিল্পের সাথে যুক্ত নারীদের সম্মান ও শ্রদ্ধার আসনটি ঠিক কোনখানে থাকত তার একটা সঠিক মতামত ব্যক্ত করেছেন বাপ্পা বোসের মধ্য দিয়ে। কুলবধূদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে অভিনয় ও প্রেমাসক্ত হওয়ার থেকে বেশ্যার মেয়ে বেশ্যা বা পতিতালয়ের নারীরা অনেক বেশি উচ্চমনের হয়। সুখের সাগরে অবগাহন করতে হলে সঠিক পথ চিনে চলাই যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত। অভিনয়ের জগতে প্রেমের আবেদনকে সমঝে চলা, সঠিক পথে নিজেকে জড়িয়ে দেওয়ার মতো বোঝাপড়ায় বাপ্পা বোস যথেষ্ট বিচক্ষণ ব্যক্তি।

আসলে শিল্পীর মৃত্যু হলেও শিল্পের মৃত্যু হয় না। সৃষ্টির রহস্যে অভিনয়ের দক্ষতায় তার যুগ ছাড়িয়ে যায়। তাই বিনোদিনী কেবল একটি নারী নয় শিল্পের সাথে যুক্ত একটি সৌন্দর্য, একটি যুগ, যা রহস্যের মতো। কল্পনায় নয়, বাস্তবের পরিসীমাতে একমাত্র বাপ্পা বোসের জবানীতে উজ্জ্বল হয়েছে তার চরিত্রের সাথে শিল্পের সম্পর্ক। যাত্রাদলের পুরুষ খেকো বাঘিনী অভিনেত্রীর এত সংহত বর্ণনায় তারাশঙ্কর যেন ভালোবাসার গভীরতাকে সুদূরপ্রসারী করে পাঠকের অনুভবে জাগিয়ে রেখেছেন। একজন স্বৈরিণী

স্বভাব নারীর প্রগ্‌লভতাকে, সংরাগতপ্ত হৃদয়কে বিচিত্রভাবে, দরদ দিয়ে সার্থকভাবে দেখিয়েছেন তারাশঙ্কর। যা বঙ্কিমচন্দ্রের সৌন্দর্যময়ী নারীদের সাথে একমাত্র তুলনীয়। হিরো হিরোইনের এই রসালো বর্ণনায় বিনোদিনীর প্রতি শ্রদ্ধার সাথে একটি চিরকালীন শিল্পীকে পুনরাবিষ্কারের আনন্দে তৃপ্ত হয়েছেন তারাশঙ্কর।

বাপে তাড়ানো মায়ে খেদানো ছেলের মতো বাপ্পা বোস যৌবনেই যাত্রাদলে যোগ দেয়। এদিকে 'মদনভস্মের পর' পালায় মায়াবতীর ভূমিকায় বিনোদিনী অভিনয় করে। কিন্তু বিনোদিনী-এর পূর্বে বহুবার অভিনয় করেছে। আজ অভিনয় করতে নেমে যেখানে কারুণ্য, যেখানে লাস্য, যেখানে সরলতা সেখানে বেদনা এনে চরিত্রটির মূলভাবকে বদলে দেয়। এ তার ব্যর্থতা নয়, নতুন তাৎপর্যের উজ্জ্বল আরোপের জন্য। বাপ্পা বোসের মতো দুঁদে অভিনেতাকে বিনোদিনীর সঙ্গে তাল মেলাতে হিমসিম খেতে হয়। লেখকের সৃজন কৌশলে প্রতিভাবান অভিনেতার ক্ষমতা তথা শৈল্পিক গুণ যে বদলে যায় তার প্রমাণ দিলেন বাপ্পা বোসের মতো অভিনেতার কপালে ভাঁজ পড়ার ঘটনায়। এখানে শিল্প ব্যাখ্যার সাথে শিল্পী তারাশঙ্করের সৃজনশীলতা স্বাধীনতা পেয়েছে। বিনোদিনী যে মোহের বশে বাপ্পা বোসের অভিনয়ে মজে ছিল তার বিপরীতে প্রতিদান হিসেবে লজ্জা, আনন্দকে দূরে সরিয়ে মোকাবিলা করেছে। আর এটা করতে পেরে যেমন আনন্দ পেয়েছে তেমনি প্রণয় নিবেদনের শেষ অবলম্বন হিসেবে নিজেকে জড়িয়েছে। নিভে যেতে যেতে একবার সর্বশক্তি দিয়ে সে জ্বলে উঠেছে। প্রায় চল্লিশ বছরের ব্যবধানে বিনোদিনীর মধ্যে সুমতিকে আবিষ্কার করতে বাপ্পা বোসের কেটে গেছে পুরো অভিনয়ের জীবন। তবুও সংশয় নিরসন হয়নি তার—

> "আবার তাকে আড়ালে নিয়ে প্রশ্ন করলাম— বললে না তুমি কে ? হেসে সে বললে— কেন নাম লুকোবার কুমতি হবে কেন ? আমি বিনোদিনী। ভারী পার্ট করলেন। ভারী ভাল লাগল। অনেককাল থেকে বাসনা ছিল আপনার সঙ্গে নামব প্লে করব। ভারী ভাল লাগল। সাধটা মিটল আমার।" [৪৮]

এই অভিনয় সঙ্গলাভ প্রণয়ভাবনা নারীসঙ্গ লাভের মাঝেই পরিচয়-অপরিচয়ের রহস্যে গল্পের উপসংহার দেখা যায়। দীর্ঘ অভিনয় জগতে নানা তথ্যের টানাপোড়েনের পর নায়িকার মৃত্যুতে কার যে দোষ তা নিরসনের রহস্যে মোড়া সমাপ্তিই যেন 'শেষ অভিনয়ের' শেষ কথা।

'শেষ অভিনয়'-এর প্রসঙ্গ সূত্রে 'অভিনয়' গল্পটির অনেকাংশ গড়ে উঠেছে। একজন সাহিত্যিক ও শখের থিয়েটারের লোকেরা এই গল্পের ভরকেন্দ্রে অবস্থান করেছে। গল্পে তত্ত্ব প্রচারের কথা তেমন নেই, আছে অতিকথন, অসংযম। যা আঙ্গিকের সংহতিকে বিনষ্ট করেছে। গল্পের মধ্যে দুটো কাহিনি আছে— বুদ্ধিজীবীদের একটি এ্যামেচার থিয়েটারের ক্লাব, তারা 'কালরাত্রি' নামে নাটক করতে চায়, এক গল্পকার সোজা সরলভঙ্গিতে তা বর্ণনার সাথে আর একটি গল্পের সংযোগ ঘটিয়েছেন। 'শেষ অভিনয়' গল্পের যাত্রাওয়ালারা যে পালাটির অভিনয় করেছিল সেই 'মদনভস্মের' পালাগানের কথা ইঙ্গিতে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল কাহিনির সাথে এই পালাটিকে মিলিয়ে গল্পকার ভিন্ন তাৎপর্যের পরিচয় তুলে ধরতে

চেয়েছেন। তবে মূল গল্পের সঙ্গেই গল্পরস প্রোথিত রয়েছে বলা যায়। গল্পের নাটকে একটি চতুর নার্স নায়িকা হয়, আর মধুকর রোমান্টিক শিল্পী তথা নায়ক। গল্পটি অতিনাটকীয় এবং নার্সের চরিত্র ছাড়া অন্য কোনো আবেদন তেমন নেই বললেই চলে। 'কালরাত্রি'তে স্ত্রী'র মৃত্যুতে মনস্তাত্ত্বিক রোগী হয়ে পড়া নায়ককে চিকিৎসা করতে গিয়ে মনোরোগের ডাক্তার নাটকসুলভ এক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে। পুরুষদের চিত্তচাঞ্চল্য এবং ব্লাকমেল করে জনৈক প্রেমিক ডাক্তারকে আত্মহত্যায় বাধ্য করেছিল যে নার্স তার উপর ভার পড়ল মৃত স্ত্রী'র অভিনয় করে মধুকরকে সুস্থ করে তোলার। নার্সটি তা করে সফল হয়। কিন্তু তারপর সে কেন যে বিষ খেয়ে মরে তার স্পষ্ট কারণ অধরাই রয়ে যায়। মধুকরের উন্মাদের মতো ভালোবাসায় খাঁটি প্রেমিকের উপস্থিতিতে হয়তো সত্যিকারের ভালোবাসার প্রতিদানের অভিনয়ে মেয়েটি নিজেকে হারিয়ে ফেলে। মৃত পত্নীর ভূমিকায় অভিনয় জীবিত পত্নীর দাবীতে দিশাহীন হয়ে পড়ে। হয়তো সত্য প্রেমের স্পর্শে নিজেই হারিয়ে যায়। এই সব অনুমান পাঠক অনুভবে ছোটগল্পের তত্ত্বে মিলিয়ে নিতে হয়। লেখকের দর্শন হয়তো পাঠকের মধ্যে মিশতে চেয়েছে অলিখিত বক্তব্যের সূত্র ধরেই। তবে 'কালরাত্রি' নাটকের কাহিনিটি তেমন চমকপ্রদ নয়। অভিনয়কালীন সময়ে নার্সের ভূমিকায় অভিনেত্রী সীতা সেন কীভাবে নাটকের লেখক ও নায়কের চরিত্রাভিনেতা অংশুর প্রেমাসক্ত হল কিংবা অংশুই সীতা সেনের প্রেমে পড়ল এই প্রেম কাহিনি গল্পের বিষয়ে জায়গা পেয়েছে।

তাদের এই প্রেম পর্বে আগ্রহ সংশয় উপেক্ষার সাথে অনুরাগ অভিমান ও সাক্ষাৎ দর্শনের মধ্যে স্বাধীনচেতা ভাবনা পাঠকের অনুভবকে আকৃষ্ট করে। সীতার চরিত্র যথেষ্ট আধুনিকা নারীর বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। অংশুও জীবনে বিয়ে করে স্থায়ী হতে চায়নি। সীতার বিশ্বাস বিয়ের পরে প্রেম অল্পেই উবে যায়, আর বাকি থাকে কেবল 'লিগাল প্রষ্টিটিউশন'। একটু অধিক মাত্রায় স্মার্ট সীতা তার জীবনকে অন্যের থেকে যথেষ্ট আলাদাভাবেই দেখেছে। কিন্তু 'কালরাত্রি' নাটকটি অভিনয় সূত্রেই অংশু'র সাথে সাহচর্য ও সহাবস্থান তাদের অজানা রহস্যকে অনেক বেশি আকৃষ্ট করে প্রেমের রসাবেদনে বেঁধে দিয়েছে। অংশুমানের লেখার ঘরে মেয়েটির শুভাগমন যথেষ্ট মৌতাত ছড়িয়ে দেয়—

> "আজ মেয়েটিকে অন্যরকম লাগছে। আশ্চর্য মনোহারিণী এবং এলানো শ্যাম্পু করা চুলের মধ্যে একটা এলোমেলো নেশা রয়েছে। মেয়েটি বসেছে সামনেই। তার বিপরীত দিকে। বেশ মৃদু একটি গন্ধ আসছে।" [৪৯]

প্রেমের এই রসঘন মুহূর্তের পর ক্রমশ কাছে এসেছে তারা। হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ না করে দূরত্ব রাখতে চেয়েছে। আর সে কারণেই সীতা দুর্বল থেকে দুর্বলতর মুহূর্তে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। সে পার্ট করতে পারবে না। কিন্তু সাহিত্যিক অংশুমান তাকে পার্ট না করাতে পারলে ধন্য হবে না। অংশুমান বলতে পেরেছে—

> "— সাহিত্যিক অংশুমান তোমার প্রেমে পড়েছে ? এবং ভয় হচ্ছে অভিনয় করতে গিয়ে তুমি তার প্রেমে পড়ে যাবে ? নির্বাক স্তব্ধ হয়ে গেল সীতা। তার সুন্দর মুখ পেইন্টের রঙে আরও সুন্দর হয়ে উঠেছিল— সে মুখ যেন কালো হয়ে গেল। দুটি অশ্রুর ধারা তার চোখের কোণ বেয়ে নেমে এল।" [৫০]

এরপরেও সীতা প্রখরা উদ্ধত উগ্রভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্যদিয়ে নিজেকে অভিনেত্রীর ভূমিকায় প্রমাণ করে। লোকে তার অভিনয় দেখে স্তম্ভিত হয়। প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের কাঁদিয়ে সে বিদায় নিয়েছে। গল্পের শেষে পাঠকের কৌতূহলকে লেখক হতাশ করেছেন সীতার সাথে অংশুমানের বিবাহ না দেখিয়ে। মাঝেমধ্যে রান্না করা খাবার অংশুকে দিতে আসে সীতা। কিছুটা সময় কাটিয়ে অভিনয়ের মতোই আবার ঘর তথা প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে যায়। লেখক গল্পের শেষে একটি মোচড়ে সম্পর্ককে অভিনয়ের সূত্রে জীবন নাট্যের লীলা ক্ষেত্রে বেঁধে দিয়েছেন—

> "তবে চিঠি লেখে। দু'জনে দু'জনকে অজস্র চিঠি লেখে। রঞ্জনের কথা মিথ্যে হয়েছে। অংশুমান চিঠি পোড়ায় না। কফি হাউসে-মেট্রোয়, চিড়িয়াখানাতেও আর দেখা যায় না। অভিনয়ও করে না— সে অংশুমানও না, সীতাও না। জীবনে অভিনয় শেষ হয়ে গেছে।" [৫১]

এই জীবনপথ, ভালোবাসার বিনিময়, দূরে অথচ কাছে থাকার চিরন্তন সত্যতায় পরিতৃপ্ত। এখানে সংযত ত্যাগ রয়েছে, রয়েছে ভালোবাসার সাথে সহনশীলতা, তাই অনুরাগের পরিসীমায় অভিমান হারিয়ে গেছে। যা রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতায়' দেখা যায় নি। কেবল মিলনে মুক্তির মধ্যেই আনন্দ নয়, ত্যাগে আত্মদহনে প্রেমের আবেগে কতটা তীব্রতর ও চিরকালীন আসক্তিময়, তা কেবল অভিনয়ে ধরা পড়ে না সত্যকার ভালোবাসায় একটি রোমান্টিক মাধুর্যে প্রতিভাত হয়েছে 'অভিনয়' গল্পে।

'জগন্নাথের রথ' গল্পে এক স্কুল শিক্ষিকা ও বাড়ি পালানো একটি ছেলের কথা চিত্রিত হয়েছে। শিক্ষিকা নিঃসন্তান ও দয়ালু, মমতাময়ী। তার স্বামীও হেডমাস্টার। দু'জনেই চাকরি সূত্রে দুই স্থানে থাকে। স্বামী নারায়ণ সুমতির কর্মস্থল দেখবার উদ্দেশ্যে রওনা হয়। স্টেশনে অন্যান্য অল্পবয়সী কুলিদের সাথে জগন্নাথকে দেখে ভালো লাগে সুমতির। সেই ছেলেকে আপন যত্নে ভালোবাসা দিয়ে বড় করেছে সুমতি। কিন্তু বয়ঃসন্ধির কালে এসে একটি দুঃখী অনাথ মেয়েকে নিয়ে সে পালিয়ে যায়। একটি বোকাটে চরিত্রের ছেলেকে নিজের সন্তানস্নেহে প্রতিপালনের আনন্দে দিন কাটাত যে দম্পত্তি তার বয়স বাড়ার সাথে এবং ঝটিতি সিদ্ধান্তে অবাক হয়ে যায় তারা। রবীন্দ্রনাথের 'অতিথি' গল্পের তারাপদ ঘরছাড়া কিশোরদের প্রতিনিধি চরিত্র হয়ে সমাজের প্রকৃত ঘটনার মতো নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে কাহিনির বয়ানকে উজ্জ্বল করেছে। তারশঙ্করের জগন্নাথ শিশু চরিত্রের মধ্যে পড়লেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান। অনেক স্বপ্ন ও ভালোবাসা দিয়ে নিজেদের শূন্য কোলকে পূর্ণ করার আশায় জগন্নাথকে ভালো মানুষ করতে চেয়েছিল শিক্ষক দম্পত্তি। কিন্তু তা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। একটি বিশেষ থিমে গল্পটিকে বেঁচে রাখা হয়েছে। যেখানে টাকা-পয়সা, ধন-দৌলত, ভালোবাসা-স্নেহ, মোহ-সম্পত্তি কোন কিছুই প্রিয় হয়ে ওঠেনি, মুক্ত বিহঙ্গের ডানা মেলে স্বাধীনভাবেই থাকতে চেয়েছে জগন্নাথ। সুমতি ভালো জামা প্যান্ট পরিয়ে পড়াশোনার সমস্ত বন্দোবস্ত করলেও জগন্নাথ স্টেশনের দিকে পালিয়ে বেঁচেছে।

আসলে জগন্নাথের জীবন অন্য এক রুচিতে গতিতে বাঁধা! যেখানে শিক্ষার কোন আলোয় সে জীবন আলোকিত হতে পারে না। নিজের মধ্যে থেকে তাগিদ না থাকলে বাইরের চাপে মানুষ নিজেকে বদলে নিতে পারে না। যেমন করে পারেনি জগন্নাথ। সুমতি মেডাম জগন্নাথকে সুখ স্নেহ দিতে চেয়েছিল,

ভালো কাপড়, জামা, খাবার থাকবার ব্যবস্থা করেছিল। এ কেবল দয়া নয় গভীর আন্তরিকতার বাহ্যিক প্রকাশ। কিন্তু জগন্নাথের কাছে এসবের কোন প্রয়োজন ছিল না। বন্ধন তার কাছে প্রিয় ছিল না। আর সে জন্যই নিজের মায়ের অপত্য স্নেহ ভালোবাসা পেয়েও সে ঘর ছাড়া ভবঘুরে। নারায়ণ বাবু ও সুমতিরা চেয়েছিল জগন্নাথ লেখাপড়া শিখে সমাজের ভালো মানুষদের মতো পরিচিতি পাবে। কিন্তু জগন্নাথ সে বিদ্যে গ্রহণ করেনি। তার অনেক বদ গুণই আগে থেকে জমা ছিল।

জগন্নাথ গ্রামের ডাক্তারখানায় রোগীদের সহায়ক হিসেবে কাজ করত। রোগীদের বাড়ির দূরত্ব অনুসারে তাদের নামের অবস্থান ঠিক করে দিত। স্টেশনের ঘন্টা বাজানো কিংবা কুলিদের বা যাত্রীদের টুকিটাকি প্রয়োজন মেটানো, স্টেশন মাস্টারের হয়ে টিকিট আদায়— এই সমস্ত কাজে সে ছোট থেকেই হাত পাকিয়েছে। নবগ্রামের মেয়েদের স্কুলের হস্টেলে তার নানা রকমের দায়িত্ব। এইসব কাজ সে বিনা পারিশ্রমিকেই করতে পারে, কোন কিছুই প্রত্যাশা করে না। সুমতির কাছে চিন্তা বা আশাহত বিষয় থাকলেও এই ভবঘুরে ছেলেটিকে পথে ঘাটে গ্রামের স্কুলে স্টেশনে সর্বত্রই মানুষ সমাদর ও ভালোবাসা দিত। উদ্দেশ্যহীন কোন বিশেষ আদর্শ ছাড়াই জনকল্যাণমূলক কাজে সহজাত প্রবৃত্তিতে গড়া ছিল ছেলেটি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালীর' অন্তহীন পথের যাত্রী অপুর সহযাত্রীর আসনে জগন্নাথ জায়গা করে নিয়েছে।

এই অন্তহীন পথ চলার আনন্দের সাথে উদ্দেশ্যহীন যাত্রায় মানুষ যে হারিয়ে যায় চিরকালের জন্য এই সত্যবাক্যে জগন্নাথের মতো উদাসী ছেলেরা প্রকৃতির কোলেই বাঁচার আনন্দ খুঁজে নেয়। জগৎটাকে দেখার আনন্দ এদের মধ্যে দেখা গেল না। অন্তত নারায়ণবাবুর মতো হেডমাস্টারও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন—

> "হেসে বলে ছিলেন— দেখ! লেখাপড়া নাই শিখল বাবু, বাবু নাই হল— কি আসে যায় তাতে ?" [৫২]

এই বাক্য স্ত্রীর সান্ত্বনার জন্য হলেও সমাজের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নয়— অন্তত প্রধান শিক্ষক যেখানে শিক্ষাজগতের আলো বিতরণ করে সমাজের অন্ধকার দূর করেন। কিন্তু আমরা দেখেছি গল্পে বাউন্ডুলে জগন্নাথের মতির কাছে নতি স্বীকার করেছে এই দম্পতি। গার্হস্থ্য বন্ধন ও প্রীতি শৃঙ্খলা অসহিষ্ণু হতে মুক্তির স্বাদের আশায় জগন্নাথের জীবন ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছে। ভিখিরি মেয়েকে ভালোবেসে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও প্রধান শিক্ষক নারায়ণবাবু জগন্নাথকে ভালো থাকার জন্য দূর থেকে আশীর্বাদ করেছেন। আর রাগে অভিমানে হতাশ হয়ে সুমতি জগন্নাথের জন্য আশীর্বাদের বাণী গোপন করে বলেছেন 'না'। মায়ের প্রাপ্য সম্মান ও লাঞ্ছনা জগন্নাথের মায়ের থেকে সুমতিই বেশী গ্রহণ করে চরিতার্থ হয়েছে। আসলে জগন্নাথেরা যে পোষ মানে না বাঁধন ছাড়া গতিশীল নামকরণের মধ্যদিয়েই গল্পকার তার ব্যাখ্যা লুকিয়ে রেখেছেন। আরএ ভাবনা নারায়ণের কাছে চিরন্তন সত্যে সান্ত্বনার বাক্য হয়ে গেছে—

> "জগন্নাথের রথ যে শৈশব থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে যৌবনের পথে ছোটে সুমতি। বোকা জগন্নাথের রথ ছোটে উঁচু থেকে নীচু পথে দুর্দান্ত বেগে— জগন্নাথের উল্লাস সেই রথেই বেশী।" [৫৩]

লেখকের গল্প ভাণ্ডারে 'জগন্নাথের রথ' অতি উচ্চমানের গল্প হয়ে রয়েছে— কাহিনি বর্ণনায়, ভাষা প্রয়োগে এবং চরিত্র নির্মাণ কৌশলের গুণে।

'একটি প্রেমের গল্প' রচনায় রাঢ় বঙ্গের সাঁওতাল পল্লীর চিত্র তুলে ধরেছেন তারাশঙ্কর। তাঁর 'কমলমাঝির গল্পে' সাঁওতাল সর্দারের প্রসঙ্গ থাকলেও সাঁওতাল সমাজের জীবন কথা তেমন চিত্রিত হয়নি। শেষ পর্যায়ের গল্পের মধ্যে সেই অপূর্ণতা লেখকের বিচক্ষণতাকে পূর্ণতায় রাঙিয়ে দিয়েছে। সাঁওতাল যুবতী, তাদের সমাজ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত পরিবারের যুবক যুবতীর কথা আলোচ্য গল্পের বিষয় হয়েছে। গল্পটি সাঁওতাল সমাজের এবং জীবনের আলেখ্য। বাঙালী সমাজের কথা, জাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের কথা তারাশঙ্করের রচনায় ঠাঁই পেয়েছে। কিন্তু অবাঙালী সাঁওতালদের যে সমাজে রক্ষণশীলতায় কেবল গোপনীয়তা, স্বাতন্ত্র্য, তাদের মেয়েদের চালচলন, পোষাক, নিয়ম, শ্রম ও সম্পত্তির অধিকার, নাচগান, বিবাহ, উৎসব-পরব— এ সবই সমাজতাত্ত্বিক দার্শনিকের ভূমিকা নিয়ে তারাশঙ্কর বিচিত্র রঙের পসরা সাজিয়েছেন। সাঁওতালদের যৌথ শিকার উৎসবের আনন্দ ও রোমাঞ্চকর ঘটনার বর্ণনা লেখককে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছিল বলেই পরিণত বয়সে এসেও সেই সমাজের কথা না লিখে পারেন নি। তবে কথনতত্ত্বে উত্তম পুরুষের পাশাপাশি গল্পের প্লট পরিবর্তনে পাঠকের কাছে মার্জনা চাওয়া লেখকের নতুন ভাবনা মনে হবে— 'এক মুহূর্ত অবসর দিন পাঠক! আমি আত্মসম্বরণ করে নি।' এ হেন বাক্য শেষ বয়সের মুদ্রাদোষ কিনা তা ভাবিয়ে তোলে। লেখকের নাতনি শকুন্তলার গলায় রবীন্দ্রনাথের গান— 'কালো ? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ' আকাশময় ছড়িয়ে পড়েছে। কালোর নান্দনিকতায় তারাশঙ্কর হাসি, বুধন, ফুলমণিদের চিত্রায়িত করেছেন।

লেখক সাঁওতালদের দল বেঁধে কাজ করার যেমন ছবি এঁকেছেন তেমনি সাঁওতাল মেয়েদের বিচ্ছিন্নভাবে ভদ্রলোকেদের বাড়িতে কাজ করার ছবিও এঁকেছেন। সুন্দরী কালো মেয়ে ফুলমণি মজুরিণী খেটে বেড়াত—

> "ফুলমণি দীর্ঘাঙ্গী তো বটেই এবং তার দেহছন্দে সুমনোহারিণী তো বটেই, তার উপর আরও কিছু আছে যার জন্য বলছি সে সুন্দরী। সুন্দর তার দুটি দোখ। চোখের সৌন্দর্য তার বোবা সৌন্দর্য নয়, সে সৌন্দর্য কথা কয়।" [৫৪]

সাঁওতাল মেয়ের অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ তারাশঙ্করও। কারণ শিল্পীই প্রকৃত শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করেন। এই ফুলমণির সম্ভ্রম বোধ আছে। তাই কলে খাটতে গিয়ে মিস্ত্রী খাজাঞ্চীদের উত্যক্তের হাত থেকে পালিয়ে এসেছে। সে মাটি কাটে, মাটি বয়, চাষের সময় ধান পোঁতে, পৌষ মাসে ধান কাটে। দেখতে দেখতে কখন যে ফুলমণি সুন্দরী ও যুবতী হয়ে যায় তা সে নিজেও জানে না। আয়নায় নিজের মুখ দেখে এবং সাঁওতাল জোয়ানদের ভিড় দেখে সে গরবিনী ও রূপসী মনে করত। কানাই মাঝির মতো লোককে সে লম্বা গিরগিটি কুঁজো বলে সম্বোধন করে। চারটে বলদ ও পাঁচ বিঘা ধানের ক্ষেত থাকলেও সে কানাইকে বিয়ে করতে চায় না। বরং বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চায়, থানায় জানাতে চায় এমন তার সাহস। মামুদবাজার থেকে আসা বুধন মুর্মুকে সে নাম পর্যন্ত বলতে চায় না। বুধন নাম বলার পর সে বলে—

"আমি ফুলমণি বটি।

— তোমার নামটি ভাল বটে।

—সত্যি নাকি ?

— হঁ। ফুলের মতন বট হে তুমি।

— অঃ। মাথার চুলে পরবি নাকি ?

— হঁ। মনটি তাই বটে।

— হঁ। তু খুব লাগর বটিস। ফুল পরবি চুলে! যাঃ পালা! ফুল পরা এত সোজা লয়! যা! যা! লইলে লোক ডাকব আমি। যা!" [৫৫]

প্রেমের আপাত আবেদনে ফুলমণি ধরা দেয়নি। দীর্ঘ জীবনের উত্থান পতনে নিজেকে তৈরি করেছে নার্সরূপে। ইচ্ছে ও জেদের সমীকরণে সে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে। নিজের সমাজ জীবন ছাড়িয়ে মানব সেবায় হাসপাতালে নার্সের কাজ নিয়েছে সে। আর শেষ জীবন পর্যন্ত বিবাহ না করে ফুলের মতো নিষ্পাপ ও সৌন্দর্যের অধিকারিণী রূপে উজ্জ্বল থেকেছে। ফুলমণির সাথে লেখকের তথা কথকের সাক্ষাতে জানা যায় তার মা মরে গেছে। বুধনের এক পাল ছেলে। মদ খেয়ে হাঁপানি হয়েছে তার। ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখার জন্য ফুলমণি বুধনকে সামান্য টাকা পাঠায়। আর লেখকের নাতনি শকুন্তলার খোঁজ নিয়ে জানতে পারে সে কলেজে প্রফেসারি করে। তারও বিয়ে হয়নি কেবল বর অপছন্দের জন্য। লেখক সাঁওতাল মেয়ের গল্প বলে নতুন যুগের সাথে আদিবাসী জীবনধারাকে যুক্ত করতে চেয়েছেন। ফুলমণির সামাজিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে লেখক স্বাধীন ভারতের পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি, জাতপাতহীন মানব সমাজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আর এই মিশ্র সংস্কৃতিতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বজায় থাক, মানবিক মূল্যবোধ মর্যাদা পাক এ বোধ লেখকের মজ্জাগত ছিল। প্রেমের উপাখ্যানে প্রণয়ী বুধনকে তার দুর্দশার জন্য নার্স ফুলমণি যেভাবে অর্থ সাহায্য পাঠায় তাতে মেয়েটির চরিত্রের মহানুভবতা, ত্যাগ ও ভালোবাসার গভীরতা একটি স্বাতন্ত্র্যে বাঁধা রয়েছে।

কথকের নাতনি শকুন্তলার মতো ফুলমণিও সমাজের কল্যাণ কর্মে যুক্ত হয়েছে। দু'জনেই অবিবাহিতা থেকেছে ভালো বর পায়নি বলেই। আসলে পুরুষ নিয়ন্ত্রিত সমাজের কাছে এরা হার মানেনি বরং পুরুষের উগ্র প্রেমাবেদনে বিকৃত ভালোবাসার শিক্ষায় এরা যথেষ্ট সচেতন হয়েই সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। আর সাঁওতাল সম্প্রদায়ের জীবন যাপনের ভাবনায় তাদের কর্মের সঠিক সন্ধানের প্রত্যাশায় লেখকের স্বপ্ন অধরা থেকেছে বলা যায়। তবে ফুলমণির সলজ্জ আবেদন, তার মধ্যে পূর্বরাগ ও অনুরাগের সমীকরণকে নতুন রঙে রঙিয়ে দিয়েছেন লেখক। তীব্র কামনা বাসনার রসাবেদনে, প্রবল বিক্ষোভে লেখকের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গী ও নতুন রূপে ছবি এঁকেছে। যা অতি উচ্চ পর্যায়ের সাহিত্য সাধকের কর্ম।

'শঙ্করীতলার জঙ্গলে' গল্পটি চলচিত্রের ভাবনায় নাটকীয়তা পেয়েছে। আসলে ষাটের দশক থেকে সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনায় তারাশঙ্করের গল্প-উপন্যাস চলচিত্রের মাধ্যমে বহুল পরিচিতি পাওয়ার ফলে শেষ পর্যায়ের রচনার মধ্যে সেই ভাবকল্পনা প্রভাব ফেলেছে বলা যায়। আলোচ্য গল্পটি যথেষ্ঠ

নাটকীয় আকর্ষণে উপভোগ্য। ঘনশ্যামের ফাঁসি হওয়ার পর তার লাশ পুলিশ ডোমদের দেয় সৎকারের জন্য। ঠিক সেই সময় শ্মশানে এসে উপস্থিত হয়েছে মৃত ব্যক্তির শাঙা করা বউ গীতা। সে শেষ বারের জন্য স্বামীর মুখ দেখতে চায়। গীতা চরিত্র অঙ্কনের মধ্য দিয়ে লেখকের সৃষ্টির আনন্দ নতুন রসায়নে লুকিয়ে রয়েছে। বাৎসল্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে অজ্ঞাত এক ভয়ের বাতাবরণ। যা আতঙ্কের, আত্মবোধের, সংশয়ের মধ্যে সংকোচের। অবশ্য লেখক আমাদের অজ্ঞাত রেখেছেন গীতার জন্ম পরিচয় সম্পর্কে। তবে তার দেড় বছরের মেয়ে টুলুকে তার শাশুড়ী ও দেবর মেরে ফেলতে চেয়েছিল স্বামীর সম্পত্তি লাভের আশায়। এই কারণে সে স্বামীর ঘর থেকে পালিয়ে এসেছে কিন্তু আতঙ্কের মধ্য দিয়েই তার দিন কেটেছে। গীতাদের শাঙা করার নিয়ম আছে কিন্তু সে বাপের বাড়িতে এসে শাঙা করতে চায়নি। সে ভাজবউকে স্পষ্ট জানিয়েছে একটা স্বামীর সঙ্গে ঘর করলেও মরদকে বিশ্বাস নেই আর সংসার জীবন বড়ই অশান্তির—

> ‘‘তুমি এইবার দেখেশুনে শাঙা কর বুঝেছ— তোমার ভাই চটক আছে, ‘দেখন সারি’ আছে, বয়সও কম, একটা ওই মেয়ে। অনেক মরদ—
>
> —ভাজবউ! একেবারে কোণঠাসা বেড়ালের মত গুঙিয়ে উঠল গীতা।’’ [৫৬]

দিন কয়েক পর থেকেই ঘনশ্যামের সাথে সম্পর্ক গড়ে ওঠে গীতার। সে টুলুকে জামাকাপড় দিয়ে ভালোবাসতে চেয়েছিল যাতে গীতা তাকে শাঙা করে। কখনো বা পথে একটা জঙ্গলে বসে থাকত, শিস দিত, ঢেলা ফেলে তার উপস্থিতি জানাত। সে দু’হাত দিয়ে পথ আগলাতো, আঁচল টেনে ধরত, টুলুর দায়িত্ব নিয়ে শাঙা করতে চাইত। যৌবনের উন্মাদনায় ঘনশ্যাম টুলুকে সহ্য করতে পারত না। মায়ের মন সে কথা ধরে ফেলত। ঘনশ্যামের পাথরের মতো শক্ত বুকে গীতার নরম দেহ ক্রমশ এলিয়ে পড়ত ঘনশ্যামের কামনার বহ্নিতে। আর এই কামনাবহ্নিতে বারবার ভয়ে ও অসহায়ভাবে নীরবে সমর্পিত হয়েছে গীতা। তার শক্ত বাহুর কাছে একমুখীন প্রেমাবেদনে গীতা বারবার সরে এসেছে, টুলুর জন্য প্রতিবাদ করেছে, কিন্তু দূরত্বের ব্যবধান বজায় রাখতে পারেনি। এই ঘনশ্যাম একদিন গীতাকে দেখে মুগ্ধ হয়, তার ভালো লাগে। ঘনশ্যামের হাতে পয়সা ছিল, দুটো বিয়ে হয়েছে। আবার তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়িও হয়েছে। বউ খুঁজতে সে গিয়েছিল শহরে। পথে দেখেছিল কুটুম বংশীবদনের বউ গীতাকে। সেই ভালোলাগা ক্রমশ ভালোবাসার চোরাস্রোতে ঘুরপাক খেয়ে এগিয়ে চলে গীতার প্রতিবাদ সত্ত্বেও। গীতা মেয়ে টুলুকে আড়াল করতে চেয়েছিল বারবার। কিন্তু ঘনশ্যামের বিকৃত রুচির কাছে পাশবিক আচরণের কাছে গীতা অসহায়, উপায়হীন। অবদমিত যৌনক্ষুধায় অসামাজিক সম্পর্কে বারবার নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছে ঘনশ্যাম। অথচ একদিন শঙ্করীতলার জঙ্গলে জাগ্রত দেবতার থানে প্রতীক্ষা করেছিল। ঘনশ্যাম গীতার কথামত সেই প্রতীক্ষায় সায় দেয়—

> ‘‘ঘন জঙ্গলের ভিতর থমথমে আবছা আধো আলো আধো অন্ধকারের মধ্যে ওই জট জটিল বটগাছটার তলায় গীতা নিজের চোখ দুটি বিস্ফারিত করে পৃথিবীর সেই আদিম দেবতা উপলব্ধির মহিমা এবং গুরুত্ব ফুটিয়ে ঘনশ্যামের দিকে তাকিয়ে বলেছিল—

দেখ, শঙ্করী-মা সামান্যি নয়। মনে এই টুকুন খল-কপটতা থাকলে ফেটে মরে যাবে। হ্যাঁ!। দেখ।

ঘনশ্যাম মায়ের থানের বেদীতে হাত দিয়ে বলেছিল— এইটুকুন খল থাকলে— হে মা যেন আমি ফেটে মরে যাই!" [৫৭]

কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার পরেও গীতার সন্দেহ ও ভয় দূর হয়নি। মায়ের মন ঠিকই ভেবেছিল। ঘনশ্যাম টুলুকে ছিনিয়ে নিয়ে মেরে ফেলে। গীতার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে ঘনশ্যামের জেল ও ফাঁসি হয়। ঘনশ্যাম কেন তার প্রতীজ্ঞা ভঙ্গ করল কেন সে মিথ্যা ভালোবাসায় নিজেকে আড়ালে রাখত, নাকি তীব্র প্রেমাসক্তির মোহে টুলুকে হত্যা করল এইসব প্রশ্ন চলে আসে। যার সঠিক উত্তর নেই। তবে গীতাকে পূর্ণ সময়ের জন্য পাবে বলে তার প্রেমের প্রদীপকে জ্বালিয়ে রাখতে চাইত তাই হয়তো টুলুকে হত্যা করেছে। টুলু ঘনশ্যামের কাছে যেমন দেওয়াল ছিল তেমনি গীতার মাতৃত্ব রক্ষার চাপে গীতাও ভয় পেত। টুলুকে আড়াল করতে না পারার জন্য। আবার টুলুকে কন্যারূপে ভালোবাসার বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিল গীতা। আর এই বন্ধনের তাগিদেই একদিন তার পূর্বস্বামী বংশীবদনকে ত্যাগ করে চলে এসেছিল। কিন্তু টুলুর প্রতি মমত্ববোধ বিয়ের আগে যতটা ছিল বিয়ের পরে গীতার মধ্যে তা বিরূপতায় পৌঁছায়। অবশ্য গীতার অসহায়তা ও সঙ্কুচিত অবস্থার কথা ভাবলে টুলুর মৃত্যু ঘনশ্যামের কাছে ক্রোধের খোরাক যুগিয়েছে। গীতাকে ক্রমশ দুর্বল করেছে। একটি জটিল মনস্তাত্ত্বিক আবর্তের মধ্যে বিকৃত যৌনক্ষুধা ও মাতৃত্বের চিরকালীন সারল্য ধরা রয়েছে।

চিরন্তন মাতৃত্বের আবেদন ও চিরকালীন যৌবনাবেগ এখানে নান্দনিকতায় মর্যাদা পেয়েছে। লেখকের রচনা কৌশলে ভালোবাসার মানুষকে শেষদর্শনে সহমর্মিতাবোধ দেখিয়েছে গীতা। গীতা-ঘনশ্যামের প্রেমের রসায়ন কতটা প্রগাঢ় ছিল তার একমুখীন দৃষ্টি ধরা রয়েছে। গীতার মনে আতঙ্ক-বিকার জন্মানোর ভিতটি পরিস্ফুট না করেই জঙ্গলের ঘন অন্ধকারের মতোই তাদের জীবনকথা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে হারিয়ে গেছে। নামকরণ তাই ঘনশ্যাম ও গীতা না হয়ে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।

তারাশঙ্করের জীবনের একেবারে শেষের দিকে লেখা গল্প 'সখী ঠাকরুণ' শেষ বয়সে লেখা হলেও 'সখী ঠাকরুণ' গল্পটিতে সাহিত্যগুণের ঘাটতি ঘটেনি। আলোচ্য গল্পে তারাশঙ্কর তাঁর লেখার সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে পূর্ণ গৌরবে স্বমহিমায় ফিরে এসেছেন। সখী ঠাকরুণ পদটি দেবালয়ে ভৈরবী পদ সদৃশ। কিন্তু তারাশঙ্কর এখানে জমিদারদের শেষ দশার উল্লেখে কংগ্রেসী লোকদের ভালো মানুষ বলেছেন—

"জমিদার বাবু এখানেই বাসা গেড়ে রয়েছেন। সৎ লোক বলে খ্যাতি আছে লোকটির, তার উপর কংগ্রেসী লোক, খদ্দর-পরা মানুষও বটেন।" [৫৮]

শেষ পর্যায়ের গল্পগুলিতে গান্ধীবাদী দর্শন সত্যমিথ্যা, পাপ-পুণ্য— অনেক ভালো মন্দের দোটানা আরোপিত। তাছাড়া কোথাও কোথাও অতিকথনে গল্পের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। অকারণ ঘটনার ঘনঘটায় গল্পের মূল কাহিনি মাঝে মধ্যে হোঁচট খেয়েছে। 'সখী ঠাকরুণ' গল্পের সখী ঠাকরুণ পদের

পূর্বসূত্র বর্ণনায় তেমন যোগসূত্র নেই। তবে সনাতন প্রথানুসারে শ্যামামাসীর পরবর্তী পদে অভিষিক্ত দেবাংশীর মেয়ে এলোকেশী সখী ঠাকরুণ হয়। এই সখী ঠাকরুণ পদটি বিল্বগ্রামের বিল্ববাসিনীর উদ্দেশ্যে নিযুক্ত—

> "দেবস্থানে তপস্বিনী উমার আজ্ঞাবাহিনী এবং সকল কিছুর ভার নিয়ে রয়েছেন যিনি— তিনি জয়া-বিজয়ার মতই তাঁর সখী। তিনিই এখানে সর্বময়ী। তিনিও কুমারী, তিনিই ব্রহ্মচারিণী। তাঁরই নাম সখী ঠাকরুণ।" [৫৯]

—এই সংযোগ সূত্রই গল্পকারের অশিল্পোচিত নির্মাণ কৌশলকে দূরে সরিয়ে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হতে সাহায্য করেছে।

আলোচ্য গল্পে সখী ঠাকরুণের রীতি-পদ্ধতির সাথে এলোকেশীর জীবন কাহিনি সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। শ্যামাদাসী জমিদারকে টাকা দেয়, এমনকী জমিদারের বাবাকেও টাকা দেয়। আর শর্ত থাকে যে সখী ঠাকরুণ এলোকেশী হল, দেবকৃত্য যা করবার তা সে-ই সব করবে, তবে গার্জেন থাকবে শ্যামাদাসী। লেখক এই গল্পে প্রথার সাথে জমিদারীর তোষণ এবং যৌবন কামনাকে গল্পের মূল সম্পদ তথা থিম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। যতকাল যৌবন ততকালই সখী ঠাকরুণ পদের গৌরব। কুমারীত্ব হয়েই পদের মর্যাদা রক্ষা করতে হয়। এলোকেশীর যৌবন চাঞ্চল্য ও হৃদয়াবেগ শ্যামাদাসীর কথামত দেবতার উদ্দেশ্যে সমর্পিত—

> "ইহা কথিত যে, এই সখী ঠাকুরাণী চিরকুমারী ও চিরযুবতী। ষোল বৎসর বয়সের বেশি বয়স্কা কেহ সখী ঠাকুরাণী হিসাবে নিযুক্ত হইবেন না। এবং যৌবন বিগত হইলেই তাঁহার নিজের স্থলে তিনি নূতন সখী ঠাকুরাণী নিযুক্ত করেন।" [৬০]

এই চিরযৌবনার আকাঙ্ক্ষায় সখী ঠাকুরুণরা নানারকম জড়িবুটি ব্যবহার করে। যৌবনের জ্বালা জুড়াতে পুরুষসঙ্গ লাভ করলেও গর্ভিণী না হওয়ার জন্য ঔষধ খেতে হত, নানা রকমের টোটকা। তার সাথে চলত যৌবনবন্ধনী ঔষধ। তাতে বুক ভারী ও কামোদ্রেককারী হয় কিন্তু তা ঝুলে পড়ে না। সারা শরীর এমনভাবে যৌবনসমৃদ্ধ থাকবে যাতে লোকজন বুঝতে পারবে না সখী ঠাকরুণ-এর বয়স ঠিক কত। সে অনন্তযৌবনা থাকবে শ্যামাদাসীর ঔষধের গুণে।

দেখতে দেখতে নতুন সখী ঠাকরুণ তথা এলোকেশীর বয়স হল চুয়াল্লিশ। সে সাতাশ-আঠাশ বছর থেকে ঐ পদে অভিষিক্তা। সে কেবল যৌবন গর্বে উল্লসিত নয় তার সুরক্ষিত যৌবন প্রৌঢ়ত্বেও যে অটুট তার উপলব্ধিতে উল্লসিত। সে প্রত্যহ আয়নায় নিজেকে দেখে। সৌন্দর্যের মুগ্ধতায় সুখী থাকে সে। দিনান্তে দু'বার এলোখোঁপা বাঁধার নিয়ম তার। একবার স্নানের পর অন্যবার বিকেলের দিকে। সে চুলে চিরুণি চালানোর সময় আন্দোলিত দেহের চঞ্চলিত শোভা দেখে চমকিত হয়। খুশিতে মন ভরে যায়। আসলে সে নিজেই নিজের যৌবনের সম্ভোক্তা— আশ্চর্য এক সম্মোহনে সম্ভোগের প্রবৃত্তিতে নিজেই আনন্দ খুঁজে নেয়। তার—

> "অটুট স্বাস্থ্য, নিঃসন্তান রূপসী সে, একপিঠ কালো চুল। সে কোনদিন পুকুরে, কোনদিন

ময়ূরাক্ষীর ঘাটে জলে নিজের ছায়া দেখে। চারিপাশে তাকায়— ফিরে ফিরে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে খুঁজে দেখে তাকায়। তার লম্বা চুল গুলি জলে ভাসে— তার সুডৌল স্তন দুটি অবিকল দুটি নিটোল শ্রীফল— লক্ষ্মীদেবীর স্তন-দুটির মত। পরম পরিতোষের সঙ্গে সে দেখত।" [৬১]

তার যৌবনের মৌতাতে গ্রামের অনেকেই উঁকি দিয়েছে। জমিদার নিজে এসে জানতে চেয়েছে ঘনশ্যামের সাথে তার কি হয়েছে। আসলে জমিদার তার রূপকে দেখে দুটো কথা বলতে চেয়েছে। বিশেষত সুন্দর মুখকে দেখে— 'মানুষ পাগল হয়! নানান কারণে হয়— রূপ দেখেও হয়।' এই রূপের জ্বালায় এলোকেশীকে থানায় যেতে হয়। থানার দারোগার কথামত সে সুধাংশু নামে ছেলেকে আপন ভেবে মানুষ করত। সুধাংশুই একদিন সখী ঠাকরুণ পদ থেকে এলোকেশীকে তাড়াবার জন্য মামলা করে। রাগে অভিমানে এলোকেশী অনেক পরিণত। সে সুধাংশুকে কলেজে পর্যন্ত পড়ানোর খরচ যুগিয়েছে। অথচ তার প্রতিদানে কেবল যন্ত্রণা পেয়েছে। সেই সুধাংশু ছোটবেলায় দরজার ছিদ্র দিয়ে যে রূপ যৌবন দেখেছিল আজ আর তা নেই বলে দাবী করেছে। তার কথা শুনে এলোকেশী চমকে উঠেছিল। অবশ্য উকিলের রায়ে এবং জমিদারের সাক্ষ্যের ফলে জিত হয়েছে এলোকেশীর। আমৃত্যু সে সখী ঠাকরুণ থাকবে, অন্তত নূতন সখী ঠাকরুণ পূর্ণ দায়িত্ব প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত।

মামলায় জিতে পদে অধিষ্ঠিত থাকার শেষ ইচ্ছা থাকলেও প্রকৃত পক্ষে বিগত যৌবনার জন্য তার মন ভারাক্রান্ত। প্রৌঢ় যৌবনে উপস্থিত হয়ে অনন্ত যৌবনের কামনায় বিফল হয়েছে সে। লেখক আবেগঘন সংযত বক্তব্যে এলোকেশীর মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন। যেখানে ধরা রয়েছে আয়নার সামনে অনাবৃত দেহের মধ্যে যৌবনের অস্তিত্বকে আবিষ্কার করার প্রবণতা—

"পরতে পরতে কত রেখা। ও কি বার্ধক্যের রেখা ? শরীরটা স্থূল হয়েছে ? এ মেদ কি বার্ধক্যের মেদ ? চুল ? চুল ? সাদা রূপালী রঙের চুল ? কই ? চুলগুলি হাতে নিয়ে সে দেখতে লাগল।" [৬২]

মানব জীবনের প্রকৃত রূপের সন্ধান পেয়েছে সে। এটাই মানব ধর্ম, মানব সত্য। এখানে এলোকেশীর মধ্য দিয়ে একটি প্রথার বিসর্জনের সাথে জমিদারী ব্যবস্থার পরিচয় ও বিপর্যয় দেখানো হয়েছে। মানব জীবনের চিরন্তন সত্যতাকে গল্পকার যৌবনচক্রের মাধ্যমে শিল্পায়িত করেছেন। গল্পটি অবিনব রচনার বন্ধনে কথনতত্ত্বের আবরণে উজ্জ্বল। শেষ রচনাগুলির মধ্যেও যে শিল্পগুণ যথেষ্ট মানানসই ছিল 'সখীঠাকরুণ' গল্পটি তার প্রমাণ। তাঁর রচনা আমাদের বিস্ময় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে।

দীর্ঘ সাহিত্য জীবনে তারাশঙ্কর কখনো ক্লান্ত বা ব্রতভ্রষ্ট হন নি। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য জগৎ আসলে বিধাতারই দান। তাঁর 'কবি' উপন্যাসের নিতাই কবিয়ালের জিজ্ঞাসা— 'হায়! জীবন এত ছোট কেনে, এ ভুবনে ?' এর উত্তর চিরকালই অসমাপ্ত, যা নিতাইও দিতে পারেনি। তবে মরণ নয় জীবনেরই জয় ঘোষিত হয়েছে তাঁর রচনায়— পরিবর্তনশীল সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের সাথে মানবিক সম্পর্ক, প্রথা, সংস্কার শ্রেণিকরণের মাধ্যমে সম্পর্কের দোলাচলতা, প্রকৃতি নির্ভরতার সাথে অসহায়তা,

প্রতিবাদী সত্ত্বার জাগরণের বিপরীতে নিজের প্রতি অবিশ্বাস ও ভাগ্যদোষে আশ্বস্ত হয়ে রাঢ়বঙ্গে ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে চরিত্রগুলি জীবিত থাকতে চেয়েছে। তারাশঙ্করের আদর্শবাদ, সংস্কারের প্রতি আনুগত্য, মানবপ্রেম তথা ভারতপ্রেম, শিক্ষার অবিস্তার ও দারিদ্র্যের অপমান, স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষের প্রকৃত জীবনযাত্রার সাথে সাহিত্যসৃজনে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে।

তারাশঙ্করকে মাটি ও মানুষের কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিল তাঁর মানবতাবোধ। আর জীবনের প্রতি মমত্ববোধের বন্ধনসূত্রে সাহিত্য রচনায় বিশেষ করে গল্পের পাতায় পাতায় মাটি ও মানুষের সহাবস্থান প্রাধান্য পেয়েছে— অমর্ত্যজীবন, অলৌকিক রহস্য ও চিরন্তন মানবিক আবেদন। গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন গ্রামীণ সমাজের বদল, যন্ত্রনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় আধুনিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান, গ্রামীণ সমাজ সংস্কারের পরিবর্তন তথা ভাঙন, নাগরিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে অবহেলিত গ্রামের মানুষ কীভাবে প্রলুব্ধ, চণ্ডীমন্ডপের সংস্কার শাসন এবং শতাব্দী সঞ্চিত ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিমূল কীভাবে ক্রমশ আলগা হচ্ছে— এই সব বিশ্লেষণে তারাশঙ্করের সৃষ্ট চরিত্র ঘটনা উজ্জ্বল থেকেছে। ভয়ের বন্ধন, ক্ষুদ্রতার গন্ডি, অভাবের পীড়ন জীবনে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া প্রভাবকে বহন করে চলার বিরুদ্ধে নীরবে সংগ্রামশীল তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি। তাঁর বিশ্বাস ছিল কেবল রাজনৈতিক মুক্তি বা অর্থনৈতিক সমাধান নয়, মানব জীবনের সুস্থ স্বাভাবিক মুক্তির পথই তার একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভয় থেকে, হীনতা থেকে, দীনতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজেছেন তারাশঙ্কর। যে পথে নানা বাধা, লালসার আকর্ষণ, অন্ধ আবেগ, বিকৃত রুচির পিছুটান, মৃত্যুর ছলনা, জৈব আদিম বৃত্তির খেলা থাকলেও পদাতিকের মতো নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন তারশঙ্কর জীবনের সত্যের সন্ধানে। সামন্ততন্ত্রের পরাভবের মধ্য দিয়ে ধনতন্ত্রের আগমন, অন্ধ, অশিক্ষিত অসহায় মানুষের চাওয়া না পাওয়ার যন্ত্রণা, বাস্তব জীবনের প্রকৃত মূল্য ও হাসি-কান্নার ছবি রাঢ়ের মাটি থেকে জীবন্ত চরিত্র নির্মাণ করেছেন গল্পের শরীরে। তাই রাঢ় অঞ্চলের পল্লী জীবনের রূপকার তারাশঙ্কর সৃষ্ট চরিত্রগুলি রাঢ়বঙ্গ ছাড়িয়ে সমগ্র ভারত তথা বিশ্বের দারিদ্রপীড়িত মানবাত্মার সাথে একাত্ম হয়ে গেছে।

যে কোনো শিল্পীর রচনার মধ্যে তাঁর নিজস্ব অঞ্চলের কমবেশি প্রভাব থাকে। তারাশঙ্করের রচনায় যে আঞ্চলিকতা তা রাঢ়বঙ্গের জনজীবনের পরিচিতি দেয়। তাঁর ছোটগল্পে রহস্যময় জীবনেরই বিচিত্র রূপায়ণ ঘটেছে। গভীর রহস্যে এবং গূঢ় আধ্যাত্মচেতনার তাগিদে তিনি জীবনে এক পরম প্রশান্তিময় ক্ষেত্রে উপনীত হয়েছেন। যেখানে তাঁর রাঢ় ও সাহিত্য সাধনা একটি বিশেষ জায়গা ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্য হয়েছে। আর তাঁর শিল্পরীতিতে মগ্ন থেকেছেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেশ বসু, প্রফুল্ল রায় ও সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের মতো সাহিত্য সাধকেরা। তারাশঙ্কর সময় ও সমাজের প্রকৃত অনুভূতিপ্রবণ মানুষ, মানবজীবনের প্রতি চিরানুগত শিল্পী।

গুণময় মান্না

গুণময় মান্নার গল্পে বিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছরের এই বঙ্গের সমাজ জীবনেতিহাস গল্পের পাতায় পাতায় ধরা রয়েছে। গল্পগুলি বাস্তব জীবনালেখ্য। কেননা সমাজ বাস্তবতার সাথে লেখকের নিবিড় সংযোগের ফলে গল্পের কাহিনি,চরিত্র, স্থানিক অবস্থানের বিবরণ খুবই চেনা মনে হয়। রাঢ় অঞ্চলের মানুষের জাতপাত, ভেদাভেদ ভাবনা, চাষাবাদ, জোতদার প্রসঙ্গ, সামাজিক বয়কট, রাজনৈতিক সংকট এর সাথে মানবিক আবেদন গুলি (রাগ, অভিমান, আনন্দ, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি) যেন গল্পের বয়ানে খুঁজে পাওয়া যায়। লেখকের অধিকাংশ গল্পের কাহিনি গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে নিয়ে। মানুষের বেঁচে থাকার নিরন্তর সমস্যা ও সমস্যাকারী মানুষদের মুখ ও মুখোশগুলোর প্রত্যক্ষ পরিচয় ধরা রয়েছে তাঁর গল্পে। অবশ্য পেশাসূত্রে নগর জীবনকেন্দ্রিক অবস্থান কালে গল্পের প্লটে নগর সভ্যতার কথাও খুঁজে পাওয়া যায়।

গুণময় মান্নার জন্ম ২৫ মার্চ, ১৯২৫ সালে, মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে আড়গোড়া গ্রামে। পেশায় অধ্যাপক গুণময় মান্না সাম্যবাদী দর্শনে বিশ্বাসী থেকে প্রবন্ধ, উপন্যাসের পাশাপাশি ছোটগল্পের মাধ্যমে জীবনবোধ ও ইতিহাসবোধের পরিচয় ব্যক্ত করেছেন। তাঁর সাহিত্য জীবনের সূচনা স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। পরে ১৯৪৮ সালে স্কটিশে পড়ার সময় 'পরিচয়' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'অভিজ্ঞান' প্রকাশিত হয়। বাস্তবের দেখা কৃষক, শ্রমিক, মুটে-মজুরদের জীবন-জীবিকা, সংঘবদ্ধ চেতনা ও সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসকে তিনি গল্প ও উপন্যাসের পাতায় চিত্রিত করেছেন। তাঁর 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০) উপন্যাসে স্বাধীনতা-উত্তর সময়ের তেভাগা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জমিদার জোতদারের সংগ্রামের কাহিনি উপস্থাপিত হয়েছে। আবার 'জুনাপুর স্টীল' উপন্যাসটিও স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ দলিল। কৃষিপণ্য সংক্রান্ত ব্যবসায়ীদের বাস্তব সমস্যা নিয়ে রচিত 'কটা ভানারি' উপন্যাস এবং 'শালবনি' উপন্যাসটি নকশালবাড়ি আন্দোলনের পটভূমিকায় কৃষি-শ্রমিকদের সমস্যার প্রত্যক্ষ ছবি স্বরূপ। তাঁর উপন্যাসকেন্দ্রিক রচনায় মুটেদের আত্মসম্মান, তাদের শ্রম, দুঃখ লাঞ্ছনার ইতিবৃত্ত গভীর আন্তরিকতায় ও মমত্বে ব্যক্ত হয়েছে।

কেবল উপন্যাস নয় তাঁর সব রচনার মধ্যেই সামাজিক দায়বোধের প্রকাশ ঘটেছে। জটিল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে অভাবী নিরন্ন মানুষের অসহায়তার প্রত্যক্ষ ছবি তুলে ধরেছেন লেখার মধ্যে। সমাজকে মান্যতা দিয়েই সমাজের অর্থনৈতিক সংকটের ইতিহাস যেন গোপন মনের দ্বারপ্রান্ত থেকে বেরিয়ে এসেছে। এ যেন— সার্বভৌম মানব সত্যের সত্যদ্রষ্টা স্বরূপ। সমাজ বাস্তবতার ঘনিষ্ঠ যোগ একজন লেখককে কতটা পরিণত করে তোলে তার প্রমাণ লেখক নিজেই দিয়েছেন। তাঁর গল্পের প্রেক্ষাপট যে

ঘাটাল ও তৎসংলগ্ন গ্রামীণ জীবনকথা তা গল্পের বয়ানে ধরা রয়েছে—

> "বাণিজ্যকেন্দ্র ঘাটাল শহর থেকে সড়কটা বেরিয়েছে, প্রথম চাতালটা পেরিয়েই ময়রাপুকুর, তারপর দ্বিতীয় চাতাল, একটু পরেই তৃতীয় চাতাল, তার মাথাতেই বরদা-বিশালাক্ষীর মন্দির। চাতাল— বুঝলেন তো, উঁচু সড়ক অবতলে নেমে গেছে, শিলাই নদীর বানের দেশ, জল নিকাশের জন্য, যখন জলের তোড় বেশি। তাছাড়া জল নিকাশের আর একটা খাল আছে, লোকে বলে বুড়ির খাল, শিলাই থেকে বেরিয়ে ওই দু'নম্বর চাতালের মাথায় একটা পুলের নিচে দিয়ে বয়ে গেছে, ঠিক আড়াআড়ি নয়, একটু কোনাচি করে। এ পুলটাকে কেন জানি লোকে বলে ডুবা-পোল।" [৬৩]

গল্পের এই বয়ানে রাস্তা ঘাটের পরিচয় উঠে এসেছে। এবং রাঢ়বঙ্গের নদী হিসেবে শিলাই-এর অবস্থান যে বাণিজ্যকেন্দ্র ঘাটাল শহরের পাশে লেখকের বক্তব্যে তা ধরা রয়েছে। আবার গল্পের প্রেক্ষাপট যেন ঘাটাল ও তৎসংলগ্ন এলাকাগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। 'পরিণীতা' গল্পেও প্রেক্ষাপটের পরিচয় ধরা রয়েছে—

> "ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র— সেটা ঐতিহাসিক কাল থেকে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। চন্দ্রকোণায় বাহান্ন বাজার; তিপান্নগলি এই লোকভাষিত ছাড়াও কবি-কথায় ছিল, তাঁতিরা সাজায় চন্দ্রকোণায়; রামজীবনপুরের তাঁতের শাড়ি আর পিতলের বাসন, খড়ারের প্রসিদ্ধ কাঁসার বাসন— কত কারুশিল্প আর চারুশিল্প যে এই বিরাট অঞ্চলটাকে প্রাণবন্ত করে রেখেছিল।" [৬৪]

এই স্মৃতি মেদুরতা লেখকের অন্তর থেকে মোথিত; আবেগতাড়িত নয়। কেননা যে প্রেক্ষাপটে গল্পের চরিত্রেরা জীবন্ত হয়েছে সেই প্রেক্ষাপট বাস্তব ও সত্য। বিশ শতকের ছয়-সাত-আটের দশকে গ্রাম ও গ্রামের মানুষের সঙ্গে গুণময় মান্নার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ ছিল। নিজে মফঃস্বল শহরে অধ্যাপনা করেছেন। এদিকে গ্রামের দরিত্রতম মানুষের খবর যেমন তিনি রাখতেন তেমনি চাষ-আবাদের সমস্যা, গোপালন, ওঝা, গুণিন, পশু চিকিৎসা ইত্যাদি সম্বন্ধে সজাগ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে সাহিত্যের রসদ তুলে এনেছেন।

অবশ্য জীবন ও কর্ম কেবল মেদিনীপুরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কর্মজীবনের একটা দীর্ঘ সময় মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে অতিবাহিত হয়েছে। তাই অনেকগুলি গল্পে ঐ স্থানের পটভূমি উঠে এসেছে। বহরমপুরের ইতিহাস ও ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের পরিচয় গল্পের বয়ানে ধরা রয়েছে—

> "আমাদের এই জেলা শহরের পাশ দিয়ে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী বয়ে চলেছে। শহরের দক্ষিণ দিকে কাছারি ঘাট, সেই ঘাটে প্রত্যহ কয়েক হাজার লোক খেয়া পারাপার করে; কত বিচিত্র ধরনের লোকজন সব, হাটুরে, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রী, নদীর ওপারে তারা মায়ের মন্দির, কত পুণ্যার্থীকেও দেখা যায়, শনি-মঙ্গলবারেই বেশি।" [৬৫]

এই সব বিচিত্র মানুষজন, বহরমপুর কোর্ট, স্টেশন, স্বর্ণময়ী বাজার, সুতির মাঠ, কৃষ্ণনাথ কলেজ, হাসপাতাল, জর্জকোর্ট, গার্লস কলেজ, রবীন্দ্রসদন, লালদিঘি, ব্যারাক স্কোয়ার— এসব যেন লেখকের অতি পরিচিত জগৎ। তাই তাঁর গল্পের মধ্যে মফঃস্বল শহরের অনুপুঙ্খ বর্ণনা চিত্রকল্পের মতো চোখের

সম্মুখে ধরা পড়বে। আসলে গল্পকারের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশক্তির মধ্য দিয়ে পট ও পটধৃত চরিত্র যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে। গ্রাম ও শহরের বদলের কথা, সমাজ জীবনকথা কিভাবে ধরা রয়েছে তা তাঁর নানান গল্পের মধ্যে পাওয়া যাবে।

'সমস্যাপূরণ' (১৯৬১) গল্পে শূন্য থেকে পরিপূর্ণজীবন স্বাদের পরিচয় রয়েছে নিতাই চরিত্রের মধ্যে। চারপাশের অনাত্মীয় পৃথিবী ও সুখী মানুষের আখ্যানে নিতাই চরিত্র শৈশব থেকে নিঃসঙ্গ একলা মানুষ। পৃথিবীতে একলা আসা ও যাওয়ার মাঝে স্নেহ-প্রেম, শিক্ষা, অর্থ-স্বার্থ, সম্মান, পরিজনের যে সাহচর্য তা যে পরম তৃপ্তিদায়ক জীবন ভোগের প্রয়োজনীয়তা সাপেক্ষ— এই চিরন্তন সত্যাদর্শের উন্মোচন গল্পের বয়ানে পাওয়া যায়। প্রকৃতির সাথে নিতাই-এর সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রাপ্তি যেন রবীন্দ্রনাথের 'বলাই' গল্পের সংবেদনশীল আবেদনে আবদ্ধ। যদিও নিতাই-এর আখ্যান পরিণত জীবনবোধের পরিচায়ক। আর 'বলাই' চরিত্র শৈশবের স্নেহতুরা মনকাড়া এক অনুভবকে জাগিয়ে দেয়। জীবন সম্পর্কে দুঃখ ও সুখের সহাবস্থান, অভাব ও অপ্রাপ্তি পেট ভরে না খেতে পাওয়া দিন যাপনের অবসানে একসময় ইচ্ছাপূরণের মতো সব পেয়েছে নিতাই।

বাপ মা মরা নিতাই-এর বড় হওয়ার সাথে সাথে খাদ্য ও বাসস্থানের সমস্যার কাহিনি বৃহত্তর রূপ পায়। বৃহত্তর সমাজ জীবনে সে পৌঁছে যায় দু-একজন লোকের সাহচর্যে। কেষ্টপুরে প্রমথ রায়ের ঘরে থেকে রাখালের কাজ, গরুর দেখাশোনা, সেখান থেকে মামুদপুরের বিনোদ রায়ের জমিতে চাষাবাদের কাজ, তারপর মনিবের মেয়েকে বিয়ে করে জুনপুয়ায় কুড়ি বিঘে জমি নিয়ে সংসার জীবন পাতা— "এইভাবে যখন নিতাইয়ের আটান্ন বৎসর বয়সের সময় যবনিকা উঠল, তখন দেখা গেল ওর চাইবার আর কিছু নেই।" জীবন সংগ্রামে সে সম্পদ বাড়িয়েছে— জুনপুয়ায় কুড়ি বিঘের জমি বেড়ে একশো বিঘে হয়েছে। কিন্তু এক রহস্যময় প্রশ্নের মুখোমুখিতে সে বার বার বিহ্বল হয়, কৌতূহলী জিজ্ঞাসা— 'তার আগে কী ছিলে ?' এই আত্মদর্শন তাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছে কিনা তার রহস্য থেকেই গেছে। তবে সত্যবাদীতায় উন্মোচিত হয়েছে গোটা জীবনের প্রাপ্তির পরিধি—

> ''কেনে, তখন আমার শ্বশুরমশাইয়ের চাষী ছিলম
>
> তার আগে।
>
> তার আগে প্রমথ রায়ের ঘরে গরুর বাগাল ছিলম আমি...
>
> আর তার আগে ?
>
> তার আগে আমার নিজের গাঁয়ে খেলে বেড়াতাম, আর তার আগে মায়ের কোলে কাঁখে ছিলাম, এই আর কি...'' [৬৬]

মৃত্যু শয্যায় অসহ্য যন্ত্রণায় চিৎকার করতে লাগল নিতাই। 'তার আগে কী ছিলে ?' এর সঠিক উত্তরের সন্ধানে মায়ের কোল, তার আগে মায়ের পেটে মাংসপিণ্ড পর্যন্ত সে ভাবতে পেরেছে। ব্যাকুল বিভ্রান্ত হয়েছে মৃত্যুর আসন্ন মুহূর্তে— 'আমার কথার জবাব দাও, ভ্রূণের আগে কী ছিলে তুমি ?' এমন সংকটময় মুহূর্ত রূপকের আবরণ ভেদ করে, লেখকের আক্ষেপ যেন পাঠকের মর্ম স্পর্শ করে। বিশেষ কাহিনি যেন

নির্বিশেষ তত্ত্বের সন্ধানে মগ্ন করায়। গল্পের নিতাই কিছুতেই বলতে পারেনি যে— এ সব সম্পদ, সংসার ও সম্মান তাকে অকারণে অযাচিত ভাবেই দেওয়া হয়েছিল, এখন (মৃত্যুকালে) ঠিক সেইভাবেই কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। ভ্রূণের আগে 'কী ছিলে তুমি' ...এর উত্তরও সে জেনেছে— 'তাও জেনেছি, কিছুই ছিলম নি, কিছুই নি, সব শূন্য। শূন্য থেকে...'

এই মহাশূন্যেই সে বিলীন হয়ে যায়। জীবনের অসারতা ও মহা সুখভোগের সার্থকতার বিপ্রতীপতা সে বুঝতে পেরেছে। সম্পর্কের মায়াজাল ছিন্ন করে স্বার্থ, অর্থ, পরিজন পরিত্যাগ করে মহানির্বাণ লাভের প্রত্যাশায় তার পথ চলা, অন্তিম যাত্রা। গল্পকার জীবনযুদ্ধে জয়ী হওয়া নিতাই-এর সংগ্রামী জীবনের ছবি এঁকে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছেন নিরন্ন অসহায় মানুষদের।

'শেষলগ্ন' রাজনৈতিক ভাবনামূলক গল্প। রাষ্ট্রনৈতিক কর্মী বিনয় সমাদ্দারের আজীবন উৎসর্গীকৃত প্রাণ দেশসেবার জন্য। গল্পকার পরাধীন দেশের জন্য নিজের গোটা জীবন উৎসর্গ করেছেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ, কারাবরণ-এর মধ্য দিয়ে কর্মী হয়ে ওঠা, ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেকটি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করা, আইনসভায় প্রবেশ ও দলের নির্দেশে বেরিয়ে আসা, নেতৃত্বের দায়িত্ব নেওয়ার মধ্য দিয়ে দীর্ঘ জীবনের উত্থান-পতনের কাহিনি গল্পের অবয়ব। তার বুদ্ধি-যুক্তি-নীতি-প্রতাপের কাছে বহু মানুষ ভক্তে পরিণত হয়েছে। লোকে এ সব জানলেও লেখক বলেছেন— 'কিন্তু জানে না, ভেতরে ভেতরে তিনি কতখানি ক্লান্ত' (শেষলগ্ন, পৃ. ৪২)। কেন ক্লান্ত এর অনুসন্ধানেই গল্পের কাহিনি জমাট বেঁধেছে।

স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে রাজনৈতিক দলবাজি, ক্ষুদ্র স্বার্থে বৃহৎ আন্দোলন, ক্ষমতার অপব্যবহার, শাসন ব্যবস্থার নবরূপায়ণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ 'শেষলগ্ন' গল্পের আধারে রয়েছে। একদা উৎসর্গীকৃত প্রাণপুরুষ বিনয় সমাদ্দার দেশসেবক হয়েও মন্ত্রীত্ব গ্রহণ না করে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরে রাজনৈতিক প্রতাপের পরিচয় দেয়। দেশকে ভালোলাগা ও মানুষকে ভালোবাসার মধ্যদিয়েই তাঁর বেঁচে থাকা। পঞ্চাশোত্তীর্ণ সুঠাম, বলিষ্ঠদেহী বিনয় বাবুকে আদর্শ দলনেতা হিসেবেই লোকে জানে। কিন্তু ক্লান্তি আর অবসন্নতা নিয়ে দেশসেবক বিনয়ের দিন কেটেছে তাই বিবাহ হয়ে ওঠেনি। অনুপমাও রাজনৈতিক কর্মী। তার ক্ষুদ্র স্বার্থ যেন বিনয়ের নীতি বিরুদ্ধ। শাসন ও শক্তি বলে বিনয়ের মতো মানুষ দেশের শাসনযন্ত্রকে তথা শাসন কার্যের গতিমুখকে বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু কর্মীদের অন্তঃকলহে সে বিব্রত হলেও হতাশ নয় বরং নিঃস্ব ক্লান্ত। শ্মশানে দাঁড়িয়ে তাঁর মনে হয়েছে 'এই চিতার অগ্নিজ্বালা ঠিক মানুষের অতৃপ্তি, আর অন্তর্দাহের মতো।' মানুষের বুকের ভেতরে সর্বনাশী ক্ষুধা যে কতটা জ্বালাময় সেই উপলব্ধির দ্বারপ্রান্তের ঠিকানা জানত বিনয় সমাদ্দার। মিথ্যা সাক্ষী, পুলিশী অভিযান, তল্লাশি, বোমা, পাইপগানের ব্যবহার, রাস্তায় মানুষের করুণ আর্তনাদ, শিশুদের ক্রন্দন ও শৈশব থেকে স্বপ্নভঙ্গ ইত্যাদির পরিচয় যেন বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ছয়ের দশকের পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম বাংলার জনজীবনের বাস্তব চিত্র। রাজনৈতিক জীবনের মধ্যেই তার প্রেমের আবির্ভাব। কর্তব্য, দায়িত্ব, সম্মান ও শ্রদ্ধার মধ্য দিয়ে প্রেমের অচরিতার্থতা যেন শেষলগ্নে উপস্থাপিত হয়েছে। বাস্তবজীবনের মধ্যেই সমাজসত্যের সন্ধান দিয়েছেন গল্পকার।

'অহোরাত্র' গল্পে অভাবী রতনের বেঁচে থাকার সংগ্রামী জীবন কথা গল্পের কাহিনি রূপে ঠাঁই পেয়েছে। গ্রাম্য জীবনের আটপৌরে ভাষার সাথে নিরগ্ন অসহায় ভূমিজীবন রতন প্রতীকী চরিত্র রূপে দণ্ডায়মান। বাউন্ডুলে ছন্নছাড়া জীবনযাপনে অভ্যস্ত রতনের পত্নী পরী ছাড়া দুই ছেলে বনা, মনা এবং দুগ্‌গি'র অবস্থান দারিদ্র্যের ছবিকে ভাবিয়ে তুলেছে। অন্ত্যজ (দুলে) পরিবারে জন্মেছে বলে রতনকে কেউ কাজে নেয় না। দিন রাত কর্মহীন জীবনে ঘুরে বেড়ানো সংসার ও দায়িত্ববোধ তার মধ্যে নেই। না খেতে পেয়ে পিত্তি বমি হয় তার। বউ পরী মাছ ধরার কাজে, না হয় শাক তোলার কাজে সকাল থেকে ব্যস্ত থাকে। সন্তানদের প্রতি মায়া মমতা থাকলেও ক্ষুধার কাছে রতন অসহায়। কলাই করা ডিশে দলাখানেক পান্তা কিছুটা নুন ছিটিয়ে একরকম আড়ালেই সাবাড় করেছে রতন। ছোটছেলে মনার কথার উত্তরে সে জানায় পান্ত ছিল সামান্যই 'এই মুঠাটাক'। একটা চাপা ক্ষোভ ও অসহায়তা তাকে ক্রমশ গ্রাস করেছে। হতাশার চরম সীমানায় রতন দুলেকে দাঁড় করিয়েছে সমাজ। কৃষকসভার মিটিং-এ সে জেনেছে স্বাধিকারের কথা, নিজের অক্ষমতার কথা— বাস্তুর খাজনা বাকি, শীতকালে ছেলেমেয়েকে শীতের পোষাক দিতে না পারা, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, খাদ্য, মানুষ করতে না পারার কথা। তবু তার ভালো লাগে এই প্রকৃতি রূপ চেনা মানুষ, অভাবী জীবন। আকাশ, পাখি, সারি সারি গাছ; এমনকি চেনা কাকটা রোজ তেঁতুল গাছ থেকে আমগাছ থেকে সজনে গাছের মগ ডালে বসতে দেখার আনন্দেই তার বেঁচে থাকা। পরীর মাছ ধরা, আর রতনের হন্নে হয়ে কাজের সন্ধান করা— এইভাবেই দিন পেরিয়ে রাত, মাঝরাত্রি আর শেষরাত্রি। সোহাগ আর আদরে অভাবী সংসারে রতন-পরীর নবজাতকের আগমনী বার্তা শোনা যায়। বোধবুদ্ধিহীন রতন দুলেরা অগোছালো সংসার জীবনে অভ্যস্ত। বরং সংসারের দায়িত্ব পালনে পরীর ভূমিকা যথেষ্ট ফুটে উঠেছে। সে স্বামীকে (রতনকে) বলে— 'কাল তমার কাজ হবে ত কোথাও ?' কাজ না জুটলেও কাজের আশায় এদের দিন ফুরোয়; বয়স পেরিয়ে যায় অনাহারে অভাবী মানুষগুলির।

'সার' গল্পের বিষয়বস্তু গ্রাম্য জীবনকেন্দ্রিক হলেও এখানে জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার কথা রয়েছে। গল্পের পটভূমিতে ক্ষীরপাই গ্রামের কথা এসেছে। কাহিনি মধ্যে অধর দোলুই জাতে বাগদি। খালবিলে মাছটাছ যেমন ধরে তেমনি চাষ আবাদই তার প্রধান জীবিকা। চার বিঘে থেকে এখন (৬০ বছর বয়সে) চৌদ্দ বিঘে জমিতে চাষ হয়। গামছা আর খাটো ধুতি পরতে সে অভ্যস্ত, তবে শীতকালে চাদর বা ফতুয়া ব্যবহার করে। মোটের ওপর স্বচ্ছল সুখী চাষী সে। তার বড় ছেলে রতন জমি বাঁধা রেখে ব্যাঙ্ক-লোন নিয়ে রাসায়নিক সারের সাহায্যে বেশি ধান-চালের কথা ভাবে। কিন্তু অধর কিছুতেই রাজি হয়নি। আসলে প্রাচীন বা প্রবীণের সঙ্গে নবীনের দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গ চলে এসেছে। পুরাতনী পন্থার সাথে চলমান যান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থার সহজ ও স্বাভাবিক রূপ যেন সংশয়ে পরিণত।

চাষের ধরন বদলে হয় আইরেট চাষ, বা গোবর সার ছাড়া রাসায়নিক সার, বিঘা পিছু তিরিশ চল্লিশ মণ ফলনের জন্য অধর দোলুই লোভনীয় নয়। পুরাতনী ব্যবস্থায় তার জীবন জীবিকা। সার প্রয়োগে বছর দু'পরে মাটির যেমন দফারফা, তেমনি আইরেট চালের ভাতের স্বাদহীনতা চাষের ক্ষেত্রে অনিচ্ছা দেখা দেয়। একসময় প্রবল ইচ্ছাশক্তির জোরে দু'বাহুর ক্ষমতায় সারাবছরের জমানো গোবর সার জমিতে দিতে যাওয়ার উদ্যোগে ও কায়িক পরিশ্রমে সে সারের ঢিপিতেই শেষ হাসি ফোটায়। গল্পকারের বয়ানে এক

ব্যঞ্জনা গভীরতায় 'সার' প্রসঙ্গ আসলে ভিন্ন মাত্রা পেয়ে গেছে। চিরন্তর সত্যের স্বার্থে ও সামর্থে চলমান বিশ্বজগতের বিপরীতে এক সনাতনী জীবনযাত্রায় অধর দোলুই জীবনকে বেঁধে রেখেছে। অথচ সরকারি ব্যবস্থায় ও সাহায্যে চাল-ডাল লোনের মাধ্যমে মানুষের জীবনযাত্রার সুরাহার পথ সহজ করার চেষ্টা রয়েছে। অবশ্য ভাত কাপড়ের অভাব তার কোনদিন হয়নি। ঢেঁকিছাঁটা চালের ভাত, বিরির ডাল, বড়ি পোস্ত, আর কুঁচো চিংড়ির ঝাল-চচ্চড়ি-তেই চাষী জীবন অতিবাহিত হয়।

'ব্লাডপ্রেসার' গুণময় মান্নার অন্যতম একটি গল্প। মাটির মমতা রসে পূর্ণ ফসল ও ফসলের মালিকানা সম্পর্কিত বিবাদ জমি-চাষি-মালিকের অধিকার প্রসঙ্গে গল্পকথা জমিয়েছেন গল্পকার। কৃষকসভার নানা বিভাগ ও কৃষিব্যবস্থার আমূল সংস্কারে মালিক ও ক্ষেতমজুরদের মধ্যে অধিকার বোধে দোটানায় পড়তে হয়। মূলত সরকার পক্ষ 'ভাগ-রেকর্ড' ব্যবস্থা চালু করার ফলে মতিলাল খাঁর মত সৎচাষি বেইমানির ভয়ে সংকোচ বোধ করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি ঘোষণা করছে 'তোমরা যারা ভাগ চাষ কর, তারা আমাদের অফিসে এস, তোমাদের ভাগ রেকর্ড করিয়ে দেব।' কিন্তু এই সুযোগ অভাবী চাষী মতিলাল নেয়নি। তার ছেলে শ্রীপতি পার্টির লোকের প্রলোভনে ও প্ররোচনায় মালিকের জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ ভাগরেকর্ড করতে চায়। কারণ সে জানতে পেরেছে জমির মালিক হলে চাষীর তিন ভাগ, মালিকের একভাগ। আর ভাগচাষীর কাছ থেকে মালিক কোনোদিন জমি ছাড়াতে পারবে না, পুরুষানুক্রমে চাষীই জমি দখল করে চাষ আবাদ করবে।

মতিলাল জমির মালিককে দেবতার মতো মনে করে। জমি চাষ করতে গিয়ে তার সাথে কোনো দিন ঝগড়া না হওয়ায় সে ভাগচাষী হলেও সরকারের খাতায় নাম লেখাবে না। জমির অধিকার বুঝে নেবে না। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে সে চিন্তামগ্ন হয়ে পড়েছে। মতির কোন লোভ নেই, স্বার্থ নেই। সে সরকারি অফিসার কানুনগো সাহেবের সামনে বলতে পেরেছে— 'যারা সব নাম লিখাতে এসেছে, সব বেইমান চোর, মালিকের হাতে পায়ে ধরে তখন জমি চেয়ে লিছে, আর এখন বেইমানি করছে, ছ্যা-ছ্যা..." সুবিধাবাদী ভাগচাষীদের প্রতি তার ঘৃণা ও মানবিকবোধ জাগ্রত হয়েছে, হয়েছে ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত। নাতি লয়ান এর সাথে মাঠের মাপ দেখতে এসে স্পষ্টবাদীতার পরিচয় দিয়ে রক্ত গরম করেছে। তার কাছে একটি জমির মালিক দুজন হওয়া মানে ঘরের বউকে রাঁড় করে দেওয়া।

আদর্শ সৎ চাষী হিসেবে মতিলাল চরিত্রটি যথেষ্ট উজ্জ্বল রূপে নির্মিত হয়েছে। অথচ তার ছেলে শ্রীপতি লোভাতুর, মিথ্যেবাদী ও বেইমান চরিত্র রূপে অঙ্কিত। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মুখে জমি ও মালিকের অধিকার সম্পর্কিত ব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের নির্ভেজাল অধিকার ও হৃদ্যতার পরিচয় রূপে মতিলাল চাষী যথেষ্ট প্রতীকী হয়েছে। গল্পের নামকরণ 'ব্লাডপ্রেসার' মতি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই।

এমন ভাগচাষী প্রথা নিয়ে বিতর্কের বাতাবরণ 'সহাবস্থান' গল্পের মধ্যেও দেখা যায়। পার্টির লোকেরা লাল পতাকা উড়িয়ে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ, সর্বহারা এক হও ইত্যাদি আওয়াজ' দিয়ে রক্তঝরা বক্তব্যে জমি দখলের বন্দোবস্ত করে। রাধাপুর গ্রামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে ও ধনী গরীব সম্পর্কে গল্পকার

বলেছেন— এখানে 'সাঁওতাল বাগ্‌দী-দুলে-মাহাতো গরীবেরা আগেকার গরীবদের মতোই আছে। আর দত্তদের মতো গ্রামীণ বড়লোকেরা আগেকার চালেই চলেছে।' এই গ্রামে দত্তদের বাড়িতেই কেবল টিউবওয়েল আর একটা রেডিও আছে। আর অজিত বাবু প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করলেও অবস্থা তেমন স্বচ্ছল নয়, তার বাড়িতে হারমোনিয়াম আছে। যা গ্রামের দৃষ্টান্তস্বরূপ। তবে অভাবী গ্রামের মানুষদের মধ্যে ভালোবাসার অভাব ছিল না কোনদিন। সবে জমি দখলের পালা শুরু হতে কেউ কারুর সাথে মন খুলে কথা বলে না, সন্ধ্যার পর রাস্তায় লোকজন বের হয় না কেবল কুকুর শেয়ালের ডাক শোনা যায়।

সুধীর দাসের জমিতে লাল পতাকা লাগিয়ে জবরদখল করে নেয় নেতা অজিত সরকার। অজিত সরকারের মেয়ে অন্নপূর্ণার খোঁপাতে সুধীর দাস লাল পতাকা গুঁজে জবরদখল করে নেয় অর্থাৎ কিডন্যাপ করে। জবরদখলে যদি জমি অধিকার করা যায় এই যুক্তি অনুসারে সুধীর দাস বলেছে— 'তোমার বাপ (অজিত সরকার) আমার জমিতে লাল পতাকা পুঁতে দিয়ে চাষ দিয়ে দিল, তাতেই জমি তার হয়ে গেল...তেমনি আমিও তোমার মাথায় লাল পতাকা গুঁজে দিলাম, তুমি আমার হয়ে গেলে, ব্যাস্।'—এরূপ তাৎপর্যময় যুক্তি নীতির ঊর্ধ্বে, তর্কের সামনে চলে এসেছে। তবে জমির জবরদখল লড়াই-এ দুই পক্ষই থানার পুলিশদের হাতে গ্রেপ্তার হয়, এমনকি দলবলসহ। আর সমস্ত লাল পতাকা থানার কোণে জড়ো করে রাখে। বন্দী অন্নপূর্ণাও বাড়িতে পৌঁছায়।

জমির জবরদখল মিটে গেলেও অন্নপূর্ণার মনের অচলাবস্থা থিতু হয়নি। সে অন্ন মুখে তুলেনি, মনমরা কথা বন্ধ করে বিশেষ কারণে বসে থাকে। বাবা অজিত সরকার বলে তুই আমার মতো মাথা উঁচু করে রাস্তায় হাঁটবি আবার স্কুলে যাবি। কিন্তু তার কাছে লজ্জা হল ভূষণ। সমাজের কাছে সে মুখ তুলে চলতে পারবে না। কারণ, সুধীর দাসের ঘরে বন্দী থাকার কারণে তাকে কলঙ্কের বোঝা বইতে হবে। বাবার অমতে সে মনের কথা সাহসের সঙ্গে বলেছে— 'তুমি আমায় সুধীর দাসের সঙ্গেই বিয়া দিয়ে দাও...'। তাতে পরিবার ও সমাজের সাথে জমির দখল ও লড়াই বন্ধ হবে বলে এই ছোট্ট মেয়েটির বিশ্বাস। এক পরিহাস প্রিয়তার মধ্য দিয়ে গল্পের যবনিকা ঘটলেও জটিল আবর্ত থেকে মানসিক সুস্থতার পরিবেশ রচিত হয়েছে গল্পে। এখানেই গল্পকারের সমাজ সম্পর্কিত সূক্ষ্ম জীবনদর্শনের চিত্র ধরা পড়ে।

চারটি পরিচ্ছেদে সমৃদ্ধ দীর্ঘ গল্প 'পরিণীতা'। অভাবী সংসারে দুই বন্ধু অরুণ ও জগদীশের অভিন্ন হৃদয় কথা এখানে ব্যক্ত হয়েছে। গল্পের শুরুতে গল্পকারের নির্মাণ কৌশলের রীতি অনুসারে স্থান হিসেবে ক্ষীরপাই-কালকাপুর, হালদার দীঘির পরিচয় উঠে এসেছে। আর যোগাযোগ সূত্রে রাস্তাঘাট বা আত্মীয়তার পরিচয় উঠে এসেছে। ভালোবাসা যে কোনো জাত মানে না তা জগদীশ মুখুজ্যে ও বন্ধু অরুণ দলবেরার মধ্যে প্রমাণ পাওয়া যায়। সাতের দশকে মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থার সামান্য উন্নতি হলে পার্টির লোকেরা মিছিল মিটিং-এর জন্য গাঁয়ের লোকজনকে বাসে করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেত। এমনকি লাল, নীল পার্টি মিটিং-এ সাধারণ মানুষই নাজেহাল হয়েছে বেশি। কাঞ্চনের মতো নাইন পাশ মেয়ের সাথে বিবাহের কথা ছিল অরুণ দলবেরার। যে কিনা মুম্বাই গিয়ে সোনার কারিগর হয়েছে। ভালোবাসার মর্যাদা দিতে কাঞ্চনের জন্য গয়না গড়িয়ে এনেছে। অথচ অরুণ দেখল কাঞ্চনের বাবা ও জ্যেঠার মধ্যে দলবাজিতে কাঞ্চনসহ সবাই ঘরছাড়া, ঘর পুড়িয়ে দিয়েছে দলের লোকেরা। এই অসহায় ও নির্মম পরিণতিতে

কাঞ্চনের সাক্ষাৎ পেয়ে ভালোবাসাকে শ্রদ্ধা জানাতে কাঞ্চনকে বিবাহ করে অরুণ। সামান্য আয়োজনে চিরন্তন সম্পর্কের বন্ধনে রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণেও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি অরুণের মতো মানুষের বাক্‌দান। কাঞ্চনের সাথে বিবাহের ফলে যুদ্ধের পরে যেন মিলনের বার্তা তথা শান্তি ঘোষিত হয়েছে। গল্পকারের নিহিত বার্তায়-সমাজ ভাবনার কথায় বাঁচার ও বাঁচিয়ে রাখার শপথ পালিত হয়েছে।

মহাশ্বেতা দেবী

একটি জাতিকে অবক্ষয় ও অবনমন থেকে বাঁচিয়ে সঠিক পথ দেখাতে পারে একটি সুস্থ ও সংস্কৃতি আন্দোলন। আর্থিক ও সামাজিক বিন্যাসে যে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মানুষ দীর্ঘকাল সমাজের মধ্যে বাস করেও বঞ্চিত থেকেছে কিংবা প্রতিবাদ না করে জন্মটাই বৃথা এরূপ ভেবে মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে সেই সমস্ত মানুষের জীবনেতিহাসকে সাহিত্যের পাতায় ঠাঁই দিয়েছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর রচনায় নিরক্ষর মানুষগুলোর আর্থিক সমস্যা, জীবিকার সমস্যার কথা যেমন রয়েছে তেমনি উচ্চবিত্ত তথা নাগরিক সমাজের মানুষদের ঘৃণা, শোষণ, অত্যাচার, বঞ্চনার বাস্তব ছবি সুস্পষ্ট রূপে ধরা রয়েছে। তাঁর সৃষ্টির পূর্বে বাংলা তথা সাহিত্যের পাতায় সাধারণ নিরীহ মানুষের প্রতি নির্মম অত্যাচার নিপীড়ন ও বঞ্চনার জীবন কথা প্রায় অনেকটাই অনালোচিত ছিল বলা চলে। এক গভীর মানবায়িত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ শতকের পঞ্চাশের দশক থেকে ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে বঞ্চিত অসহায় মানুষদের বিভিন্ন সমস্যা তার রচনায় উঠে এসেছে। তাঁর রচনার বিষয়— পরিধি সম্পর্কে সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেছেন— 'প্রান্তিক মানুষদের নিয়ে অনেকেই তো লিখেছেন, কিন্তু ওর মতো প্রান্তিকদের সঙ্গে মিশে আর কেউ কাজ করেননি'। [৬৭]

তাঁর রচিত প্রতিটি গল্পই যেন বাস্তব জীবনাশ্রিত। গল্পের বয়ানে, কখন ভঙ্গিতে, ভাষার যথাযথ ব্যবহারে, চরিত্রের উন্মোচনে, গল্পের নির্মাণ কৌশলে গল্পের চরিত্রগুলি প্রতিবাদী ও জীবন্ত হয়ে গেছে। 'অগ্নিগর্ভ' রচনার ভূমিকাংশে লেখিকা বলেছেন— "শোষিত ও নির্যাতিত মানুষ, তাদের প্রতি সংবেদী মানুষই আমার লেখায় প্রধান ভূমিকায়।" [৬৮]

লেখিকার বেশ কয়েকটি গল্পের বিশ্লেষণে পাওয়া যাবে এই সব মানুষ আসলে কত বিচিত্র শ্রেণির। বিচিত্র তাদের সমস্যা ও জীবন সংগ্রাম। যাদের অন্ন জল বাসস্থান ভূমি শিক্ষা চিকিৎসা ও জীবিকার নিত্য ও চিরন্তন সমস্যা। সেইসব লোধা, মুন্ডা, আদিবাসীদের দুঃখের শরিক হয়ে স্বেচ্ছায় ও সানন্দে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন লেখিকা। সাহিত্য রচনার বাইরে পরম মমতায় অসীম সাহসে নিবিড় ভাবে এইসব মানুষদের জড়িয়ে রাখতে পেরেছেন, যার জন্য তিনি সাহিত্যিকদের মধ্যে অনন্যা।

মহাশ্বেতা দেবীর গল্পের কুশিলব— অসহায়, দুঃস্থ, অবলা, বোকা মানুষ। জীবনকে ভালোবেসে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালোবেসে প্রকৃত দেশ সেবা তথা সাহিত্য সেবিকার দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বহন করেছেন। তাঁর গল্পের সীমানা কেবল বাংলায় সীমাবদ্ধ নয়, বাংলা ছাড়িয়ে বহুজনজাতির জটিল জীবন সমস্যা তাঁর গল্পে উঠে এসেছে। যে সমাজে শিক্ষিত মানুষের যাতায়াত কেবল সুবিধাবাদীর জন্য, সহমর্মিতা ও

সহযোগিতার জন্য নয়; যেখানে বৈদ্যুতিক আলো নেই, যাতায়াতের ভালো রাস্তা নেই, শিক্ষা নেই, আছে কেবল দারিদ্র্য অপমান আর অবহেলা। গ্রামের সরল মানুষ, হরিজন, ভূমিদাস, আদিবাসীরা পুরুষানুক্রমে অবহেলিত ও নির্যাতিত। সারা জীবন রক্তে ঘামে মহাজনের ঋণশোধ করে যারা নিঃস্ব তারা জানে না খাদ্য বস্ত্র বাসস্থানে তাদের অধিকার কতটা। দরিদ্রতম গ্রাম্যজীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মহাশ্বেতা দেবী উপলব্ধি করেছেন জীবন বড় কঠিন, বড়ো ক্ষমাহীন। উচ্চবিত্ত সমাজের চাপের ফলেই যে গ্রামের সরল সাধারণ মানুষেরা তাদের প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে— একথা তিনি বহুবার বলেছেন। যে সমাজ ব্যবস্থার ফলে এই বৈষম্য ও অপমান চলেছে তার সঠিক রহস্য উন্মোচন তথা স্বরূপ সন্ধানের জন্যই লেখিকার কলম ধরা— "স্বাধীনতার একত্রিশ বছরে আমি অন্ন, জল, ঋণ, বেঠ-বেগারী কোনটি থেকে দেশের মানুষকে মুক্তি পেতে দেখলাম না। যে ব্যবস্থা এই মুক্তি দিল না, তার বিরুদ্ধে নিরঞ্জন, শুভ্র ও সূর্যসমান ক্রোধই আমার সকল লেখার প্রেরণা।"[৬৯]

নগর সভ্যতা থেকে বহুদূরে মাটির স্পর্শে ও জলের সঙ্গে জীবন মিলিয়ে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখা অতি সাধারণ মানুষগুলির আপনজন বলতে প্রকৃতি ছাড়া কেউ নেই। সন্তান হয়ে অন্ধবিশ্বাস আঁকড়ে, রাজনৈতিক শিকার হয়ে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, নিজের অধিকার সম্পর্কে না বুঝে অন্যকে বড়লোক করে; অন্যের জন্য গতর ও অর্থ বিলিয়ে দিয়ে, কোনোরকম প্রতিবাদ ও প্রতিকার না করে অদৃষ্টের দোহায় দিয়ে এইসব সাধারণ মানুষ কেবলমাত্র বংশলতিকাকে বাঁচিয়ে রেখে স্বল্পায়ুর জীবনেই খুশি থেকে মৃত্যুবরণ করে। এইসব মানুষগুলির অব্যক্ত জীবন কথাকে মহাশ্বেতা দেবী সাহিত্যের পাতায় রূপ দিয়েছেন বাস্তবসম্মতভাবেই। তাঁর রচিত বহু গল্প আদিবাসী জীবনাশ্রিত। যেমন— 'অপারেশন বসাই টুডু' (১৯৭৭) 'জগমোহনের মৃত্যু' (১৯৮০), 'শ্রীশ্রী গণেশ মহিমা' (১৯৮১), 'দৌলতি' (১৯৮৪), 'পালামৌ' (১৯৮৪), 'এম. ডব্লু বনাম লখিন্দ' (১৯৭৭)। এছাড়া সরকারি আইন শৃঙ্খলার বজ্র আটুনির ফাঁক-ফোকরে যে শোষণ ও বঞ্চনা চলে তারই নানা চিত্রের পরিচয় ধরা দিয়েছে— 'রোম্‌থা চম্পা', 'দ্রৌপদী', 'এজাহার', 'সুরজ', 'গাগরাই', 'বিছন', 'প্রতি ৫৪ মিনিটে' প্রভৃতি গল্পে।

স্বাধীনতাত্তোর ভারতবর্ষের শ্রেণি সংগ্রাম অর্থনৈতিক সংকট, রাজনৈতিক টানাপোড়েন, ভূমি বন্টন ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বৈষম্য ধীরে ধীরে দুটি শ্রেণিতে ভারতবর্ষের মানুষকে তফাৎ করেছিল— একটি নিম্নবিত্ত, অন্যটি উচ্চবিত্ত। আর বৃহত্তর শ্রেণির মানুষ নিজের অস্তিত্ব খুইয়ে ক্রমশঃ নিম্নবিত্তে পরিণত হয়েছে, এইসব সর্বহারা নিঃস্ব, নিরন্ন, অসহায় মানুষগুলির জীবন কথা মহাশ্বেতা দেবী কাহিনির বাস্তবতায় রূপ দিয়েছেন। তাঁর বাস্তবনির্ভর গল্পগুলির মধ্যে— আজীব, চিন্তা, স্তনদায়িনী, পলাতক, পাঁকাল, গিরিবালা, ক্ষুধা, তীর, রুদালি অন্যতম। এছাড়া তরাস, পিন্ডদান, ঊর্বশী ও জনি, বায়েন, লাইফার, ধর্মীয় সংস্কার ও বিশ্বাস নির্ভর গল্প। চড়ক, বড়া মায়ের থানে, বিছন, ভাতুয়া, দ্রৌপদী-র মতো গল্পগুলি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ও ধর্মীয় বিশ্বাসের বিচিত্র বৃত্তিতে জটিল জীবনদর্শনের পরিচয় বহন করে।

'জোছনা রাতের ছেলে' গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের রচনা। আখ্যান বর্ণনার মধ্য দিয়ে গল্পকার গল্পের মধ্যে একটা সুরের দোলায় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর সাথে মোহময়ী রূপকে দারিদ্র্যময় বাস্তব জীবনের সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন। অঘ্রাণ মাসে বাতাসে খেজুর গুড়ের গন্ধ, নতুন চালের গন্ধ, মাচা ভর্তি শিমগাছ, চালতা

গাছের কোটরে লক্ষ্মীপ্যাঁচার সংসার, চড়কের বাদ্যিবাজনা, বাঁশগাছের পাতার সরসরানি ইত্যাদির পরিমন্ডলে জোছনা রাতের ছেলে প্রাণবন্ত থাকত। যার বাবা নিরুদ্দেশ। দুঃখিনী মায়ের কোলে, মাসি মেসোর কাছে তার দিন অতিবাহিত হত— সেই ছেলে একদিন যেন হারিয়ে গেছে জোছনা রাতে, রূপকথার জগতে। কেবল স্মৃতিটুকু বেঁচে থাকে মাসি মেসোর কাছে। এ গল্পের কাহিনিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে আদরিণী মা মাসির স্নেহ স্মৃতি জাগ্রত হয়েছে পরম মমতায় ও অলৌকিক নিবিড় দুর্বিপাকে। যে জোছনার আলোয় একদিন ছেলেকে পেয়েছিল সেই জোছনা যেন অন্ধকার ঘনিয়ে দিয়েছে দরিদ্র মা-এর জীবনে। এক চিরন্তন সত্যের গন্ডিতে গল্পের যবনিকা এসেছে। এ গল্পের প্রধান চরিত্রের পলায়ন প্রবৃত্তি যেন চিরন্তন দূরে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া 'কখন মরণ আসে কে বা জানে' (জীবনানন্দ দাশ)। 'জোছনার কোনো শব্দ থাকে না'—এক নিস্তব্ধতার আবহে পাঠকের অনুভবকে সুদূর প্রসারিত করে দিয়েছেন গল্পকার।

'কারণ ছিল' গল্পে ভরতবাবু ব্যক্তিত্বহীন অকৃতদার মানুষ। জীবনে ভুল পথে হাঁটেননি, ভুল পরামর্শ দেয়নি কোনো দিন। প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চাকর নলিনীর হাতে জীবন সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকেছেন। সেই নলিনী একদিন বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। আত্মধিক্কারে। কেননা তাকে ঝি গোলাপের সাথে রেডিও শ্রবণে মগ্ন অবস্থায় দেখে ভরতবাবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়। ভরতবাবুর জীবনে দ্বিতীয় চাকর হিসেবে আগমন ঘটে সংগীত পিপাসু ভোলানাথের। তার শিল্পীসুলভ মানসিকতাকে সম্মান জানিয়ে ছিল। তা সত্ত্বেও ভোলানাথ তাঁকে ছেড়ে চলে যায়। তৃতীয় চাকর হিসেবে কাজে যোগ দেয় পানু। সে অধ্যাপক ভরতবাবুকে দাদা বলেছে এবং কিছুটা প্রসার জমিয়ে বাজার টাজার করার জন্য একটা চাকর রাখতে চেয়েছে— ''দাদা আমাদের একটা চাকর রাখলে হয় না ?'' এরপর ভরতবাবু রাশভারী হবার চেষ্টা করেছে প্রতিবেশী অকৃতদার শেফালি বসুর মতো নারীর ব্যক্তিত্বে। ঠক্ প্রতারক পানুর আসল পরিচয় মহেন্দ্রবাবুর কাছে চোর হিসেবে জানা যায়। ক্রোধে, উত্তেজনায় ভরতবাবু অস্থির হয়েও মহিলাদের দ্বারা অনুকম্পায় ক্রোধ সংবরণের চেষ্টা করে অজ্ঞান হয় শেফালী বসুর পায়ের কাছে। তারপর অপরিচয়ের দূরত্ব ঘুচিয়ে সাহসী ও ব্যক্তিত্ববান হয় ভরতবাবু আর তার সাথে শেফালী বসুর সাহচর্য ও বিবাহ করার দৃঢ় সংকল্প পূর্বাপর সমস্ত ঘটনাকে চমকিত করেছে। গল্পের মধ্যে স্বচ্ছলতা ও সম্মানজনক পরিস্থিতি দেখানোর পাশাপাশি স্নেহ, প্রেমের অনুতাপহীনতার পরিচয়টিও প্রতিবেশিদের তথা সমাজ জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষিত হিসেবে গল্পকার তুলে ধরেছেন। জীবনের ব্যক্তিত্বহীন কারণ অনুসন্ধানের জন্য গল্পকারের সৃষ্টিশীল ভাবনাকে স্বীকার করতে হয়। এ গল্পের পরিণতি মনে করায় রাজশেখর বসুর 'চিকিৎসা সংকট' গল্পের পরিণতিকে। যেখানে অনাবিল হাস্যরস রয়েছে।

'সাঁঝ সকালের মা' গল্পে অকৃত্রিম মাতৃস্নেহ, অলৌকিক, আধিভৌতিক জগৎ, অভাবী সংসারের দুঃখময় জীবন কথা, পাখিমারা যাযাবর সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি মা ও ছেলে জটেশ্বরী ও সাধনের কুসংস্কার ও বিশ্বাস, বাণমারা প্রসঙ্গ উঠে এসেছে। রাঢ়বঙ্গের মানুষের জাতিভেদ প্রথায় বিভেদ নীতি ও নিম্নবৃত্ত মানুষের জীবিকার পরিচয় এখানে ব্যক্ত হয়েছে। জটেশ্বরী সাধনের মা, সে দৈবরাণী তথা ঠাকুরাণী হয়ে যায় সারাদিন। কেবল সকালে ও সন্ধ্যেয় দেবতার ভর মুক্ত থাকে। তখন সে সাধনের মা; সন্ধ্যেয় সাধনকে

রান্না করে ভাত খাওয়ায়। শৈশবে পিতৃহারা সাধনের মা ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। তিরিশ বছরের সাধনের পৃথিবী মায়ের কাছে বন্ধক রয়েছে বলেই সাধন অসহায় বোকা। মা গুণিন বলে পরোপকার করে চাল পায় সাধনকে খাওয়ায়। সেই মায়ের মৃত্যুতে ছেলে কালীঘাটে গিয়ে আঠারো টাকায় মাকে দান করে হাতি, ঘোড়া তথা সসাগরা ধরিত্রী। কিন্তু দান সামগ্রির চাল শ্রাদ্ধের সময় সে কেড়ে নেয়, ভাত রেঁধে খাবে বলে। অভাবী মানুষের ক্ষুধা তার কাছে একমাত্র শত্রু। আর ভাতের গন্ধে সে মা কে খুঁজে পায়। ঐ গল্পের পরিণতির সাথে শরৎ চন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' কিংবা তারাশংকরের 'অগ্রদানী' গল্পের মিল রয়েছে— অভাবী মানুষের স্বভাবগত সাদৃশ্যে ও সংযত মানসিকতায় স্নেহ ও প্রেমের নির্ভেজাল সংযোগে। তবে এই গল্পের নির্মাণ প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন—

> "এই গল্পের সুতো পেয়েছিলাম এক অগ্রদানী পুরুতের কাছে। তিনি এক গরিব পরিবারকে বোঝাচ্ছিলেন, যে শ্রাদ্ধ করছ, অনেক খরচ না করলেও চলে। সামান্য খরচেও স্বর্ণ-গাভী-রজত ও ভূমি দান করা চলে। তাঁর কথাটি আমাকে গল্পটি লিখতে সূত্র দেয়।" [৭০]

'নকল' গল্পটি বাস্তব ও অবাস্তবের নির্ভরে সাহিত্য সৃষ্টির পরিচয়ে গড়া। গল্পকারের শিল্পীসত্তার পরিচয়, পাণ্ডিত্য তথা সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচয় এখানে ধরা রয়েছে। একজন সাহিত্য স্রষ্টার নির্মাণ কৌশলের নানান সমস্যা ও সৃষ্টির আনন্দে বেঁচে থাকার কথা এখানে ব্যক্ত। সাহিত্য হ'ল সমাজ ও মানব জীবনের পরিচয়ের দর্পণ। সেই নিরিখে সাহিত্য পাঠে পাঠকও সমৃদ্ধ হয়— সমাজ অভিজ্ঞতায়, বাঁচার সঠিক পথ খুঁজে পায়। 'ঘোঁতন' লেখকের সাহিত্যকর্ম সাদামাটা চরিত্রের বিন্যাসে গড়া ছিল, কিছু প্রতারক ও ঠক্ মানুষের চরিত্র নির্মাণে তার সাহিত্যের প্রচার ও প্রশংসার সাথে সেও সম্মানিত হয়। তার লেখাকে নকল সাহিত্য সৃষ্টি বলে দাবি করে আপামর সমাজের মানুষ। তখন লেখকের মৃত্যু চায় তারা। এই সমাধান আসলে সাহিত্যের গৌরববৃদ্ধি, লেখককে চিরকালীন করে রাখা। নকল চরিত্রের আড়ালে সত্যিকারের আসল চরিত্র সৃষ্টি ও সমাজ জীবনকেন্দ্রিক— এই বোধে সাহিত্য উৎকর্ষতা পায়, চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়। আর অসংখ্য পাঠকের হৃদয়ে সেই সাহিত্যের লেখক আসল না নকল এই মাপকাঠিতে সাহিত্য বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে— লেখার সরসতায়, চরিত্র নির্মাণে, সৃষ্টি কৌশলে, ঘটনার ঘনঘটায়, মননশীলতায় তথা সুগভীর রসাবেদনে।

'বাঁয়েন' গল্পে কুসংস্কারের এক ভয়াবহ স্বরূপ, এক অমানবিক প্রথাসর্বস্ব জীবনচর্যা, দারিদ্র্য, অপত্যস্নেহ বিজড়িত কোমল মানবিক বৃত্তির জয় ঘোষিত হয়েছে। গল্পে চণ্ডী চরিত্র ভগীরথের মা, মলিন্দরের স্ত্রী। পেশাগত কারণে তাকে গ্রামের লোক বাঁয়েন বলে ঘোষণা করে। তাই সে সমাজচ্যুত হয়। ডোমবধূ চণ্ডীর পেশা ছিল অদ্ভুত। যে সমস্ত মৃত বাচ্চাদের পোড়ানো হত না, সেইসব বাচ্চাদের নির্দিষ্ট স্থানে পুঁতে দেওয়াই ছিল তার কাজ। এ কাজে সে যেমন নিষ্ঠুর ও নির্দয় হয়েছে তেমনি মায়ামমতায় বুক চাপা স্নেহে বিচলিত হয়েছে। সে কামনা করত—

> "গ্রামের প্রতিটি শিশু যেন অখন্ড পরমায়ু নিয়ে বেঁচে থাকে।" [৭১]

এই আবেদনের পরীক্ষা হল নিজের সন্তান ভগীরথের জন্ম দেওয়ার পর। সে এখন নারীত্বের, মাতৃত্বের অধিকারে চরম মানবিক সহানুভূতি ও পরম মমতায় মাঝে মাঝে ছুটে যেত বটতলার শ্মশান ভূমিতে। উদ্দেশ্য— সদ্যমৃত কোনো শিশুকে শেয়ালে টেনে নিয়ে না যায় তা দেখতে। গ্রামের বহু শিশুর নানান কারণে অকাল মৃত্যু হল লোকে তাকে ভুল বোঝে। বাঁয়েন বলে ঘোষণা করে। সে সমাজ ছাড়া, ঘর ছাড়া হয়।

গল্পকার গ্রাম্য পটভূমি নির্মাণ করে চণ্ডী বাঁয়েনের মধ্যে মানবিকতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন। অন্ধপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী নারী চরিত্র হিসেবে চণ্ডী'কে গড়ে তুলেছেন, প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রেল দুর্ঘটনার হাত থেকে এই নিম্নবিত্ত ও অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষটি অসংখ্য মানুষকে বাঁচিয়ে বাঁয়েন বদনাম নিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু বরণ করে। গল্পকারের সৃষ্টি কৌশলে সংগ্রামী মানবিক চরিত্র হিসেবে সার্থকতা পেয়েছে সমাজ জীবনে অত্যাচারিত চণ্ডী চরিত্র। ডোম সমাজের একটি জটিল নির্মম প্রথাকে বিশ্বাসযোগ্য করে গল্পের অবয়বে ধরে রেখেছেন গল্পকার—

> "বাঁয়েনকে মারতে নেই, বাঁয়েন মরলে গাঁয়ের ছেলে পিলে বাঁচে না। ডাইনে ধরলে পুড়িয়ে মারে। বাঁয়েনে ধরলে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়।" [৭২]

'পিণ্ডদান' গল্পে ব্রাত্যমানুষের চিরকালীন বিশ্বাস-সংস্কারের পরিচয় রয়েছে। আত্মার মুক্তির জন্য পুত্রের হাতে পিণ্ড দান পবিত্র বলে প্রান্তিক মানুষজনের প্রতিনিধি দশরথের বিশ্বাস। একসময় রাজনৈতিক চক্রান্তের শিকারে তার ছেলে রামলালের অকাল মৃত্যু ঘটে। সে নিজেই নিজের পিণ্ডলাভের ব্যবস্থা করে দশ বোতল মদ ক্রয় করে। গল্পে দশরথের জীবনদর্শন ধর্ম কেন্দ্রিক। সে পুকুর থেকে মানুষের কঙ্কাল তোলার কাজ করত। আর তার সমস্ত কঙ্কাল কিনত পালবাবু। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে ছেলে রামলাল অনেকদিন নিরুদ্দেশ ছিল। অবশেষে একটি নিখুঁত কঙ্কালের সন্ধান পায় কোম্পানির বাগানের পুকুরে। তার গলায় রূপার হার দেখে দশরথ তার ছেলে বলে চিনতে পারে। এখানেই গল্পের ট্র্যাজেডি মর্মস্পর্শী হয়। নিজের ছেলের কঙ্কাল মহাজনের কাছে বিক্রয় করতে যাওয়ার অপরাধে, সন্তান হারানোর বেদনায় হাহাকারে সে ভেঙে পড়ে—

> "কত স্নেহে ও কঙ্কালটির পাঁজরা জাপটে ধরল, জীবিত পুত্রকে দশরথ এমন করে আলিঙ্গন করেনি।" [৭৩]

গল্পকারের এ বর্ণনায় দশরথ চরিত্রটির প্রতি সহানুভূতি বর্ষিত হয়। দশরথ পিণ্ড পায়নি— এ রূপ ভাবনার মুক্তি ঘটায় সমাজের প্রতি, পালবাবুদের প্রতি পরম ধিক্কারে উত্তেজিত হয়। জীবনের পরাজয় হতাশা ও নিষ্ঠুর বিপন্নতার ছবি গল্পকার তুলে ধরেছেন। আসলে লেখকের গল্পে বঞ্চিত, শোষিত মানুষদের করুণ বীভৎস কাহিনি বারবার স্থান পেয়েছে। আর তীক্ষ্ণ শ্লেষে, কখনো বিদ্রুপে, উত্তেজনায় নিরীহ সরল মানুষের স্বাভাবিক সমস্যা ও ভিতরের যন্ত্রণার কথা ব্যক্ত করেছেন। আর তার চরিত্রগুলি প্রতীকী হয়ে প্রাণবন্ত রয়েছে। লেখকের নিজের কথায় তার প্রমাণ রয়েছে—

> "আমার লেখার মধ্যে নিশ্চয় বারবার ফিরে আসে সমাজের সেই অংশ, যাকে আমি বলি The Voiceless Section of Indian Society। এই অংশ এখনও শুধু নিরক্ষর,

স্বল্প সাক্ষর ও অনুন্নত শুধু নয়, মূল স্রোতের থেকে এরা বড়ই বিচিত্র।"[৭৪]

'উর্বশী ও জনি' গল্পটি ১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থার সময় রচিত। গল্প সম্পর্কে লেখকের মূল বক্তব্য ছিল— ''জনির গলায় ক্যানসার ও স্বর হারাবার মধ্য দিয়ে জরুরি অবস্থায় সংবাদপত্র ও সংগ্রামশীল মানুষের মুখ বন্ধ করে দেবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।"[৭৫] লেখকের এই বক্তব্যে চরিত্র দুটি প্রতীকী দ্যোতনায় সংগ্রামশীল হয়ে গেছে। ইতিহাস-সত্য ও শিল্প সত্যের উন্মোচনে লেখকের জীবনদর্শনের পরিচয়টি বিকশিত হয়। তাঁর কাছে জীবন মানে 'কাজ, Action, চলমানতা, সামনে হাঁটা।' আর এই জীবনের নানান ঘটনাবলী অনুতাপ, অভিমান, সংশয়, হর্ষ ও বিষাদ— জীবনকে টিকিয়ে রাখা, বাঁচিয়ে রাখার নিরন্তর সংগ্রাম। গল্পে জনি ও উর্বশী বাজিকর নারী পুরুষ। ভারতের নানান প্রান্তে নাচ গানের আসর জমিয়ে তারা জীবন-জীবিকা চালাত। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব ছিল না। তারা প্রেমের বন্ধনে সুখী। কিন্তু একদিন এই প্রেমে ভাটা পড়ে। জানা যায় উর্বশীর গলায় ক্যানসার। সুললিত কণ্ঠের অধিকারী যৌবন চাঞ্চল্যে পূর্ণ উর্বশীর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। ডাক্তার, কবিরাজ, ওঝা, গুণিনরা তার রোগমুক্ত করতে পারবে না বলে জনির কানের কাছে জানায়। ক্ষিপ্র হয় জনি, হয় দুঃসাহসী। সে উর্বশীর পরামর্শে সিজনের শেষ অনুষ্ঠানের আসর বসায়। কিন্তু না, উর্বশীর ব্যর্থতা তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এক নিঃসীম অন্ধকারে জনি হারিয়ে যায়। এভাবেই ট্র্যাজেডির আবরণে গল্পের সমাপ্তি এনেছেন গল্পকার।

গল্পে জনির প্রকৃত অবস্থান যেন প্রেমিকের জীবনদর্শন। গল্পকার মানবিক সহানুভূতি, কৃতজ্ঞতা ও প্রেমোন্মত্ততার সাথে একটি পেশাগত জীবনচর্যার পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিছক খেলা দেখানোর উদ্দেশ্যে দুটি চরিত্র মানবিক আবেদনে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করেছে। ভালোবাসার বিপরীতে অনুতাপের জ্বালায় নিঃশেষ হয়েছে জনি চরিত্র। গল্পকার দার্শনিকতায় বক্তব্যকে পৌঁছে দিয়েছেন— 'পয়সা কারোর নয় যার কাছে থাকে তার', কিংবা 'চিতার আগুনের চেয়ে চিন্তার আগুনের জ্বালা বেশি।' এমন প্রবাদসুলভ বাক্যে সৃষ্ট চরিত্রের ব্যক্তিত্ব গঠনের সহায়ক হয়েছে— সময় ও কালচেতনা।

একজন সৃজনশীল লেখকের মধ্যে চলমান সমাজের জ্ঞান থাকাটাই স্বাভাবিক। লেখক সত্যদ্রষ্টা। সাহিত্য সৃজনে উঠে আসে ক্ষয়িত জটিল সমাজ ব্যবস্থা, অন্ধ প্রথা, অমানবিকতা, বঞ্চনা, জাতপাতের ভেদাভেদ, প্রান্তিক মানুষের পেশা বাঁচানোর সংগ্রাম, চোরাপথে জীবনে সুখের অনুসন্ধান, প্রতিকারহীন শাসন ব্যবস্থা, প্রতিবাদহীন নিজের ভাগ্যকে সঁপে দেওয়ার সরল মানসিকতা— ইত্যাদি ভাবনার পরিণত রূপ সত্তরের দশকের লেখাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 'ধীবর' গল্পের এক অসহায় অথচ দায়িত্বসচেতন হতভাগ্য পিতা 'জগৎ'। সে ছেলে অভয়ের ভাগ্য গড়ে দিতে পারেনি, পারেনি সঠিকপথে উপার্জনের রাস্তা বলে দিতে। সমাজের চোরা পথে অর্থ উপার্জনের উপায় জেনেছিল দারোগাবাবুর কাছ থেকে। একদিন সেই দারোগাবাবুও সমাজের চোরাপথে দুষ্কৃতিদের চক্রে পড়ে লাশ হয়ে যায়। গল্পকার সমাজ জীবনের উপর গভীর পর্যবেক্ষণে 'ধীবর' সমাজের বাস্তব ছবি তুলে ধরেছেন। এই 'জগৎ' চরিত্র এক প্রতীকী চরিত্রে উন্নীত হয়ে বিরাজমান। জগৎ ব্যক্তিজীবনে পুকুর থেকে লাশ তুলে দারোগাবাবুকে দেয়, বিনিময়ে লাশ পিছু সাত টাকা পায়। সেই টাকায় মদ খায় ও স্ত্রী ভামিনীকে দেয়। এখানে চরিত্রের মানবিক উন্মোচন ঘটিয়েছেন গল্পকার— ''জগতের ধারণা যারা মারে তারাও টাকা পায়। টাকা ছাড়া কিছু হয় বলে জগৎ বিশ্বাস

করে না।" সে মনে করে ডোম, দারোগা, কনস্টেবল প্রত্যেকেই কোনো না কোনো ভাবে টাকার লেনদেন করে। আর এই লাশগুলোর খোঁজ নিতে কেউ আসে না থানায় বা পুকুরে। যারা লাশ হয় সেই ছেলেরা ভয়ঙ্কর। নিজের ছেলে অভয় কার মতো— এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পায় না তারা। জগৎ মানুষকে ও পাপকে ভয় পায় সে কথা দারোগাবাবু পর্যন্ত জানে। আসলে এই ভীরুতা তার ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। একটি স্বচ্ছ মানসিকতার পরিমন্ডল। কিন্তু ছেলে অভয়ের কাজের ব্যাপারে দারোগাবাবু বলেছিল মাঝে মাঝে খোঁজখবর দিলেই রোজগার হবে। কিসের খোঁজ খবর তা জানা ছিল না জগতের। একদিন সেই ছেলে দারোগার হাতে খুন হয়ে লাশ হতেই জগৎ নির্বংশ হয়। তার প্রতিবাদের বারুদ জ্বলে ওঠে। সে ঠান্ডা মাথায় থানার বড়বাবুকে খুন করে রায় পুকুরে ফেলে দেয়। ইট পাথর চাপিয়ে দেয় পেটের ওপরে। গল্পকার ভীরুতার আড়ালে প্রতিবাদ জাগিয়ে তুলেছেন জগৎ চরিত্রের মধ্যে। যে জগৎ একদিন হাঁস-মুরগীর ডিম বাজারে বিক্রি করত। নিজের জাল ভাড়া খাটিয়ে পয়সা পেত, সেই জগৎ এখন ডুবুরির পেশায় দিন কাটায়, সামান্য আয়ে। অবশেষে সমাজের প্রতি, আইনের প্রতি, অভাবের তীব্র জ্বালায় সন্তানহারা পিতৃহৃদয়ে 'জগৎ' আসলে চিরন্তন জগতের মুখে প্রতীকী হয়ে যায়। গল্পকারের সাহিত্য সৃজন শিল্পের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে— এরূপ সমাজ জীবনের পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে।

মহাশ্বেতা-র গল্পে নিম্নবিত্ত, সর্বহারা, শ্রমজীবী ও আদিবাসী মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গ, পুনরায় স্বপ্ন দেখার বাসনা সজাগ থাকে আলতো প্রেমের ছোঁয়ায়। সব হারিয়ে গেলেও জমাট অন্ধকারের মাঝে উষ্ণতার আবেদনে প্রেমানুভূতি জেগে থাকে। নিষ্পাপ, নিঃস্বার্থ সুগভীর প্রেমে যেমন প্রশান্তি থাকে, তেমনি বিকৃত রুচির চোরা বাঁকে শুদ্ধ প্রেম অপবিত্র হয়, হৃদয় দুমড়ে মুচড়ে যায়, সংসার সমাজ তুচ্ছ হয়। সংসারের বেষ্টনীতে প্রেম যেমন পূজার বিষয়, আবার বিকৃত রুচির তাগিদে, প্রবৃত্তি উন্মাদনায় অসংযত প্রেম হিংসা, বিচ্ছেদ হানাহানিতে পরিণতি পায়। সমাজের গোপন সত্য প্রকাশ পায়। অমানবিকতার স্পষ্ট রূপ উন্মোচিত হয়। প্রচলিত নিয়মনীতির বিপরীতে নানান সমস্যায় জেরবার হয় শাসন ব্যবস্থা তথা দেশাচার। লজ্জা, সংকোচ, ঘৃণা, আক্রোশ, হত্যা, ইত্যাদি শব্দগুলো বোধবুদ্ধির সামনে চলে আসে। আমাদের সুস্থ সমাজ সচল সমাজকে বিড়ম্বনায় ফেলায়। অনন্ত প্রেমপ্রবাহের স্রোতে ক্রমাগত ডুবে চলেছে মানবকুল। সময়, সমাজ-কালের ব্যবধানে সাহিত্যের পাতায় তা ধরা রয়েছে। মহাশ্বেতা দেবীর কথায়— 'প্রেম এক বিরাট অনুভূতি, সত্যিকারের প্রেম যে প্রজ্ঞা' (জলে ঢেউ দিও না)। তবে অন্যত্র তিনি প্রেমের উপলব্ধি প্রসঙ্গে বলেন—

> "যতই জীবনের শেষদিকে যাচ্ছি এই উপলব্ধি গাঢ়তর হচ্ছে যে প্রেম ছাড়া কিছুই হয় না। সবই বৃহত্তর অর্থে, ব্যাপকতর অর্থে, হয়তো নতুনতর অর্থেও, প্রেম। সবই ভালবাসা।" [৭৬]

অর্থাৎ মানবপ্রেম, বিশ্বপ্রেম, নরনারীর হৃদয়গত প্রেম, দেশপ্রেম, ভগবৎপ্রেমের অনুসন্ধান, পরিকল্পনা ও রূপায়ণ তার গল্পে পাওয়া যায়।

তাঁর 'দ্রৌপদী' গল্পের 'দ্রৌপদী' আসলে মহাকাব্যের স্বামী সোহাগিনী বধু নয়; বাস্তব সমাজে খেটে

খাওয়া নারী। যার পবিত্র মানসিকতায় দেহের রক্তে ধৌত হয়েছে বিকৃত যৌন ক্ষুধাতুর মানুষের মলিন অপবিত্র মন ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী শিক্ষিত মানুষের দুর্বল শাসনতন্ত্র।

'দ্রৌপদী' গল্পের পটভূমি— উত্তাল সত্তরের দশক। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম রাজনৈতিক কর্মী তথা দোপ্‌দি মেঝেন এই দ্রৌপদী গল্পের কেন্দ্রিয় চরিত্র। এর বয়স সাতাশ বছর। স্বামী দুলন্ মাঝিও নকশাল পার্টির সক্রিয় কর্মী। ১৯৭১ সালে পুলিশ প্রশাসনের নৃশংস অমানবিকতায় গুলিতে মারা যায় তিনটি গ্রামের নিরীহ সব মানুষ। তখন দ্রৌপদী ও তার স্বামী দুলন্ মাঝি নিহতের ভান করে পড়ে থাকে। পরে এরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। এই খবর প্রশাসনের কাছে পৌঁছলে প্রশাসন নড়েচড়ে বসে। তারা দ্রৌপদী সমেত নকশালদের ধরতে বা মারতে চায়।

এদিকে গ্রামের নিরীহ মানুষকে মরতে দেখে দ্রৌপদী ও দুলন্ প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তারা সরকারের তোষামোদকারী জোতদার সূর্য সাউকে হত্যা করে। এই সূর্য সাউ সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে বিডিও সাহেবের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বীরভূমের মতো প্রচন্ড খরাপ্রবণ এলাকায় নিজের বসত বাড়িতে সরকারি টাকায় একটি টিউবয়েল ও তিনটি কুঁয়ো খুঁড়ে নিজের স্বার্থ গুছিয়েছিল। সরকারের এই বৈষম্য দুলন্‌রা মানতে পারেনি— তাই তারা সূর্য সাউ এর মতো স্বার্থপর মানুষকে বাঁচিয়ে রাখেনি। প্রশাসনও পাল্টা আক্রমণের রণকৌশল নেয়— তল্লাসি চালায়। দ্রৌপদী ও দুলন্-রা ঝাড়খানী বেল্টের আশেপাশে পার্টির কাজের দায়িত্ব নেয়। দিনকয়েক পর ঝাড়খানী জঙ্গলে জল খেতে গিয়ে দুলন্ ধরা পড়লে তাকে সেনারা গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেয়। দ্রৌপদী এখন একা। দ্রৌপদীর প্রকৃত স্বরূপ এখান থেকেই শুরু হয়।

এদিকে দ্রৌপদীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য সরকার থেকে পুরস্কার ঘোষিত হয়। প্রশাসন দুর্ভেদ্য ঝাড়খানি জঙ্গলে আর্মি অপারেশন চালু করে। সেনারা জানে দ্রৌপদীকে ধরতে পারলে দ্রৌপদী অন্য সহকর্মীদের ধরিয়ে দেবে। মুসাই এর বউ মারফত দ্রৌপদীও জেনেছে যে, তাকে ধরতে লোক লাগিয়েছে পুলিশ। সে জানে ধরা পড়লে শরীরের হাড় আস্ত থাকবে না কিংবা গুলি করে হত্যা করবে পুলিশ। পুলিশ গুপ্তচর হিসেবে খোঁচড়কে লাগায় দ্রৌপদীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য। খোঁচড়ের সহায়তায় কয়েকদিন পর সেনাদের হাতে দ্রৌপদী ধরা পড়ে। ধরা পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বুদ্ধিমত্তার সাথে সে তার দলের লোকেদের উদ্দেশ্যে 'হাইড আউট' বদলাবার কথা জানায়।

দ্রৌপদী ধরা পড়ে সন্ধ্যে ছ'টা সাতান্নতে। এরপর গল্পের কাহিনি ভিন্নমাত্রা পায়। ঠিক আটটা সাতান্নতে সেনানায়কের ডিনার টাইম হয় এবং তিনি দ্রৌপদীকে 'বানিয়ে আনতে' বলেন। তারপর এক নিযুত চাঁদ কেটে যায়— এক নিযুত চান্দ্র বৎসর। লক্ষ আলোক বর্ষ পরে দ্রৌপদী চোখ খুলে— বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে প্রথমে চাঁদকে দেখে, আর বোঝে বস্ত্রহীন সারা শরীর রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত। তারপর সকাল হয়। সেনারা দ্রৌপদীকে তাঁবুতে এনে খড়ের ওপর ফেলে দেয়। গায়ে একটা কাপড় জড়িয়ে দেয়। অতঃপর সেনানায়ক যখন দ্রৌপদীকে নিয়ে আসার হুকুম দেন তখন ঘটনাটা ক্লাইমেক্সে পৌঁছায়। দ্রৌপদী তার গায়ের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে উলঙ্গ হয়েই সেনানায়কের সামনে সে উপস্থিত হয়।

দ্রৌপদী দুর্বোধ্য অদম্য হাসিতে কাঁপতে থাকে। ওর বিক্ষত ঠোঁট থেকে রক্ত ঝরে। সে বলে— 'কাপড় কি হবে, নেংটা করাতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে ? মরদ তু ?' তারপর প্রশাসনের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে চারিদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুতু ফেলতে সেনানায়কের সাদা শার্টটি বেছে নেয়। এবং সেখানে থুতু ফেলে বলে, 'হেথা কেও পুরুষ নাই যে লাজ করব; কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কি করবি ?' একথা বলার পরই 'দ্রৌপদী দুই মর্দিত স্তনে সেনানায়ককে ঠেলতে থাকে এবং সেনানায়ক এই প্রথম নিরস্ত্র টার্গেটের সামনে দাঁড়াতে ভয় পান, ভীষণ ভয়।' গল্পটি এখানেই শেষ হয়। এই দ্রৌপদী ব্যাস রচিত মহাভারতে পুরুষের অনুশাসনের কাছে অসহায় দ্রৌপদী নয়, পরিস্থিতির মোকাবিলায় এই দ্রৌপদী যথেষ্ট প্রতিবাদী, রুদ্রাণী। সে কেবল রাজনৈতিক কর্মী নয়, ধর্ষিত বিবেক। পুরুষের বিবেকহীনতা ও পশুত্বের বিপরীতে দ্রৌপদী বিবেক সর্বস্ব মানুষ। প্রশাসনের তথা সেনানায়কের সমস্ত রকম বীরত্ব ও বিক্রমের বর্ম সে খুলে দেয়। আইনের অপশাসনের কাছে, বৈষম্যের কাছে, পুরুষের বিকৃত রুচির কাছে, সর্বোপরি মানবিকতায়, একজন নারী হিসেবে নিজের শরীরকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে দ্রৌপদীর সহজাত সত্তার এখানে প্রকাশ ঘটেছে।

'তরাস' গল্পের 'সাজুমণি' চরিত্রও এক প্রতিবাদী নারী। একটি বাগদী পরিবারের বধূ সে। ধনতান্ত্রিক নিষ্পেষণে বিপর্যস্ত ও অত্যাচারিত লাঞ্ছিত দারিদ্র্যপীড়িত বাগদি পরিবারের করুণ জীবনকাহিনি গল্পের বিষয়বস্তু হয়েছে।

'তরাস' বলতে অলৌকিক অশরীরী আত্মাদের উদ্দেশ্যে দেওয়া অনেক রকমের বিপুল পরিমাণে খাদ্যসামগ্রী। এই খাদ্য সামগ্রী ফাঁকা মাঠে রাখতে হয়-আত্মার শান্তি কামনায়। আলোচ্য গল্পে এই তরাস খাওয়ার প্রসঙ্গ এসেছে। মজুর খাটা বাগদি পরিবারে অর্থাভাব চিরন্তন। তাই পাশের গাঁয়ে যায় কাজের সন্ধানে। এদিকে পরীক্ষিৎ দত্তের পরিবারে বউ সাজুমণি ও তার মা কাজ করে। একদিন বিত্তবান পরীক্ষিৎ দত্ত সাজুমণির ইজ্জত নেয়। বিচারের আশায় থানায় গেলে পরীক্ষিতের কৌশলে দারোগা সাজুমণিকে আটকে রাখে, ধর্ষণ করে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে পরীক্ষিতকে টাঙির কোপে হত্যা করে ডাকাত। বিচারাধীন বন্দি রূপে ডাকাতের জেল হয়, সাজু ছাড়া পায়। আইন, অভাব, সংসারে-সে সংগ্রামী হয়ে ওঠে। কিন্তু অর্থসংকটে সাজু ও শাশুড়ি অনাহারে থাকে দু'দিন। এদিকে ঘটা করে পরীক্ষিৎ দত্তের শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়। নিয়ম অনুসারে মাঠে 'তরাস' দেয়। অভুক্ত সাজুমণি সোজা মাঠে গিয়ে 'তরাস'-এর খাদ্য সামগ্রী গোগ্রাসে গিলতে থাকে। আর বাড়িতে নিয়ে যাবার কথা ভাবে—

> "শাশুড়ি খাবে ছেলেরা খাবে। আজ তপ্ত, কাল বাসি। কাল বাসি ভাত খেয়ে শরীরে বল করে সাজু মৌলা যাবে। ঠিক যোগাড় করে নেবে কাজ। ঠিক ধরে রাখবে সংসার।" [৭৭]

অর্থসংকটের মধ্যেও সাজুমণি বাঁচার ও বাঁচিয়ে রাখার সংকল্প করে, এভাবেই প্রান্তিক মানুষেরা বেঁচে রয়েছে বাঁচার আনন্দে।

মহাশ্বেতা দেবীর 'স্তনদায়িনী' গল্পের 'যশোদা' মমতাময়ী মা রূপে কেবল নিজের সন্তানের মা নয়, ধনী হালদার পরিবারের শিশুদের দুধ দিত বলে 'দুধ মা' হিসেবে পরিচিত। সে পেটের জ্বালায় স্তন দান করত।

আর এভাবেই তার স্তনে ক্যানসার রোগ ধরা পড়ে। হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়। পাশে কেউ নেই এমন কি স্বামী কাঙালিচরণও যন্ত্রণার শরিক না হয়ে দূরে সরে গেছে আপন স্বার্থে। এমন কি মৃত্যুকালে মুখে একটুকু জলও সে পায়নি। এত সন্তানকে বাঁচিয়ে রেখে প্রতিপালন করেও একটু আগুন পায়নি শ্মশান যাত্রায়। ডোম তাকে দাহ করে। ভারতীর নারীর প্রকৃত অবস্থান সম্পর্কে গল্পকার এখানে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করেছেন—

> "যশোদা একেবারে ভারতীয় রমণী, যে রমণীর যুক্তি-বুদ্ধি-বিচারহীন স্বামীভক্তি ও সন্তান প্রেমের কথা, অস্বাভাবিক ত্যাগ তিতিক্ষার কথা, সতী সাবিত্রী সীতা থেকে শুরু করে . . . সকল ভারতীয় নারী জনসমাজে জাগিয়ে রেখেছেন।" [৭৮]

গল্পের দীর্ঘ অবয়বে পরিসমাপ্তি এসেছে সমাজের প্রতি মানবিকতার প্রতি তীব্র ঘৃণায় এবং যশোদার প্রতি লেখকের সহানুভূতিতে— 'বিশ্বসংসারকে দুধে পাললে যশোদা হতে হয়। নির্বান্ধবে একলা মরতে হয়, মুখে জল দিতে কেউ থাকে না।' গল্পকার পারিবারিক অবক্ষয়ের চিত্রকে কালপোযোগী করে তুলে ধরেছেন। রাজনৈতিক সমস্যা, অর্থনৈতিক সংকট, ও সামাজিক সমস্যায় দেশের অচলাবস্থা আসলে ক্যানসারের মতো মারণ রোগে আক্রান্ত— এটাই গল্পকারের জীবনদর্শন তথা সমাজদর্শন প্রতিকায়িত।

'রুদালী' শব্দের অর্থ পেশাদার কাঁদিয়ে। তাই গল্পের বিষয়বস্তু আমাদের যেমন চকিত করে তেমনি সমাজের বিচিত্র পেশার মানুষদের সনাক্ত করায়। গল্পে শনিচরীর রুদালী হয়ে ওঠার কাহিনি এখানে প্রতিফলিত। তাঁর ট্র্যাজিক জীবনে কান্নার সময় ছিল না— স্বামীর মৃত্যুর পর লাশ পেতে এবং সন্তানকে আগলে রাখতে গিয়ে সে কাঁদতে ভুলে ছিল। এমনকি একমাত্র নাতির মৃত্যুতেও সে কাঁদেনি। তাঁর না কাঁদার কারণ শোক ভুলে থাকা নয়, পেটের টান, রুজি রোজগারের ভাবনা ও ব্যবস্থা করা। ভবিষ্যতের জন্য কান্না তুলে রেখেছিল সে। কাঁদার জন্য রেট ছিল নিয়মে বাঁধা—

> "শুধু কাঁদলে একরকম রেট।
>
> কেঁদে লুটোলে পাঁচ টাকা এক সিকে।
>
> কেঁদে লুটিয়ে মাথা ঠুকলে পাঁচ টাকা দু'সিকে।
>
> কেঁদে বুক চাপড়ে শ্মশানে গিয়ে শ্মশানে লুটোপুটি খেলে ছয় টাকা দিতে হবে।" [৭৯]

তাই কেউ মরলে ওদের বাঁধা রোজগার। ওদের যেমন সুনাম বাড়ে তেমনি সম্মান বাড়ে মৃতের পরিবারের। মৃতের যশোগাথা নানাভাবে শুনে পরিবার ভাবতে বসে— যে জন্মেছিল সে আসলে দেবতা, ধরাধামে এসেছিল মাত্র। এই হৃদয়হীন ব্যবস্থায় শনিচরীদের মতো সর্বহারা মানুষেরা দুটো পয়সা পায়, বাঁচার সুযোগ পায়। আর সমাজের মধ্যে মহাজন, মালিক ভৈরব সিং-এর মতো বিত্তবানেরা মরলে আপনজনেরা রুদালীর প্রতিযোগিতা করায়। তখন শনিচরী ছাড়া রুদালী রাণ্ডীরা (বেশ্যারা) অংশগ্রহণ করে। কারণ রেট বেশি, বড়লোকের মৃত্যুতে খরচ বিস্তর। সমাজের এক জটিল অপশাসনে একশ্রেণির মানুষ রুদালীর মতো পেশায় জীবিকা নির্বাহ করেন এই সত্যকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

'ডাইনি' গল্পে সমাজের একঅবক্ষয়ের ছবি চিত্রিত হয়েছে। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা আদিবাসী সমাজের মধ্যে একটি কুসংস্কার বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। তাদের ধারণা মানুষের উপর প্রেতাত্মা বা পিশাচ শক্তি ভর করলে সেই ব্যক্তি ডাইনি রূপে আচরণ করে। সে অন্য মানষের দেহে ঢুকে ক্ষতি করে এমন কি মৃত্যু ঘটায়। গ্রামে গঞ্জে আকাল, খরা, মড়ক দেখা দিলে হনুমান মিশ্র বুদ্ধিমত্তার সাথে অপপ্রচার করে অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের (গঞ্জ, দোসাদ, ধোবী, ওঁরাও, মুন্ডা) মধ্যে পাপাচার ঢুকেছে, ফলে ডাইনির প্রভাবে এমন অনাসৃষ্টি ঘটছে। ডাইনি তাড়াতে টুরা, ঢাই, হেসাড়ির মতো পুরুষেরা জড়ো হয়ে চেঁচামেচি করে। কারণ তারা জানে ডাইনির প্রকোপে শস্য নষ্ট হয়, ছোট ছেলেপিলের প্রাণ যায়, রজঃস্বলা মেয়েকে স্বদলে টানে, গর্ভিনীর গর্ভে ঢোকে ইত্যাদি। তবে এই বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা দেখা যায় বলে নানান গ্রামে বিশ্বাস। যেমন— 'হেসাড়ির ছেলেমেয়েরা খচ্ড়ী হয়, কুরুডার ওঁরাওরা কামচোর, মুরহাইয়ে বুড়ো-বুড়ির মধ্যে প্রতি দশ-পনেরো বছরে একজন না একজন ডাইন্ বা ডাইনি হয়।' এদিকে ডাইনি নেই বলে গ্রামের পুরুষেরা ঘোষণা করে। ডাইনি দেখলে হত্যা করা হবে না, সিদ্ধান্ত হয়— পাথর মেরে বা আগুন ছড়িয়ে ডাইনিকে গ্রাম ছাড়া করা হবে। টুরার পহানের মেয়ে সোম্রিই ডাইনি বলে মিথ্যা প্রচারে অভিযুক্ত হয়। তাকে তাড়িয়ে দেয় হনুমান মিশ্র অতি কৌশলে জঙ্গলের মধ্যে। সোম্রি মিশ্রদের গোয়াল কাড়ার কাজে থাকাকালীন হনুমান মিশ্রের ছেলে তাকে গর্ভবতী করে পরে ডাইনির অপবাদে তাড়িয়ে দেয়। সমাজের একশ্রেণির লোক (হনুমান মিশ্রের মতো) স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশলে অন্যায় করতে দ্বিধা করে না। তাই অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের মানুষগুলি মিশ্রজীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার করে। এখানেই গল্পের সমাপ্তির সাথে সমাজ পরিবর্তনের স্পষ্ট বার্তা ঘোষিত হয়।

'চড়ক' গল্পটি ডোম সম্প্রদায়ের জীবন কাহিনি নিয়ে লেখা। ডোমদের মধ্যেও ধনী দরিদ্র দেখা গেছে। হরিপদ ডোম অবস্থাপন্ন মানুষ। সে নিজস্ব জমিতে চাষ করে, এছাড়া পাটালি ও গুড় চালান করে পয়সা পায়। এমনকি বুদ্ধি ও পরিশ্রমে সে কেরোসিনের ডিপো ও জলের কল বসানোর ঠিকাদারী আদায় করে নেয়। লেখিকার কথায়—

> ''কথায় বলে জলে জল বাধে, টাকায় বাধে টাকা। হরিপদর গুড়ে কেরোসিনের ডিপো বাধল। কেরোসিনের ডিপোয় বাধল চাপাকল বসাবার ঠিকাদারী।'' [৮০]

সামান্য দলিত সমাজের মানুষ হয়ে হরিপদ ডোম বুঝেছে চাপাকল বসাবার ঠিকাদারীতে ফাঁকি যথেষ্ট, মুনাফাও অনেক। সে অফিসে বাবুদের ঘুষ দিয়ে নতুন বিল পাশ করিয়ে নিতে পারে। এমনকি খাস জমিতে বাঁশ-জঙ্গলের ইজারা পায় হরিপদ ডোম। তাঁর এই দালালি ও ঠিকাদারীর ব্যবসা অবশ্যই ব্যতিক্রমী। কেননা যে সমাজে তাঁর জন্ম সেই সমাজের মানুষদের তুলনায় সে যথেষ্ট বুদ্ধিমান ও বড়লোক। সে স্বচ্ছল জীবন কাটায়, আর অন্যান্যরা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটায়। তাদের সামান্য জমি থাকলেও মূলত বাঁশ-এর তৈরি জিনিস বিক্রয় করেই তাদের জীবন-জীবিকা চালাতে হয়। কারণ—

> ''কারও জমি আছে, অধিকাংশেরই নেই। জলাভাবে সব মাঠই ফুটিফাটা। এদের জীবিকা বাঁশ কিনে এনে ঝুড়ি, কুলো বোনা এবং পাইকারদের বেচা।'' [৮১]

গল্পটিতে সত্তরের দশক পটভূমি হয়ে দেখা দেয়। যেখানে সুবিধাবাদী রাজনীতি চিত্র স্পষ্ট রূপে প্রতিফলিত। সরকারের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে একমাত্র হরিপদ ডোমই সরকারি সুবিধা ভোগ করেছে আর বাকিরা বঞ্চিত থেকেছে। হরিপদ নেতাদের তোষামোদ করতে শিখেছে। সে তরুণ এম. এল. এ.-কে বলে দুটো মিনিবাসের পারমিট বের করেছে। রাজনীতিতে নেমে অন্ধকার পথটি চিনে নিজের আখের গোছাতে পেরেছে হরিপদ ডোম। দলিত মানুষ হয়েও সে যে সমান দক্ষ তা প্রমাণ করে দিয়েছে চরিত্রটি।

এই গল্পে ডোম সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়। 'চড়ক' আসলে ডোমদের বড় ধর্মানুষ্ঠান। চড়কের দিন তারা উত্তাল নৃত্যে নিজেদের মাতিয়ে রাখে। নাচের আগে ধনী গরীব সব ডোমই পবিত্র হবার জন্য স্নান করে নেয়—

> ''এখন সকল ডোম শ্মশানদহে স্নান করবে, হরিপদও করবে। রক্তের বিশ্বাস। তারপর ডোমরা নাচবে।'' [৮২]

এই চড়ক পরবের নাচ ভয়ঙ্কর ও বীভৎস ধরনের। বহুকালের বিশ্বাস ডোম-সৈন্যরা শত্রুর মৃতদেহের ছিন্ন মাথা, হাত পা নিয়ে নাচত। এখনও সেই প্রথা ডোম সম্প্রদায়ের মানুষ পালন করে। ডোমরা এখন লাশ ঘরের লাশ সস্তায় কিনে নেয়। সেই লাশের কাটা হাত, পা, মাথা নিজের হাতে ঝুলিয়ে নিয় নাচে আর যদি লাশ না পাওয়া যায় তখন খড়ের তৈরি মানুষের হাত, পা, মাথা নিয়ে চড়কের দিন রাতের বেলা নাচ করে। ডোমদের অন্ধবিশ্বাস এই নাচের সময় অংশগ্রহণ করলে কিংবা যে কোনো দিক দিয়ে তাদের সাহায্য করলে ধর্মকাজে তাদের মঙ্গল হবে। তাদের বিশ্বাস রয়েছে যে মৃত ব্যক্তির আত্মার সঠিক সৎ কাজ এই নাচের পুণ্যের ফলে ঘটবে। আসলে ধর্মচরণের এই বীভৎসতা আদিমতা ও হিংস্রতা দলিত সমাজের প্রতিবাদের পরিচয়বাহী। এরূপ প্রথা ও বিশ্বাস কেবল গোঁড়ামি থেকে জীবনধারণের প্রচলিত অঙ্গ হিসেবে চলে এসেছে। অবশ্য এই প্রচলিত প্রথার জোরেই অসহায় বুধিরাম ডোম হিংস্র ও প্রতিবাদী হয়ে গেছে।

গল্পের মধ্যে লেখিকা দেখিয়েছেন একদিকে স্কুলে পড়াশুনা জানা বুদ্ধিমান ডোম হরিপদকে, অন্যদিকে নিরক্ষর অর্থলাঞ্ছিত বঞ্চিত, শোষিত ডোমদের প্রতিনিধি বুধিরামকে। বুধিরাম তাদের একমাত্র পেশা বাঁশের কাজকে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। প্রয়োজনে সংগঠন গড়ে আন্দোলন করেছে। সে হরিপদকে বাঁশ বিক্রয় ব্যবসার সাথে যুক্ত থেকে বড়লোক বানাতে চায় না। তার প্রতিবাদী কথা—

> ''বুদ্ধি তো একটাই হয় বাঁচার বুদ্ধি। বাঁশ নাই তো ডোম নাই। তামাম এলাকার ডোমগুলা মরে যাবে।'' [৮৩]

বুধিরামের অধিকার চেতনায় তার ডোম সমাজ ও তাদের পেশা বেঁচে উঠেছে। সে সংগ্রামী ও প্রতিবাদী রূপে ক্রমশ জাগ্রত হয়েছে। ঠিক এই সময়ই বুদ্ধিমান হরিপদ ডোম বোকা বুধিরামকে মিথ্যা অপরাধে জেলে পাঠায়। নিজ অধিকার ও চেতনার জোরে বুধিরাম জেল থেকে ছাড়া পেয়ে চড়কের দিনে হরিপদকে খুন করে প্রতিশোধ নেয়। হরিপদর দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন মাথাটা নিয়ে চড়কের পরবে উত্তাল নৃত্য করতে করতে সে বলেছে— 'আমার হাতে শত্তুরের মাথারে শত্তুরের মাথা।' সে বাধ্য হয় এ কাজে নিজেকে জড়াতে।

গল্পকার 'চড়ক' গল্পে অসহায় মানুষের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহাকে জাগাতে পেরেছেন খুব

সচেতনভাবেই। যেখানে বুধিরামের মতো নিরীহ শোষিত বোকা মানুষগুলিও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। যে সমাজে পায়ে হেঁটে কেউ প্রবেশ করতে সাহস পায় না, সেই অন্ধকারময় সমাজের সঠিক অধিকার প্রসঙ্গে বোকা মানুষগুলিকে একটু সচেতন করতে কলম ধরেছেন মহাশ্বেতা দেবী। তাঁর গল্পে যুক্তিবাদী জীবনদর্শন যেমন রয়েছে তেমনি বাঁচার অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বোধ জেগে উঠেছে।

ভগীরথ মিশ্র

বিশ শতকের সত্তরের দশকে অন্যতম কথাকার ভগীরথ মিশ্র। ১৯৪৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি মেদিনীপুর জেলায় তাঁর জন্ম। পেশাসূত্রে প্রশাসনিক দায়দায়িত্ব পালন করার সৌজন্যে তাঁর গল্পে গ্রাম্যজীবন ও শহরজীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা উপন্যাস ও গল্পের আধারে স্থান পেয়েছে। তবে তাঁর গল্পে ব্রাত্যজনের জীবন কথাই বেশি ঠাঁই পেয়েছে।

ভগীরথ মিশ্রের গল্পের অন্তর্বয়নে ধরা রয়েছে রাজনৈতিক দলের কোন্দল, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন, নকশাল আন্দোলনের সমকালীন সমাজ ভাবনা, শোষণের দ্বারা অতিষ্ঠ শোষিত শ্রেণি, এমনকি অন্তেবাসী নিম্নবর্গীয়দের দৈনন্দিন জীবন কথা। উপস্থাপনের ভিন্নতায় তাঁর গল্পে উঠে এসেছে— মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার নদী জঙ্গল পাথরময় বিস্তীর্ণ ভূমি সংলগ্ন অভাবী অথচ সরল নিরীহ মানুষের বিচিত্র জীবন কথা।

লেখক গ্রামগঞ্জ শহরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করে অনায়াস দক্ষতায় লোকসংস্কৃতির অভিধায় পরিবর্তমান সময়কে সামনে রেখে জটিল থেকে জটিলতর রাজনীতির মারপ্যাঁচ সম্পর্কে সচেতন হয়েবিপন্ন অসহায় মানুষের বাস্তব অথচ নিখুঁত জীবন কথা গল্পের পাতায় পাতায় তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবীর ন্যায়, বিপন্ন মানুষের মূল্যবোধকে সজাগ ও সম্মান জানাতে লেখনী ধারণ করেছেন ভগীরথ মিশ্র। আর সমাজ বাস্তবতাকে অবলম্বন করে মর্যাদা দিতে চেয়েছেন নিম্নবর্গীয়দের।

এদের কেন এত সমস্যা, অভাব, দুঃখ, অসহায়তা, পীড়ন, কেনই বা বেঁচে থাকা—এই সব জিজ্ঞাসার অন্ত নেই— নেই কোনো সমাধান। এ যেন সমস্যা নিয়েই অল্প আয়ুর জীবন। লেখকের জীবন দৃষ্টিতে চরিত্রের বাস্তবতা ও রূপায়ণ যেন সত্য হয়েছে। ছোটগল্পের ফ্রেম ও বিষয় যেভাবে বদলাচ্ছে ভগীরথ মিশ্র ঠিক সেই চলনসই শিল্পরূপের সাধক। বিষয় ও চরিত্র উপস্থাপনায় ভগীরথ মিশ্র বাস্তবতার ভেতর অন্যতর বাস্তবতাকে উন্মোচন করেছেন। যা আজকের বিশ্বায়নের যুগে তীব্র জিজ্ঞাসা স্বরূপ। সত্তরের দশকের পূর্বে কথাকাহিনীর মুখ্য বিষয় হয়েছিল ধনী-গরিবের লড়াই, রাষ্ট্রের নিপীড়ন আর বিপ্লব তথা বিদ্রোহের বাতাবরণ রচনা। যেখানে বৈঠকখানা, ভাইবোন, বাবা-মা, সম্পত্তি, নারী প্রেম দাম্পত্যজীবন যেন ছন্নছাড়া; লড়াই করতে করতেই এক একটি জীবন হারিয়ে যায়। সাহিত্য সৃজনের এমন বন্ধ্যা পরিস্থিতিতে ছোটগল্পের গ্রামীণ ধারাটি আবার বেগবান হয়েছিল এক ঝাঁক তরুণ শিল্পীর হাতে। তাদের মধ্যে ভগীরথ মিশ্র অন্যতম কথাশিল্পী।

ভগীরথ মিশ্র এই সময় লক্ষ্য করেছেন সমাজের হাজারো অনাচার ও অসংগতিকে। যেমন— রাজনৈতিক জুলুম, জীবনচর্যার বদল, প্রতিবাদী সত্তার বিকাশ, আচার আচরণ, মূল্যবোধ হীনতা, প্রেম-

হীনতা ও জটিল জীবন সংগ্রাম, যৌনজীবন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রদবদলে মানসলোকে ভাঙাগড়া। আর এসব প্রসঙ্গ পরিস্থিতিই তাঁর গল্পের মধ্যে ধরা রয়েছে, উঠে এসেছে সমাজ জীবনের চিত্র।

১৯৭৮ সালে লেখা 'কদম ডালির সাধু' গল্পটি 'মধুপর্ণী' পত্রিকায় প্রকাশ পায়। মেদিনীপুরের এগরা বালিঘাই, পানিপারুল সংলগ্ন এলাকা জুড়ে গল্পের ভৌগোলিক পটভূমি বিস্তৃত। গল্পের কেন্দ্রিক চরিত্র সাধুচরণ দলুই মন্দ স্বভাব ও অর্থাভাবে জটিল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। বিশ বছর বয়সে সে চোরের ওস্তাদে পরিণত হয়। এক কোপে মামা শশী গুছাইতের মুন্ডু কেটেছে, তারপর দীর্ঘ ষাটটা বছর দু হাতের দশটা আঙ্গুলের দৌলতে আর 'বিড়ালের মতো দু'টো পায়ের পাতা' নিয়ে চুরি করেছে সে। নব্বই বছরের সাধুচরণ এখন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে নিজের পাপে পূর্ণ হাত দেখতে থাকে বৈশাখ মাসের ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে। গল্পকারের ভাষায়—''দারুণ রোদের তেজে আকাশটা যেন গনগনে কড়াই। বাতাস যেন মরাল সাপের নিঃশ্বাস। মাঠের গাছপালা, ঘাসপাতা শুকিয়ে জ্বাল্। সারা এলাকা খরার কোপে ধুঁকছে। পুকুরের সব জল শুকিয়ে কাদা বেরিয়ে পড়েছে।'' [৮৪] ক্ষুধার জ্বালায় সাধুর প্রাণ বেরিয়ে এসেছে। তাই সে নুব্জ দেহটাকে টেনে মাঠ পেরিয়ে ভিন্ গাঁয়ে যাবার মতলব করে। দুর্ভিক্ষের করাল ছবি গাঁময় দেখে সে আঁতকে ওঠে।

গাঁয়ের মধ্যে ঢুকে সে ভিক্ষে চাইবে স্থির করে। সে দেখে একটি মেয়ে ঢেঁকিতে ধান ভানছে। ঢেঁকির গর্তে নতুন চাল দেখে সাধুর লোভ হয়। ঢেঁকিতে ধান ভানা মেয়েটিকে সাহায্যের জন্য গড় থেকে চাল তুলে দেয়। কিন্তু চুরির মতলব মাথায় আসতেই এক নাটকীয় পরিস্থিতি তৈরি করে সে। মেয়েটির ঘুমন্ত ছোট সন্তানকে গড়ের মধ্যে রেখে চাল বেঁধে গাঁ ছাড়ে সে। জীবনকে টিকিয়ে রাখার জন্য নিরন্তর খাদ্য অন্বেষণে সে আগ্রাসী হয়েছে। উপোসী পেটে আম সেদ্ধ দিয়ে তিনপো চালের ভাত খেয়ে সে মারা যায়। অবশ্য বাকি চাল তখনো গামছায় বাঁধা ছিল। সাধুর দীর্ঘ পথ চলা শেষ হলেও গল্পকার সামাজিক পরিস্থিতিকেই দায়ী করেছেন। তুলে ধরেছেন আর্থ-সামাজিক সমস্যার কথা শশী গুছাইতের মুখ দিয়ে—

> ''বাপ আমার দুনিয়ার রীতি আমি জানি রে। তোর চোখের সামনে সবাই খাবে, দাবে, ঘুরে বেড়াবে আমোদ ফুর্ত্তি করবে। তোকে শুধু ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকায়ে তাই দেখতে হবে। তুই তার থেকে একটুখান চাইলেই, সবাই তেড়ে আসবে। ছিনায়ে নিতে হবে, বুঝলি। দুটো হাতের দশটা আঙ্গুল অল্প বেঁকিয়ে সংসারের ঘি টুকু তুলে নিতে হবে। সোজা আঙ্গুলে এ সংসারে ঘি ওঠে না, বাপ আমার।'' [৮৫]

'সে ফেরেনি' গল্পটি ভাগ-রেকর্ড-এর প্রসঙ্গ নিয়ে লেখা। গল্পকার জটা ও তার বৌ এর অতিসাধারণ জীবনের গল্প জমিয়েছেন। বোকা হাঁদা জটা খামোখা জেল খাটায় এবং চালাক চতুর না হওয়ায় তার বউ ঝুঝেছে এ সমাজে জটার মত সাধারণ মানুষ অচল। যেখানে লাভ লোকসানের প্রসঙ্গে সবাই সজাগ, জটা সেখানে নির্বাক ও বোকা। গল্পকার জটার মতো সাধারণ মানুষের জীবন কথা শুনিয়েছেন—

> ''বড্ডো মাথা খাটো লোক। পাঁচের কথায় ভুলে আকমবাকম করে ফেলে। সামলাতে পারে না শেষ অবধি। তা নালে সব্বাই গেল পার্টির কথায় দাঙ্গা করতে, কেবল এ গাঁয়ের জটা দন্‌পাটের নামেই ওয়ারেন্ট বেরুল কেন ? খবর পেয়ে সবাই ছুট লাগাল, তুই পারলি না ?

আসলে ওই যে, বুঝতে, ভাবতে, চলতে, ফিরতে, সময় চলে যায়।"[৮৬]

সময়ের বাঁকে বাঁকে যে জীবনের গতি বদলাতে হয় তা জটার মতো মানুষেরা জানে না বলেই এদের নিয়েই গল্পকারের দরদী মন কথা বলে উঠেছে।

রাঢ় অঞ্চলের বিস্তৃর্ণ এলাকা জুড়ে জঙ্গল। এখানে ভূমিরূপ যেমন রুক্ষ্ম তেমনি বহুস্থানে জলাভাবে কুঁয়োর জলের সন্ধানে মানুষ চেষ্টা চালায়। 'ঝোরবন্দী' গল্পটি জলের সন্ধানে জীবনকে টিকিয়ে রাখতে একটি জীবন্ত চিত্র যেন। তুখোড় কুঁয়ো কাটিয়ে হিসেবে গগনের বাবার নাম ছিল। সে গগনকে বলেছে—

"যে যাই বলুক, আসল পুর্ণ্যি তর্ রে। বসমন্তার ছাতি ফাটায়ে তিষ্টার জল আইন্‌বার বাড়া সুকম্মো লাইকো এ সন্‌সারে। এক গঙ্গার জন্যে সগর রাজার ষাট হাজার ছাওয়াল-লাতি সগ্যে গ্যাছে। তুই আনতিছিস কিনা থানে থানে গঙ্গা।"[৮৭]

কুঁয়ো কাটতে গিয়ে গগনের দেহ কুঁয়োর মধ্যেই নিথর হয়। আর অঝোর ধারায় ঝোর থেকে জল উঠে আসে ওপরে, পাতাল গহ্বর এক লহমায় ভরে যায়। গগন (অর্থাৎ আকাশ) যেন পাতালে তার বিচিত্র জীবন ক্রিয়াশীল রাখে। এক সাংকেতিকতায় গল্পকার গল্পের নামকরণকে প্রাণবন্ত করেছেন এখানে। আর সমাজের নিম্নবর্গের ও নিরন্ন মানুষদের জীবন কথাকে গল্পের ভুবনে ঠাঁই দিয়েছেন।

'নেশা' গল্পের ফিল্মি অভিনেতা অমিতবরণ চলমান গাঁ-গঞ্জের জীবন থেকে নিজেকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে বিশেষ নেশার কারণে। তা হল মাটির মানুষের মায়া মমতা ও পবিত্র প্রেম ভালোবাসার সাথে ফিল্মের কৃত্রিম ভালোবাসার তফাৎ বুঝে, অনুভূতির পার্থক্যের জন্য। সরল মানুষের দেহ মনের ঘরে নিষ্পাপ সাহচর্য পেয়ে তিমিরবরণ গ্রাম ছেড়ে সিনেমার অভিনেতার জীবনে ফিরে যেতে চেয়েছে। জীবনে অনেক নায়িকার সাহ চর্য সংস্পর্শ পেয়ে স্বপ্নে বিভোর হলেও গাঁয়ের এক পুঁচকে মেয়ে টিয়াকে দেখে তাঁর অনুভূতি স্বপ্নলোকে পবিত্রতার স্পর্শ পেয়েছে যেন। গল্পকার বলেছেন—

"টিয়া চলেছে নদীর দিকে। সোনালী বালিতে তার ছোট্ট দুটি পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে যাচ্ছে পলকে। কেমন অলৌকিক মনে হয় তিমিরবরণের। স্বপ্নের মতো লাগে।"[৮৮]

এখানেই গল্পকার যেন মাটির মানুষের অতি সাধারণ জীবনকে স্পর্শ করতে পেরেছেন। সভ্যতার আলোয় ছোট্ট মেয়েটির খবর পৌঁছে দিয়েছেন।

'বিষকপ্পুর' গল্পে কম বয়সী সাহেব বিকাশ বাবুর দয়া হয় সদ্য বিধবা অল্পবয়সী 'বাসনার' মতো মেয়ের অসহায়তার গল্প শুনে। বাসনার বোন করুণার সাথে রঘুর (বাসনার স্বামীর) যে দৈহিক সম্পর্ক ছিল এবং হাসপাতালে কুমারী মা করুণার একটি কন্যা সন্তান হয়েছিল— এইসব গল্প সত্যি কিনা তা বিডিও সাহেব বিকাশবাবুর সন্দেহ হয়েছিল। অবশ্য শুদ্ধ মানবিকতায় বাসনার ছোট্ট ছেলে 'মন্টু'র কথা ভেবে সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। বাসনার কঙ্কালসার দেহে ও মুখে আনন্দ ও হাসি দেখা দিয়েছে। সত্যদ্রষ্টা বিকাশবাবু এই সভ্য সমাজের জটিল আবর্তের সত্য কথা জেনে স্তম্ভিত—

"এই সুসভ্য দেশে, অন্য কোনও কারণে নয়, কেবল চাট্টি ভাতের জন্য একটি অনাথ যুবতী বহুভোগ্যা হতে বাধ্য হবে।"[৮৯]

কেবল সমাজকে প্রত্যক্ষ করে নয়, প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ছবি তুলে ধরেছেন গল্পকার। কেবল সন্তান প্রতিপালন এর দায়িত্ব ও কর্তব্যে বাসনার মতো মেয়েরা জীবন বিকিয়ে জীবনের পরিচর্যা করে চলে। আর প্রতারণার শিকার হয় অতি সহজেই। কপ্পুরের মতো জীবন যেন হঠাৎ করেই হারিয়ে গেছে উবে গেছে। আর বাসনার স্বামী রঘুর উপস্থিতিও যেন কপ্পুরের মতো। রঘু (করুণার জামাইবাবু) খাতায় নাম লিখিয়েছিল বাসনার, তাই বহুদিন বাদে সহায়হীন বাসনা রঘু ও করুণাকে হারিয়ে খুঁজে পেতে চেয়েছে করুণার মেয়েকে। তাই বাসনা বাঁকুড়ার আদালতে মামলা করেছে। কেননা 'সন্‌সারে কাজকর্মের অভাব ?' বিকাশ বাবুর মাথায় উকিলের মতো বোধবুদ্ধি ছিল না বলেই হয়তো এই গল্প শুনে মাথা ঝিমঝিম করছিল। গল্পকার এখানেই গল্পের ইতি টেনেছেন। বিকাশবাবুর ফেলে আসা স্মৃতি জটিল সমাজ জীবনে কতটা ব্যাপকতর ভাবে গতিময় তার প্রতি গোপন দায়বদ্ধতায় আমাদের সজাগ থাকা কর্তব্য।

'পুত্রেষ্টি' গল্পে লোভ ও বিরংসার ছবি ব্যক্ত হয়েছে। জমি-জিরেতহীন প্রহ্লাদ সরকারী সাহায্যে এক জোড়া বলদ অনুদান পেয়ে নিঃসন্তান বউ-এর কথা ভেবে চিকিৎসার কারণে তা বিক্রয় করে। তার মামা ডাগর বউয়ের প্রতি নজর দিত; ভাগ্না বউ হলেও এই কুনজরের জন্য প্রহ্লাদ সচেতন থাকত। কংস মামা ভাগ্না বউকে গল্প বলত—"কুন্তীর তো পাঁচ ছেইলাই পাঁচ জনার। তব্বো ইয়ারা শাস্তর মতে সতী। আসলে জমিন যাতে অফলা না থাকে।"[৯০] ধুরন্ধর এই কংস তুঙ ভাগ্নাকে চক্রান্তের মধ্যে ফেলতে চায়। আর না পেরে সহসা দু'হাত দিয়ে টিপে ধরে প্রহ্লাদের গলা। তখন ছুটে আসে বউ পার্বতী। সন্তানের মা হওয়ার আনন্দে একটা স্বর্গীয় সুখে নিমজ্জিত হয় উভয়েই। প্রহ্লাদ অকপটে উদার হাসি এনে বলেছে—

> "তুমি দাদু হচ্ছো গো মামু। ভাইগনা বউয়ের কোলে ছা দেইখবার লেগে তুমি কত কান্ডই না কইরেছো! মিছা লয় ইবার সত্যিসত্যিই দাদু হচ্ছো তুমি।"[৯১]

'সুবচনী' গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের গঠনে প্রকাশ পেয়েছে। মান হারাবার ভয়ে সুবচনীর মতো মেয়েদের ভয় পায় সরকারী অফিসের বিডিও এবং ভদ্র মানুষ, এমন কি চোর ডাকাতরাও। অন্যায়ের প্রতিবাদ সে অশ্লীল, অশ্রাব্য, খিস্তি খেউড়ের ভাষায় শ্লোক প্রবচন ও ছড়ার মাধ্যমে অবলীলায় করতে পারে বলে তাকে সবাই শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় করে। এই অভাবী মানুষটির বাচনিক সাহস ও কৌশলের জন্য বিরোধী পার্টির লোক মিহির দত্ত পর্যন্ত তাকে ব্লকের অফিসে নিয়ে গিয়ে খেউড় শুনিয়ে (সুবচনীর) আটা আদায় করেছে। সুবচনী কেবল গালমন্দ বলতে পারে তা নয়, শেষ বয়সে কণ্ঠ তার স্বর হারিয়েছে। 'বুকের সুর বুকের মধ্যেই গুমরে মরে: দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী/ভিতরে আছেন শ্যাম-মুরারী/দ্বার ছেইড়ে দে'রে দ্বারী . . .।' 'এক অদৃশ্য দ্বারীর উদ্দেশে আকুল গাইতে গাইতে তার চোখের কোল নিঃশব্দে ভরে যায় জলে।' ছড়া, প্রবাদ, গল্প, গান বাঁধতে জানা সুবচনী চিরকালের মতো অদৃশ্য হয়ে রয়েছে নিম্নবর্গের মানুষগুলির প্রতিনিধি হয়ে। আর মিহির দত্তের মতো জননেতার কাছে সুবচনীর মতো অভাবী মেয়েদের চিরকালীন আবেদন—'চল্‌ না গ, একটিবার বিডো আপিসে। প্যাটের জ্বালা যে আর সইতে লারি।'

'ইন্দর যাগ' গল্পটি রাঢ় অঞ্চলের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন চর্চা কেন্দ্রিক বিশ্বাস ও আবিশ্বাসের পরিচয়বাহী। 'ভোজবিদ্যা, কুহকবিদ্যা, মধুবিদ্যা, ডাকিনীবিদ্যা, কাকচরিত্র কতই না বিদ্যা আছে এ

দুনিয়ায়।' যেমন— 'মরাইয়ের ধান উড়ায়। পোকরের মাছ উড়ায়। গাইয়ের বাঁটের দুধ উড়ায়। বাণ মেরে মুখে রক্ত তুলে' ইত্যাদি বিদ্যায় লখিন্দর ওস্তাদ ও ওঝা লোক।' তাকে সবাই সাতপাটি, শিলদা (পশ্চিম মেদিনীপুর) তল্লাটে বিদ্যাবাগিশ বলেই জানে। সে পূজমান ভৈরব গাঙ্গুলির জমিতে ইন্দ্রযজ্ঞের মাধ্যমে বৃষ্টি আনতে চায় না। আকাশ থেকে বৃষ্টি নামলে সবার জমির উপরই বৃষ্টি পড়ুক মনোভাব পোষণ করে। এদিকে পাঁচ হাজার টাকার ইন্দ্রযজ্ঞের খরচ বহনকারী ভৈরব গাঙ্গুলী দেবতার কাছে নিজের হিংসুটে মনোভাবের পরিচয় তুলে ধরে। আর লখিন্দর অভাবী অথচ খরায় নাজেহাল গ্রামের মানুষের সাথে সমব্যথী ব্যক্তির প্রতিনিধি হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। গ্রামের মানুষ তার ভালোবাসায় তাকে আপন করেছে। ফিরিয়ে এনে ঘর বাঁধতে বলেছে নতুন করে। আর 'দরকার হইল্যে ইলিজেদ্যার বিক্রী কইর‍্যোঁ তুমার ইন্দর যাগের খরচ তুইল্যোঁ দুবো মোরা। তুমি ফিইর‍্যে চল।' গ্রাম ছাড়তে চাওয়া লখিন্দর ভালোবাসার টানে কালো মানুষগুলোর দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে। আর 'অগ্নিবর্ষী' আকাশে ধীরে ধীরে জমতে থাকে মেঘ। এক সময় দুচোখ ফাটিয়ে লখিন্দরের কপাল বেয়ে ঝরতে থাকে বৃষ্টি। প্রকৃতির অনাবিল দানে ভৈরর গাঙ্গুলির মতো কৃপণ লোকও তুষ্ট হয়। ভালোবাসার কৃত্রিম বন্ধনে বাঁচার স্বপ্ন জাগে। ভগীরথ মিশ্র নিম্নবিত্ত মানুষের স্বপ্ন ও বাস্তবতাকে গ্রাম্য জীবন কথায় জীবন্ত করে রেখেছেন গল্পের পাতায় পাতায়। আজও তিনি গল্পের প্লট নির্মাণের পাশাপাশি ভাষা ও শব্দ চয়নের মধ্য দিয়ে চরিত্রকে জীবন্ত করে সমাজ জীবনের ছবি এঁকে চলেছেন।

অমর মিত্র

অমর মিত্র বাংলা সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট লেখক। বিশ শতকের সত্তরের দশকে তাঁর লেখনি ধারণ। ঠিক এই সময়ে মাত্র কয়েক জনের উজ্জ্বল উপস্থিতিতে বাংলা কথাসাহিত্য বিষয় ও ভাববৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। এই সময় কালের পূর্বে বাংলার কথাসাহিত্যে প্রায় বন্ধ্যা দেখা দিয়েছিল। যেখানে বিষয় হিসেবে প্রাধান্য পেয়েছিল— নগর জীবনের প্রেম-প্রত্যাখ্যান ও অর্থনৈতিক টানাপোড়েন। অবশ্য এর বাইরে ছক ভাঙার লক্ষে বেশ কয়েকজন লেখক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করা মানব জীবনের দিকে তাকিয়েছেন। যে সব মানুষের বিশ্বাস, বৃত্তি, জীবনচর্যা, ভাষা, সংস্কৃতি সম্পূর্ণ পৃথক কিন্তু ক্ষুধা তাদের এক রকম। এই সমস্ত সর্বহারা প্রকৃতি নির্ভর গ্রামীণ মানুষদের সুখ-দুঃখ, অভাব-অনটনের নির্মম জীবনেতিহাসের চিত্র তুলে ধরেছেন বাংলা ছোটগল্পের নিপুণ শিল্পী অমর মিত্র।

অমর মিত্রের জন্ম ৩০ আগস্ট, ১৯৫১, বাংলাদেশের খুলনা জেলার সাতক্ষীরা শহরের সন্নিকটে ধূলিহর গ্রামে। তাঁর প্রথম ছোটগল্প 'পার্বতীর বোশেখমাস' কবিপত্রে প্রকাশ পায় ১৯৭৪ সালে। তারপর দীর্ঘ এত বছর ধরে অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের ক্রমাগত মেলবন্ধনে মানুষের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস তাঁর গল্পে ছায়া ফেলেছে।

প্রায় তিনশ ছোটগল্পের লেখক অমর মিত্র কোনো দিন বাণিজ্যিক পত্রিকায় লেখার দায়বোধ করেননি— এমনকি উপেক্ষাও করেননি। লিটল ম্যাগাজিনেই তাঁর গল্পের সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ও পরিচিতি। তবে বড় পত্রিকাতে তাঁর ছোটগল্প আজও প্রকাশিত হয়ে চলেছে যথেষ্ট সুনামের সঙ্গে। সংবেদনশীল পাঠক সমাজে তিনি আজ অনুরাগধন্য।

অমর মিত্রের সৃজনী প্রতিভা বাংলাসাহিত্যের সীমানা ছাড়িয়ে প্রতিবেশী তথা সর্বভারতীয় সাহিত্যের পাতায় স্থান পেয়েছে। তিনি 'স্বদেশযাত্রা' গল্পের জন্য ১৯৯৮ সালে সর্বভারতীয় কথা পুরস্কার পেয়েছেন। এছাড়া ছোটগল্পের জন্য ২০০২ সালে পেয়েছেন আনন্দ স্লো-সেম পুরস্কার। 'কথা'র বেস্ট অফ নাইনটিজ, গত শতাব্দীর নয়ের দশকে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ভাষার গল্প সংকলনে একমাত্র বাংলাগল্প তাঁর 'স্বদেশযাত্রা'। পেয়েছেন সমরেশ বসু পুরস্কার, অমৃতলোক পুরস্কার। 'সন্তান সন্ততি' গল্পের জন্য ১৯৯০ সালে পেয়েছিলেন সমতট পুরস্কার। ২০১১-য় প্রকাশিত 'মানুষী মাহাতোর জীবন মরণ' গল্পটি বর্ণপরিচয় প্রতিদিন-শারদ সম্মানে ভূষিত হয়। প্রতিভাধর এই লেখক ২০০১ সালে 'অশ্বচরিত' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন বঙ্কিম পুরস্কার। ২০০৪ সালে ভাগলপুরের শরৎ পুরস্কার এবং ২০০৬ সালে 'ধ্রুবপুত্র' উপন্যাসের জন্য সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার। তাঁর বিভিন্ন গল্প হিন্দি, ইংরেজী, মালয়ালম, তামিল, উর্দু ইত্যাদি ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ছোটগল্পে চল্লিশের দশকের লেখকেরা যেমন সামাজিক দায়বদ্ধতায় গ্রামীণ অসহায় বিপন্ন মানুষের বাস্তব ছবি এঁকেছিলেন ঠিক এই ভাবনার পুনরভ্যুত্থান ঘটালেন সত্তরের দশকে একদল তরুণ লেখক। এই সত্তরের দশকেই বেশ কয়েকজন কথাশিল্পী উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে গ্রাম ও মফস্‌সল থেকে শহরে আসেন। পরে পেশাসূত্রে আবার গ্রাম ও মফস্‌সলে অতি সাধারণ মানুষের সঙ্গ পেয়েছেন; বলা ভালো সঙ্গে থেকেছেন আর সঞ্চয় করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং সযত্নে লালিত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। এই সময়ে যারা লেখনী ধারণ করেছেন তাদের মধ্যে সাধন চট্টোপাধ্যায়, অনিল ঘড়াই, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, কিন্নর রায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অমর মিত্রেরা আজও সাহিত্যের পাতায় বলিষ্ঠ ভাবেই সৃজনশীল। এই সময়ের লেখকেরা পূর্বসূরীদের গল্প উপন্যাসের বিষয়ভাবনা সযত্নে এড়িয়ে তুলে ধরেছেন— সমাজের হাজারো অসংগতি, অনাচার, ভ্রষ্টাচার, দুঃখ ও অসহায়তা; সর্বোপরি 'এত সমস্যা কেন'—এই জিজ্ঞাসার মালা রচনা করেছেন। কেন অভাব, কেন কষ্ট, তবে কেন জন্ম, কেন বাঁচা, কেন পীড়ন, কেন এত অসহায়তা— এই জিজ্ঞাসার অন্ত নেই। আসলে মানুষ জন্মায়, হাসে, কাঁদে। সেই মানুষ আনন্দে হাসে, বিষাদে ডোবে, আবার আহ্লাদে জীবনকে আঁকড়ে ধরে— এভাবেই জীবনের গল্প বাস্তবতার গল্পে পরিণত হয়, শিল্পের মর্যাদা পায়।

আসলে শিল্পী-সাহিত্যিকদের চোখে চলিষ্ণু মানব সমাজের সুখ-দুঃখ কিংবা দুঃখ-সুখ, হতাশা-বেদনা, বিগত ও সম্ভাব্য সমস্ত সমাজ জীবন কথাশিল্পের আকারে ধরা থাকে। মৃত্তিকা সংলগ্ন রক্তাক্ত সংগ্রামী অসহায় মানুষের বিপন্ন জীবন কথাকে অমর মিত্র স্বদেশানুরাগের দৃষ্টিতে গল্পে উদ্ঘাটন করেছেন। অচেনা অদেখা গ্রামের বিশ্বস্ত ছবি তাঁর ক্যানভাসে স্থান পেয়েছে। যেখানে কৃষি-অর্থনীতি ও ভূমি সম্পর্কের কাঠামোর মধ্যে অসহায় বিপন্ন মানুষেরা ভিড় করেছে। অসহায় দরিদ্র মানুষের মনে যে নিয়ত অবক্ষয় ও মূল্যবোধের বিনষ্টির কর্মযজ্ঞ চলছে তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মানুষকে চিনিয়ে দেওয়া, মানুষের শুভবোধে বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখতে মূলস্রোতে ফেরানোর উদ্দেশ্যে অমর মিত্রের লেখনী আজও সচল রয়েছে। তাঁর বেশিরভাগ গল্প গ্রামীণ পটভূমিকায় ভূমি নির্ভর শ্রম সম্বল দরিদ্র মানুষের জীবন কাহিনী। অবক্ষয়ের অতলান্ত প্রদেশ থেকে শুভবোধে ফেরার একটা চরম প্রচেষ্টা যেন গল্পকার স্পষ্ট রেখায় ও রঙে ধরতে চেয়েছেন।

বিষয় নির্বিশেষে অমর মিত্রের গল্পে অভিজ্ঞতার নির্যাস হিসেবে পাওয়া যায়— সত্তরের নকশাল আন্দোলন, ক্ষমতাসীন বামপন্থী দলের আদর্শগত বিচ্যুতি, বিকৃত রুচির বিজ্ঞাপনে নারীদেহ, গ্যাট চুক্তি, পুলিশের নির্মম অত্যাচার, পরিবেশ দূষণ, জীবিকা-চ্যুতি, জীবিকার তীব্র সংকট, বিশ্বাসভঙ্গতা, ঘুষচক্র, অবিশ্বাস ও সংশয়জনিত বিচ্ছিন্নতা, খাস জমি বিলি, জমির অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্বের মতো ছবি। দীর্ঘ দিন ভূমি রাজস্ব দফতরে চাকরির সূত্রে গ্রামে থাকার সুবাদে প্রত্যক্ষ করেছে— ক্ষুদ্র গন্ডির শহরে মধ্যবিত্তের করুণ অসহায়ত্ব, মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত বা দরিদ্র জীবনে অপ্রাপ্তি ও অসংগতি, সুস্থ পরিবেশের বিকৃত ও নগ্নরূপ, দরিদ্র ও অজ্ঞ মানুষদের অপমান ও লাঞ্ছনা ইত্যাদি অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতিরূপে বাংলা গল্পের পরিধিকে তিনি অনেকখানি সম্প্রসারিত করতে পেরেছেন। বিশেষ করে ভূমি-সম্পর্ক কেন্দ্রিক গল্পের শিকড়টাকে অনেকটা গভীরে চারিয়ে দিতে পেরেছেন। আর তুলে আনতে পেরেছেন অ-চেনা

অ-দেখা গ্রামের সময়পৃষ্ট বিপন্ন মানুষের বিশ্বস্ত ছবি। ফলে চল্লিশের দশকে রচিত ভূমি কেন্দ্রিক গল্পের পর পুনঃরায় সত্তরের দশকের লেখকদের অন্যতম অমর মিত্র অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি স্বরূপ ভূমি সম্পর্কিত গ্রামকেন্দ্রিক গল্প লিখে বাংলা গল্পের পরিধিকে বিস্তৃতি দিয়েছেন।

তাঁর গল্পের চরিত্ররা উচ্চবিত্ত শ্রেণির নয়— খেটে খাওয়া দরিদ্র মেহনতি মানুষ, শ্রমজীবী, নিম্নবিত্ত, দিন মজুর, মধ্যবিত্ত, কৃষক, ভাগচাষী এমনকি শহরের কোলাহলে জীবিকাচ্যুত অসহায় মানুষ। অমসৃণ রুক্ষ রাঢ়ের গ্রাম-নদী-পাহাড় পরিবেশ নিয়ে অসহায় বিপন্ন গরীব মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি পরম মমতা ও স্নিগ্ধতায়, গভীর দায়বদ্ধতায় আজও অমরের লেখনী সমান গতিশীল। আসলে গ্রামীণ সমাজ জীবনের রূপকার অমর মিত্রের সজাগ দৃষ্টিতে ধরা রয়েছে মাটি ও মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের কথা।

অমর মিত্রের গল্পের ভুবন ধরা রয়েছে কবিপত্র, প্রমা, অমৃত, দেশ, প্রতিক্ষণ, মহানগর, পরিচয়, সংক্রান্তি, রবিবাসরীয় ও শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা, সাপ্তাহিক বর্তমান ছাড়াও বিভিন্ন পত্রিকার (গাঙ্গেয়, যুবমানস, গল্পপত্র, আজকাল, কালান্তর, প্রতিদিন, বসুমতী, অনীক, চেতনা ইত্যাদি) শারদীয় সংখ্যায়। ১৯৭৪ সালে 'পার্বতীর বোশেখ মাস' গল্পের পর ২০০০ সাল পর্যন্ত আমার গবেষণা কর্মের কাল সীমায় অমর মিত্রের মোট প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা ২৫২টি।

অমর মিত্রের বেশ কয়েকটি বিশিষ্ট গল্পে রাঢ় অঞ্চলের সমাজ জীবনের পরিচয় উঠে এসেছে। গল্পের মধ্যে প্রধান চরিত্রের শ্রেণি অবস্থান হিসেবে পাওয়া যায়— গ্রামের ভাগচাষী ক্ষেতমজুর ভূমিহীন কৃষক থেকে শুরু করে জীবিকাচ্যুত বিপন্ন মানুষগুলি অমর মিত্রের গল্পের আবহ গড়ে তুলেছে।

১৯৭৫ সালে 'কবিপত্রে' প্রকাশিত অমর মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প 'মাঠ ভাঙে কালপুরুষ'। প্রকৃতির রুক্ষতার সঙ্গে মহাজন সামন্ত প্রভুদের নিষ্পেষণে কৃষি মজুর রূপাই-এর অসহায়তাই এই গল্পের বিষয়বস্তু। প্রকৃতির খেয়ালীপনায় রূপাই (প্রতীকে জীবন্ত কালপুরুষ) একদিকে ভূমিহীন অন্যদিকে শোষণ ও বঞ্চনার শিকার। অথচ এই রূপাই-এর একদিন সব ছিল—

> "জমি ছিল বটে, জমি অর্থে মাথা গোঁজার ঠাঁই। ...বাবু বিক্রি কব্‌লা ক'রে নিল। মাটি গেল বাবুর ঘরে, রূপাই ঘর ছাড়লো। বউ মরল ছানা মরল রূপাই ঘর ছাড়ল একা। পিঠের উপর ধনুক, হাতে মাছরাঙা পালক আঁটা তীর। ...মজুরী চাই...মুনিষ খাটতে রূপাই ঘোরে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।" [৯২]

পেট চালাতে রূপাইকে চুরি করতে হয়। অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়। কখনো মুরগী, কখনো পুকুর ঘাটে ভেজানো বাসনপত্র চুরি করে সে চোর হয়। এই সব দ্রব্য বিক্রয় করে পেট চালায়; বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে। অবশেষে সে কাজের সন্ধান পায় মহাজন ছিদেম বাবুর আশ্রয়ে। লেনদেনের কাজ, ধান কেটে ও মুনিষ খেটে তার হাতে পয়সা আসে। এখন সে হাঁড়িয়ার নেশায় মেতে থাকে। তা সত্ত্বেও মালিকের বিশ্বাসী মজুর সে। অভাবী-লোভের তাড়নায় রূপাই বিশ্বাসভঙ্গ করে। সে মালিকের ধান বিক্রয় করে টাকা নিয়ে ফেরার হয়। কারণ সে আর প্রতারিত হতে চায় না। ইতিপূর্বে সে অনেক কষ্ট দুঃখ অভাব সহ্য করেছে। এবার সে বাবুদের মতো সুখী হতে চায়। নিরালা সন্ধ্যেয় বসে বসে সে ভাবে 'ঘর হবে

মেয়ে মানুষ হবে।' রূপাই-এর দুর্দশা দেখে লেখক আক্ষেপের সুরে বলেছেন— 'শুধু স্বপ্নই দেখ...ঘর বাঁধা কোন শীতেই হল না।' এই রূপাই জীবন দিয়ে জেনেছে স্বপ্ন কি বাস্তব কি—

> "হামি বাবুর ঘরে অন্ন তুলিছি ই-কলজ্যার ফুটাফুটা অক্ত দিয়্যা। ...প্যাটের অন্ন বাবুর খামারে, হাই সি অন্ন বিকোয়ে বাবু মাগ রাখে তিনটা আর হামার ঘর নাই, হেই ঘর নাই, তো মাগ নাই, হা-মাগ নাই তো জগৎ নাই।" [৯৩]

অপ্রাপ্তি ও অতৃপ্তিতে রূপাই এখন উন্মত্ত। পলাতক রূপাই এখন কালপুরুষ। তার পিঠে তীর ধনুক। যেন আকাশের কালপুরুষ মাঠে নেমে এসেছে। তার অভিমান ও ক্ষোভ সমাজের প্রতি; বৈসাদৃশ্য ও শোষণের প্রতি। প্রচন্ড ক্ষোভে ও রাগে সে হরিণবাবুকে শরবিদ্ধ করতে চেয়েছে। কারণ সে রূপাইয়ের বন্ধকী জমি বিক্রি-কবলা করে নিয়েছে। তার এই বিদ্রোহ আসলে আবহমান শ্রেণি বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামী মানুষের প্রতিবাদ— মহাজন ও জোতদারদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। সে এই পৃথিবীতে অবহেলিত বঞ্চিত শোষিত অসহায় গরীব মানুষের প্রতিনিধি হয়ে বলেছে— 'হামার ঘর নাই, হা ঘর নাই তাই মাগ নাই, মাগ্ নাই তাই পিথিমি নাই। হেই সব জমিন হইছে সব বাবু মানুষের।'

বিপন্ন মূল্যবোধ ও বিনষ্ট বিবেকের পরিচয় এখানে রূপক-প্রতীকের মাধ্যমে মূর্ত হয়েছে। কালপুরুষের প্রতীকে রূপাই-এর মাধ্যমে শোষিত সমাজ ব্যবস্থাকে বিদ্ধ করেছেন অমর মিত্র। নিঃস্ব রিক্ত রূপাই তিরন্দাজিতে ওস্তাদী দেখিয়ে গরীবের মধ্যে বড়মানুষ হয়ে জীবনের সাধ পূরণ করেছে। তবু সে ছিদাম বাবুর অধীনতায় থাকতে রাজি নয়। অমর মিত্র পাপবোধহীন সহমর্মিতাহীন হিংস্র সমাজব্যবস্থার ছবি এঁকেছেন। যেখানে— 'কানুন নাই, সমাজের কানুন, দিবতার কানুন।' রূপাইয়ের জীবনকাহিনীতে সঞ্জীবিত হয়েছে সমাজের ছবি।

সম্পত্তির অধিকার নিয়ে পারিবারিক দ্বন্দ্ব নির্ভর গল্প 'সন্তান সন্ততি'। মৃত ভানু সর্দারের ছেলে ভোলা ও তার পাঁচ বোনের মধ্যে নীচ স্বার্থপরতা, লোভ, ষড়যন্ত্র ও অবক্ষয়ী মূল্যবোধ ফুটে উঠেছে। গল্পের বিষয় আধ বিঘা জমির অধিকার নিয়ে। ভোলা সর্দার মা গিরিবালার অংশের জমি কাউকে দিতে রাজি নয়। সে অন্যদের থেকে বড়লোক হতে চায়। একটু উঁচুতে উঠতে চায়। এই লোভাতুর আগ্রাসী 'ভোলাকে' অমর মিত্র শুভবোধে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। মা গিরিবালা ভোলাকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—

> "উঠতি ভালো, কিন্তু একা কি উঠা যায় ? সবকে নিয়ে উঠতি হয় বাপ...।" (সন্তান-সন্ততি)

—এখানে নীতিবোধ ও সাম্যবোধের সাথে মানুষকে শুভবোধে ফেরানোর লক্ষ্যে গল্পকারের সুন্দর মানসিকতার পরিচয় স্পষ্ট হয়। সংসারের প্রতিটি সদস্য কেউ পর নয়। যোগ্য অভিভাবকের ভূমিকার পরিচয় দিয়েছে গিরিবালা। এই সংসারে কেউ পর নয়, দুঃখে আনন্দে সবারই সমান অধিকার আছে। সংঘবদ্ধ জীবনের আনন্দই বেঁচে থাকার মূলমন্ত্র। অমর মিত্রের গল্পে এই বার্তাই ধরা পড়েছে।

অমর মিত্রের নদীকেন্দ্রিক গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয় সম্পদ। নদীর নাব্যতা, গতিপথ বদল ও শুকিয়ে যাওয়ার ফলে মানুষের বেঁচে থাকার সংকট তথা বিপন্নতার ছবি ধরা রয়েছে বেশ কয়েকটি গল্পে। যেমন— 'নদীভূমি', 'প্রাচীর', 'নদী-কাহিনী', 'শুখানদী'-র মতো গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে

নতুন মাত্রা এনেছে। নদী-জল ও মানুষ নিয়ে বিস্তৃত ভাবনায় অমর মিত্র সমকালীন লেখকদের থেকে অনেক প্রাঙ্গসর।

অমর মিত্র সমকালীন রাজনীতি সচেতন লেখক। তাঁর 'জংশন', 'হেমন্তের প্রস্তুতি', 'প্রাণবায়ু', 'একা', 'স্বদেশ যাত্রা' প্রভৃতি গল্পগুলি যথেষ্ট রাজনীতি টানাপোড়েন নির্ভর গল্প। 'হেমন্তের প্রস্তুতি' গল্পে সত্যেন নিতান্ত নিরীহ মানুষ, সে সত্যের পূজারিণী। বিপথ থেকে সে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছে। একটা আবরণের আড়ালে লেখক এখানে কদর্য হিংস্র রাজনৈতিক মনোভাবকে চিনিয়ে দিয়েছেন।

নকশাল আন্দোলনের পটভূমিকায় অসাধারণ গল্প 'প্রাণবায়ু' যথেষ্ট ব্যঞ্জনাধর্মী। এই গল্পে তিমির, যোগেন, পার্বতীরা সামাজিক চক্রান্তের শিকার হয়। তারা পুলিশের গুলিতে মারা যায়। আসলে এই শ্রেণির চরিত্রেরা কখনো মরে না। তাদের কখনো মৃত্যু নেই। তারা কারও না কারও সন্তান হয়ে জন্মায়। এই গল্পে বড় দারোগার বউ সহচরীর গর্ভের সন্তান হয়ে জন্মেছে তিমির ও যোগেনরা। আইনের রক্ষক হয়ে পুলিশ অফিসার অভয় অসামাজিক ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত। রাজনৈতিক মদতপুষ্ট হয়ে অভয় একের পর এক ব্যক্তিকে হত্যা করে পৈশাচিক আনন্দে বউ সহচরীর সাথে সঙ্গমে লিপ্ত হয়েছে। তার ধারণা পুলিশের বউ অসৎ চরিত্রের হয়। ফলে সহচরীর গর্ভধারণ সন্দেহজনক। সমাজ শাসনে ও পুলিশের দায়িত্ব পালনে তার সুস্থ স্বাভাবিক মানসিকতা বিকৃত রুচিতে পরিণত হয়েছে। সে একের পর এক হত্যা করে সঙ্গমে লিপ্ত হত যা বধূ অত্যাচার ও ধর্ষণের নামান্তর। অথচ সহচরীর কোনো প্রতিবাদের উপায় ছিল না। এই সন্দেহের ভালোবাসাতেই গর্ভের সন্তানেরা জন্ম নিয়েছে প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে। এরাই হয়েছে শুভঙ্কর, যোগেন।

আসলে রাষ্ট্র শাসনের জটিল নিয়মের মধ্যে থেকেও প্রতিবাদী চরিত্রেরা কোনো দিনও মরেনি; তাদের কখনো মৃত্যু হয় না। সহচরীর মতো উর্বর ও নিষ্পাপ মায়েরা এই জটিল সমাজ ব্যবস্থায় সন্তানের জন্ম দিতে বাধ্য হয়। অফিসার অভয় পাত্রের কালো মন ও কালো হাত জানে না যে সহচরীর আটটি সন্তান হয়েছে। অথচ সহচরী স্বামী সোহাগিনী বধূ। তার মনে ও দেহে কোনো পাপ ও কলঙ্ক নেই। অভয় পাত্রের প্রতিটি সন্তান আসলে নিজ হাতে প্রতিবাদীদের হত্যা তথা পাপের কর্মফল। তাই হয়তো আটটি সন্তানের পিতার গর্ববোধ না হয়ে সন্দেহে চোখ বিস্ফারিত হয়েছে। গল্পের এই সংশয় ও জিজ্ঞাসা সমাজের প্রতি লেখকের জীবন জিজ্ঞাসা, যা অমর মিত্রের শিল্প চেতনার নতুন রূপ। এই আটটি শিশুর মুখের দিকে তাকায় অভয় পাত্র। লেখকের উক্তি— 'চেনা মনে হয় কি ?' এরা সবাই বিপ্লবের সন্তান। গল্পকার গভীর ব্যঞ্জনায় ভিন্ন মাত্রায় গল্পের ভাবনাকে পৌঁছে দিয়েছেন—

> "অনেক বেশি মানুষ মা জননীর কোলে শুয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমায়, বেড়ে ওঠে, উঠতে থাকে। কতজনকে নিশ্চিহ্ন করবে সে ?" [৯৪]

প্রতিবাদ তথা বিপ্লবের যে প্রকৃতই মৃত্যু নেই— গল্পকার তা স্পষ্টত বুঝিয়ে দিয়েছেন।

'একা' গল্পটিও রাজনৈতিক ভাবনাসমৃদ্ধ। গল্পে খ্যাতিমান লেখক অভিলাষ অ্যাওয়ার্ড পেয়ে সরকারের কাছে সম্মানিত হয়েছে। তাই সে সরকারের কাছে ও কাজে নানাভাবে দায়বদ্ধ। পুলিশের নির্বিচারে

গুলি চালনায় চৌদ্দজন মানুষের মৃত্যুতে অভিলাষ নির্বিকার থেকেছে। সমাজ ও শুভানুধ্যায়ীরা তার এই নির্বিকার হত্যা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি। কেননা সে সমাজ ও সরকারের কাছ থেকে সুযোগ ও সম্মান পেয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এখন সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিকার করার কোনো ইচ্ছাই তার মধ্যে দেখা গেল না। সে যেন বেঁচে আছে অন্যের কৃপায়। দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আজ সে বিচলিত। লেখকের কথায়—

> "পৃথিবীতে নিঃসার্থ সমর্থন বিরল। অভিলাষ কি ভেবেছিল অন্য কথা ? সে কি জানে না মানুষ যা যা ভরে নেয় ঝুলিতে, তার বিনিময়ে তাকে দিতে হয় সমপরিমাণ কিছু।" [৯৫]

কিন্তু রাষ্ট্র শাসনে অভিলাষরূপী লেখকদের দিন কেটেছে চরম অস্থিরতায়, টেলিফোনের শব্দের চমকে। পুলিশ হার্মাদদের গণহত্যায় গ্রামীণ মানুষদের প্রকৃত অসহায়তা ও রিক্ততা দেখে এসেছে বন্ধু দুখীরাম। এই সব অসহায় মানুষদের প্রকৃত স্বরূপের চিত্র কি ফুটিয়ে তুলতে পারবে লেখক অভিলাষ তার সৃজন কৌশলের মাধ্যমে ? এর উত্তরে অভিলাষ বলেছে—

> "আমি নিজেই যে ওদের সঙ্গে বসে আছি অন্ধকারে হার্মাদের ভয়ে, কী ক'রে লিখব দুখীরাম, আমি নিজেই বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে যাচ্ছি। ...কিন্তু নিজেই জানি না কী ভাবে ওই সব লাশের ভিতরে আমিও ঢুকে পড়েছি দুখীরাম।" [৯৬]

কেবল লাশ দিয়ে লাশ ঢাকার গল্প নয়, লেখক বাঁচতে চেয়েছেন একজন অতি সাধারণ মানুষ হয়ে মানুষের সহমর্মিতায় মানুষের পাশে। তার যে দায়বদ্ধতা নেই তা নয়, কেবল লেখার ভাষা নয় মনের ভাষায় সে কথার পরিচয় দেয়। কারণ তাঁর দায়বদ্ধতা ও সমবেদনা চৌদ্দটি লাশের জন্য। এমনকি 'যারা মরবে এরপর' তাদের জন্যও। এভাবেই অমর মিত্রের গল্পের চরিত্রেরা জটিল সামাজিকতার বন্ধনেও জীবন অতিবাহিত করে।

একটু ভিন্ন আঙ্গিকের গল্প 'আত্মজীবনীর না লেখা পাতা'। গল্পে মনস্তত্ত্বের প্রবাহ যেমন আছে তেমনি ব্যঞ্জনার গভীরতায় পাঠক চিত্তে আলোড়ন সৃষ্টি করে। তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে নিতাই কবিয়ালের যথেষ্ট আক্ষেপ ছিল জীবনের নানা অপ্রাপ্তির জন্য, বিশেষ করে জীবৎকাল অল্প হওয়ার জন্য। আর আমাদের আলোচ্য গল্পে অপূর্ব ব্যর্থ জীবনের দিকে তাকিয়ে হতাশায় অস্থির হয়েছে। গল্পের শুরুতেই রয়েছে চমক—

> ''বাড়ি ফিরে অপূর্ব শোনে তার জন্য একজন অনেক সময় বসে থেকে না পেরে চলে গেছে।'' [৯৭]

এই 'একজন'-এর অনুসন্ধানেই লেখকের ভাবনা বহুমাত্রিক হয়েছে। অপূর্বর জীবনে না এর বিপরীতে ইতিবাচক কিচ্ছু ঘটেনি। সে তার ব্যর্থ জীবনের সাথে মিল পেয়েছে 'জনৈক বঙ্গবাসীর আত্মকথা' নামক গ্রন্থের কাহিনির সাথে। এছাড়া অবিনাশ হালদারের হারিয়ে যাওয়া কিংবা অনিল পালের বয়স ফুরিয়ে যাওয়া জীবনকে জেনেছে— 'চায়ের দোকানে বসে বসে লোকটা কী রকম বুড়ো হয়ে গেল।' এ তো শুধু

একটা জীবনের টুকরো খবর। এই রকম ফুরিয়ে যাওয়া জীবনের ছবি এঁকেছেন অমর মিত্র। তাঁর ফ্রেমে ধরা রয়েছে অমল পালের জীবন—

> "যৌবনে সুন্দর ছিল, সুপুরুষ ছিল সিনেমায় নামবে বলে ট্রেনে উঠে আরব সাগরের তীরেও চলে গিয়েছিল, শেষে টালিগঞ্জের কোন ছবিতে দু-পাঁচ সেকেন্ড, তারপর তো এসে গেল বার্ধক্য।" [৯৮]

দু-পাঁচ সেকেন্ডের জন্যই মানুষের বেঁচে থাকা স্বপ্নপূরণ হওয়া। অমর মিত্র এভাবেই বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন।

এই গল্পের কাহিনীতে দেখা যায়— অপূর্বর পত্নী মালবিকা আগন্তুকের নাম ও তার ফোন নম্বর ভুলে গেছে। গল্পকার বলেছেন— 'মালবিকা কীরকম অদ্ভুত চোখে অপূর্বকে দেখতে লাগল, ইস ভুলে গেলাম, খুব কমন নাম।' মালবিকার এই দৃষ্টি অপূর্ব আগে কোনোদিন দেখেনি— এ যেন বিষণ্ণতা ও অনুসন্ধানের খেলা। সংসার জীবন থাকলেও মেয়েদের অনুভূতির প্রদেশে অপূর্ব কোনোদিন প্রবেশ করেনি, বলা ভালো পৌঁছাতে পারেনি। তাই অপূর্বর মনে হয়েছে— 'মানুষ তার ইচ্ছে মতো কিছুই করতে পারে না, যত বয়স হয়, নতুন নতুন শৃঙ্খলে আটকে যায়। কত ভয় না ঢুকে যায় ভিতরে।' হয়তো পূর্ণ অপূর্বকে কোনোদিন মালবিকা পায়নি তার মনের মতো করে কিংবা পিয়া (মেয়ে)। কিন্তু পিয়া বলেছে 'আমার বাবা সবার আগে থাকে, আমার বাবা সবার চেয়ে ভালো।' কিন্তু অপূর্ব জানে সেই আগন্তুক তার আগেই চলে, তার আগে থাকে। গল্পকার গল্পের শেষে পাঠককে নতুন আলোয় উদ্ভাষিত করেছেন। অপূর্বের দীর্ঘ জীবন অতিবাহিতের পর জীবনের না লেখা পাতাগুলো অতি সহজেই পূরণ হয়ে গেছে নিজের অজান্তেই। গল্পের নামকরণ কাহিনী বয়ানের সাথে যথেষ্ট মানানসই হয়েছে। গল্পকার শেষ পরিচ্ছেদে বলেছেন—

> "হাঁটতে হাঁটতে অপূর্বর মনে হল, এত বছর বাদে কে আগে আর কে পরে তার হিসেব করবে কে ? বরং এই যে সে আছে, নিজের মতো আছে...এর চেয়ে ভালো জীবন কী আর হতে পারত তার ? এ যেন নক্‌শি কাঁথায় আঁকা আর এক জীবন, যা সেই আত্মজীবনীর পাতায় কোনও দিন লেখা হবে না।" [৯৯]

'নবজাতক' গল্পটি সামাজিক অবক্ষয় থেকে মুক্তির আলো দেখায়। সমাজের অতিলোভী ঠক জোচ্চোরদের গল্পকার চিনিয়ে দেন। গল্পটির সূচনা ক্রিয়াপদহীন বাক্যে। কাহিনীতে পিতা গোপেন নবজাতকের আগমনে আনন্দিত হয়। কিন্তু সে আনন্দ সবার হয় না। আর তাই তাকে বিভিন্ন দোকানি ঠকায়, প্রতারণা করে। নবজাতকের জন্য গোপেন প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে গেলে দোকানদার বলেছে— 'বাচ্চার জন্য দর হয় না'। অভাবী পিতার কথা দোকানদার ভাবেনি— গোপেনের এমন ভাবনা যে ঠিক নয় তা গল্পকার সুন্দরভাবে বুঝিয়েছেন অন্য দোকানদার নিরাপদ দাসের সন্তান সম্পর্কে ধারণার পরিচয় তুলে ধরে। নিরাপদ দাস নবজাতকের আনন্দে গোপেনকে ভেসে যেতে বলেনি। তার সন্তান যে সঠিক মানুষ হয়ে ওঠেনি তা বলতে দ্বিধা করেনি সে 'শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেছে সে' উপযুক্ত মানুষ হয়নি নিরাপদ দাসের সন্তান।

নিরাপদ দাস এমন সন্তানের কথা ভাবে যে সন্তান মনের ও সমাজের সমস্ত মলিনতা দূর করবে। কেননা সমুদ্র-বাতাস সব বিষাক্ত জীবাণুতে ভরা, সমাজে চোর বদমাসদের অভাব নেই। তাই সে দিন গুনছিল নবজাতকের অর্থাৎ মহাপুরুষের আবির্ভাবের। কিন্তু গল্পে এ নবজাতক কন্যা সন্তান। তাই লিঙ্গ পার্থক্যের জন্য মহাপুরুষ হবে কি ভাবে। তা সত্ত্বেও গোপেনকে অভিনন্দন জানায় নিরাপদ দাস। কারণ এই সন্তানই পৃথিবীর অন্ধকার ও মলিনতা দূর করে আলোকোজ্জ্বল করবে। নিরাপদ দাসদের মতো আশাবাদী মানুষদের মতো গল্পকার অমর মিত্রের বেঁচে থাকা। এই জাতীয় গল্প ঘটনা ও চরিত্রকে অতিক্রম করে চিরন্তন সত্যের আশায় পথ দেখায়। সমাজ পরিবেশের পরিমন্ডলে লেখক নিজেই কথা বলে ওঠেন—

> "রাস্তার দুপাশে ময়লার ডাঁই। দুর্গন্ধে ভরে আছে চারিদিক। ময়লার স্তূপে শিশু নারী কুকুর একসঙ্গে কী খোঁজাখুঁজি করছে। এরই ভিতরে জন্মেছে গোপেনের সন্তান।" [১০০]

বিষাক্ত সমাজজীবন থেকে নিরাপদ দাস ও গোপেনরা সুস্থ সমাজ জীবনে বেঁচে থাকতে চায় নবজাতকের আবির্ভাবে। লেখকের জীবন দর্শন গভীর ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়।

বিচিত্র বিষয় ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে অমর মিত্র সমাজ জীবনের নানা ঘটনাকে ছোটগল্পের আধারে তুলে ধরেছেন।

মানব চক্রবর্তী

মানব চক্রবর্তী আশির দশকের মাঝামাঝি থেকেই গল্প উপন্যাস লেখায় ব্রতী হন। বিশ শতকের সত্তরের দশকের ভয়াল রাজনীতির স্বরূপ ফুটে উঠেছে তাঁর 'কুশ' উপন্যাসে। সমাজের বাস্তব সত্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার প্রয়াস তাঁর ছোটগল্পের তথা সাহিত্য সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। আদিবাসীদের নানান সমস্যা, না খেতে পাওয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবনকথার প্রকৃত বন্ধু হয়ে উপলব্ধি ও অনুভবের শক্তি দিয়ে সাহিত্যে প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। মানব চক্রবর্তী রেলশহর চিত্তরঞ্জনে বড় হয়েছেন। ফুটবল, বিদ্যাশিক্ষা ও রাজনীতি. সমাজ অভিজ্ঞতার প্রতিটি ধাপ পেরিয়েছেন। বার্ণপুর ইস্পাত কারখানায় কর্মসূত্রে থাকলেও কবিতা চর্চা ও পরে গদ্যের স্বতস্ফূর্ত নির্মাণে গল্পকথায় বিষয়ভাবনার পরিচয়দানে সাহিত্য কর্মে নিমগ্ন থেকেছেন। অকৃত্রিম জীবনবোধে, অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতার পরিধিতে এবং নিজস্ব গদ্য শৈলীতে ছোটগল্পের রচনা কৌশলে মানব চক্রব্রর্তী নিবেদিত প্রাণ। বিষয় ও পঠভূমির পরিবর্তন থাকলেও গল্পের অন্তর্ভুবনে জীবনের রূঢ়, নিষ্ঠুর বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। মানুষের লোভ-লালসা, প্রতারণা-শঠতা-নিষ্ঠুরতা, বঞ্চনা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী বিন্যাসে তাঁর গল্পগুলি স্বমহিমায় প্রাণবন্ত।

তাঁর প্রথম গল্প 'বাড়ি বিষয়ক গদ্যে মানুষ ও বৃক্ষ'-তে অস্তিত্বের সংকটে সন্দেহ ও দুর্বিষহ বাস্তবতার ছবি এঁকেছেন। উত্তর আধুনিকতার যুগে জটিল বিষয় ভাবনার সাথে পাঠক অভ্যস্ত না হয়ে মানব চক্রবর্তীর ছোটগল্পের ভুবনে পাঠক খুঁজে পেয়েছে মনের রসদ। তাঁর গল্পের ভৌগোলিক সীমানায় ধরা রয়েছে ছাগল বামনি নদী, বজবিড্ডি গ্রাম, চিনাকুড়ি কোলিয়ারী, মেনধেমো, মিঠানির কয়লা খনি ও ইস্পাত কারখানার পরিবেশ, আখেরিগঞ্জ থানা, স্বরূপ নগর, খয়রাডাঙা, বরমুণ্ডিয়া মৌজার ঘিয়াডোবা গ্রাম। গল্পের এই জগৎ আমাদের অতি চেনা। তাঁর গল্পের আবহে মানব রহস্যের পরিচয় যেমন আছে তেমনি রয়েছে শৈল্পিকগুণ সম্পন্ন সাহিত্য সৃষ্টির কৌশল।

'বাড়ি বিষয়ক গদ্যে মানুষ ও বৃক্ষ' নামক গল্পে হৃদয়নাথ স্বপ্ন দেখে। রূপনারায়ণপুর সীমান্তপল্লীর তিন কাঠা জমিতে তাঁর বাড়ি হবে। সেখানে অসংখ্য উঁচু উঁচু বাড়ির ভিড়ে তার অতি সাধারণ দু-কামরার বাড়ি। বাড়ি নির্মাণের নানান ঝক্কি সামলাতে সামলাতে শরীর-মন-অর্থের জোর ফুরিয়ে যায়। হৃদয়নাথ ভাবে এসবের মধ্যেই বেঁচে থেকে আরাম আছে। রাজমিস্ত্রিদের সাথে কাজের তদারকি করে। আর মিস্ত্রিরা চলে গেলে সে একা গাছেদের সাথে কথা বলে। জায়গাটা কিনে সে সবেদা ও তেজপাতা গাছের চারা লাগিয়েছিল। আজ তারাই হয়ে গেছে হৃদয়নাথের সঙ্গী—

> "এক একদিন ভর সন্ধ্যায় মিস্ত্রিরা চলে গেলে তিনি একা একা বসে থাকেন। তেজা সিং আর সবেদালির গাঢ় অন্ধকারে প্রত্যেকে যেন এ ওর শ্বাস-প্রশ্বাস স্পষ্ট শুনতে পায়।" [১০১]

গাছের সাথে এই সখ্যতা, বাড়ি নির্মাণের যন্ত্রণা ভুলিয়ে স্বস্তি দেয় হৃদয়নাথকে। কারণ সে বলে— 'ত'রাই আমার পোলাপান। মাইনষ্যের বাচ্চা সব ভুইল্যা যায়, গাছ ভুলে না।' আর ভুলে না হৃদয়নাথের বউ অন্নপূর্ণা। সিমেন্টের ধোয়া বস্তায় বসে অর্ধনির্মিত বাড়ির ছায়ায় দুজনে গল্প করে সংসার-ভালোবাসার। মায়া-মমতাময় এই সংসারে প্রিয়জন বলতে কেবল বউ অন্নপূর্ণা, ছেলে চন্দন, নাতি, অভিষেক ও বউমা। দেখতে দেখতে যথেষ্ট বয়স হয়েছে হৃদয়নাথের। জীবনের কর্তব্যকর্ম সমস্ত পালন করেছে। নিজে কোনো দিন ভালো না খেয়ে না পরে সমস্ত উজাড় করা ভালোবাসা দিয়ে একমাত্র ছেলে চন্দনকে মানুষ করেছে। ছেলের কাছে শেষ বয়সে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকার বিশ্বস্ত জায়গাটা পরখ করে দেখেছে। ছেলের বউ অন্নপূর্ণাকে বলেছে জায়গা কিনেছ বাড়ি করে নতুন জায়গায় চলে যাও। পাঁচজনের পরিবার বউমার কাছে এখন কষ্টের, নানা সমস্যার। অভিমানে, আত্ম যন্ত্রণায় হৃদয়নাথ অন্নপূর্ণাকে আশ্বস্ত করে, বাড়ি করে আলাদা থাকবে বলে। তাই নতুন বাড়ি শেষ করেই শেষ ইচ্ছাটা পূর্ণ করতে চায় সে। আসলে সন্তানের প্রতি বাৎসল্যপ্রেমের নিবিড় সম্পর্ক বউমার মতো মেয়েরা ঠিক বুঝতে পারেনি বলে হৃদয়নাথের সাথে তাঁর বউ অন্নপূর্ণা নীরবে চোখের জল ফেলেছে। রেল কোম্পানির নিয়মে রিটায়ারমেন্টের পর রেলের কোয়ার্টার ছেলে চন্দনের নামে হয়ে যায়। আর তখন থেকে হৃদয়নাথের হৃদয়শূন্য অবস্থা দেখা যায়। যে ছেলের জন্য দশ টাকায় দেড়শো গ্রাম মাংস কেনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়িয়েছিল একদিন, আজ প্রৌঢ় বয়সে এসে সেই সব দিনের কথা ঘর নির্মাণের জন্য কাঁঠাল কাঠের হলুদ পাপড়ির মতো সব খুলে যাচ্ছে স্মৃতির সরণি বেয়ে। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের টানাপোড়েনে হৃদয়নাথ ভালোবাসার মধ্য দিয়ে শেষ জীবনে শান্তি পেতে চেয়েছে। সে নিজেকেই প্রশ্ন করেছে— 'বাড়ি করলাম ক্যান ? শুধু বুড়াবুড়ি থাকুম বইল্যা ?' লোভ লালসার জন্য সে বাড়ি বানায়নি, ভোগের জন্যও নয়। তবে জায়গাটায় বেড়ে ওঠা তেজপাতা ও সবেদা গাছের দোলনায় নাতির দোল খাওয়া দৃশ্যই তার চিরকালীন সুখ শান্তির বার্তা এনে দিবে বলে তার ভাবনা ছিল। হৃদয়নাথ মনশ্চক্ষে দেখেছে—

> "দোলনায় দড়িতে বসে অভি। তিনি ঠেলছেন। আর অভি কে-জি ক্লাসে শেখা ছড়া;
> তার দাদুভাইকে শোনাচ্ছে।" [১০২]

দু'দণ্ডের শান্তির নীড় রচনার উদ্দেশ্যে হৃদয়নাথ যেভাবে সংসাসের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল তাতে তাকে একজন দায়িত্ববান পিতা বলতে হয়। কিন্তু সময় ও সমাজ পরিবর্তনের সাথে পাঁচ বছরের ছোট্ট নাতি অভির মুখে 'আমাদের তোমাদের' এই বাক্যে হৃদয়নাথ আহত হয়েছিল। যে ভালোবাসা দিয়ে ছেলেকে বড়ো করে মানুষ করেছে সেই প্রতিদান দেখতে পায়নি অভির মধ্যে। তাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ বুঝে উঠতে হৃদয়নাথের হৃদয় যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়। মৃত্যুর মুহূর্তে ছেলের সাহচর্যের বিকৃত রুচি দেখে গাছের প্রতি ভালোবাসায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে চেয়েছে। গাছের মধ্যে মানুষের চারিত্রিক গুণের সমাবেশ ঘটিয়ে গাছটিকে প্রাণবন্ত করেছেন মানব চক্রবর্তী। গাছকে উদ্দেশ্য করে হৃদয়নাথ শেষ ইচ্ছা প্রকাশ করেছে—

> "আমারে একবার বাপ কইয়্যা ডাক . . . শুনি . . . মন দিয়া শুনি . . . দাদু কইয়্যা ডাক . . .
> মন দিয়া শুনি . . . কতদিন আমি মাইনষ্যের মুখে এই ডাক শুনি নাই।" [১০৩]

মানুষ বেইমানী করতে পারলেও গাছ যে বেইমানী করে না মানুষকে ভালোবাসা দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে এই ব্যঞ্জনায় গল্পের ভাবনা মোড়া রয়েছে। তাই নাতির দুটো ঘর হলেও ঠাকুমা একটাই ঘরের কথা বলেছে। যেখানে সবেদা ও তেজপাতা গাছেরা বেঁচে আছে হৃদয়নাথের প্রতীক হয়ে জীবন্ত প্রতিমূর্তির ন্যায়। তাই অন্নপূর্ণা জল দিয়ে গাছের প্রাণ বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছে। যে প্রাণ বিসর্জন ঘটতে অর্থাৎ হৃদয়নাথ স্বর্গত হতে সন্তানের দুঃখ অনুভব হয় না, প্রিয়জনের চিরবিচ্ছেদে হৃদয় মন কেঁদে ওঠে না। গল্পকার চিরন্তন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন বাড়ি-মানুষ ও বৃক্ষের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। একুশ দিন নিয়ম পালনের পর গাছেদের সাহচর্যেই হৃদয়নাথের বউ থাকতে চেয়েছে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে মানুষের বেঁচে থাকার স্বচ্ছতার ছবি এঁকেছেন গল্পকার।

'পিত্তি' গল্পে বদরাগি যুগলকিশোর সামান্য টাকার বেতনের চাকরি জীবনে আনন্দ ভালোবাসা খুঁজে নিতে চেয়েছে। অভাবী মানুষদের সাথে যুগল কিশোর দারিদ্র্যের ভয়ানক পরিস্থিতি যেমন দেখেছে তেমনি সামাজিক অবক্ষয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তার জীবন এগিয়ে চলেছে। তার ভালো মনটিও শক্ত খোলের আবরণে ঢেকে ছিল। তার মুখখানা একটু কষা হলেও— 'সোজাসাপটা বেঁচেবর্তে থাকার মধ্যে যুগলকিশোর সরকারের কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই।' এই অতিসাধারণ জীবন যাপনের মধ্যেই লেখক নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। মাঝ দুপুরে পঞ্চুর মা আঁচলের তলায় বাটি লুকিয়ে চাল ধার চাইতে এলে যুগলকিশোর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বলে—

> "ধার-ই যদি নিবেন বৌদি, একবাটি ক্যান্? এট্টু বেশি কইরা লন। কত্তার মায়না হইলে দিয়েন। আমরা তো কচুঘেচু খাই, ঘাসপাতার বাটাবুটি হান্দাই, ছাগল। হেই লাইগ্যা মনটা অখনো সবুজ আছে, বোঝলেন..." [১০৪]

বউ বিলাসীর সাথে যুগকিশোরের উদারতার মিল দেখা যায়। তাদের বিশ্লেষণী মনে পঞ্চুর-মা বিলাসিতার জীবনযাপনে অভ্যস্ত বলে অভাব তাদের নিত্যসঙ্গী। পঞ্চুর বাবা বেশি মাইনে পেলেও বড় সংসারে কুলোয় না। তাছাড়া শাড়ি, গয়না, থিয়েটার বায়স্কোপ দেখে টাকা পয়সা অযথা খরচ করে দেয়। কিন্তু এই সব বাজে খরচ করতে চায় না যুগলকিশোর। তাই একপ্রকার ঝোঁকে পড়েই পঞ্চুর মাকে বেশি চাল দিয়েছিল যুগল কিশোর। অধিকাংশ দিন বিলাস চাল দিত। আজ যুগল চাল দেওয়ায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তর্ক শুরু হয়। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বিলাসকে উদ্দেশ্য করে যুগল শান্তিতে বাঁচতে চায়—

> 'মাইনষ্যের মন বড় নরম। উপরেই যত কাউট্যার ঢাকন। কও তো বিলাস, বাচুম কি লইয়্যা? মনটাই যদি কালা হইয়া যায়, তবে হালায় মানুষ হইলাম ক্যান্?' [১০৫]

পঞ্চুর বাবা কলিঙ্গ তোপদার খেজুর আলাপ করতে এলে যুগল কিশোর তাকে বলতে ছাড়ে না। ধার দেনায় পাগল হওয়ার থেকে ঘাসপাতা খেয়ে বেঁচে থাকা অনেক ভালো তার কাছে। সে বিড়ি খায় না, তেমন নেশা করে না, ডি-এ বাড়ার সাথে মাইনের হিসেব কষে না। আঠারো বছর ওয়াটার-ওয়ার্কসের ভালভ-ম্যান যুগলকিশোর বহু আগেই ফিটারের পদে প্রমোশন নেয়নি। অদ্ভুত মানুষ সে। কোনো অ্যামবিশান নেই যুগল কিশোরের। তাকে একথা অফিসের দত্ত বাবু বলেছিলেন। তাতে তার কোন

যায় আসে না। দুটা পয়সা বেশি পেয়ে বাংলো গাড়ি নিয়ে অতি আরামের জীবন যাপন তার পছন্দ না। অভাবের সংসারে দুটা বেশি পয়সার কথা বলেছিল বিলাস। প্রমোশন হলে দুই ছেলে মেয়েকে ভালো করে খাওয়াতে পারবে না। কিন্তু চোখ লাল করে যুগলকিশোর বিলাসকে বলে—

> "কি কইল্যা ? অভাবের লাইগ্যা তোমাকে কি আমি ল্যাংটা কইরা রাখছি ? নাকি রাইতে কোন দিন ভিজা চিড়া খাওয়ায় রাখছি ? তোমরা মাইয়্যা মানুষ, তোমাগ মাথামোটা, খালি নিজের নিজের চিন্তা লইয়া আছ।" [১০৬]

বিলাস জানে তার স্বামী জেল খোলার পুণ্যি অর্জনের আনন্দে লাখ টাকার থেকে বেশি রোজগার হয় ভেবে বিভোর থাকে। পরোপকার ও ভালোবাসার মাঝেই যুগলকিশোরের বেঁচে থাকা।

এই যুগলকিশোর দিনেরবেলায় পান থেকে চুন খসলে বা মাছের ঝোল কম হলে চিৎকার করে। কাজে ভুল হলে বিলাসকে মাঝে মধ্যে চড়মারে। আর রাতের বেলায় বিলাসকে আদরে সোহাগে ভরিয়ে দেয়। বিলাসও অবাক হয়। যে লোকটা দিনের বেলায় শক্ত হাতে বড় বড় ভালব ঘোরানোর কাজ করে সেই লোকটার মনে প্রেমের গোপন অভিসন্ধি যে থাকতে পারে তা বিলাসকে অবাক করত। বিলাসের মোমের মত পিঠে মোলায়েম চিকড়িমিকড়ি কাটত, গাঢ় গলায় ফিস্ ফিস্ করত— 'কথার চেয়ে দামি, মেঘের চেয়ে হালকা, ময়ূর পালকের মত মন কেমনিয়া সুখের পেখম জাগিয়ে তোলে শরীরে, ভগবান জানে!' এই মানুষটার স্বভাবের প্রকৃত পরিচয় সত্যিই বিস্ময়ের বিষয়। তাই বিলাসের কাছে সে 'জলদ্যাব্‌তা' আবার কখনো 'চণ্ডাল'। বিলাসকে চড় মারার জন্য শরীর খারাপ হয় তার। ডাক্তার গালের নীচে দাগ দেখে রক্ত পরীক্ষা করতে বলেন, এবং বিলাসকে সাবধানে রাখার পরামর্শ দেন। ডাক্তারের সুপরামর্শ যুগলকিশোরের ভালো লাগেনি। মেয়ে মানুষের গায়ের রং ও দাগ সম্পর্কে তারও ধারণা যথেষ্ট রয়েছে বলে বিসালকে জানায়—

> "—ছাড়ান দাও ডাক্তারের কথা। বিয়ার পর থিক্যা মাইয়্যামাইনষ্যের শরীলে দাগের শুরু, বাচ্চা বিয়ান থিক্যা চিতায় ওঠনের আগু তক্ . . ." [১০৭]

ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও বিলাসের গালে আবার চড় কষিয়েছে যুগল। মাছ কাটার সময় মাছের পেটে পিত্তিটা গলে যাওয়ার জন্য তার রাগ গিয়ে পড়েছিল বিলাসের গালে। বিলাসের শরীর খারাপ হতে যুগল এবার সত্যিই ভয় পায়। তার কাঁদতে ইচ্ছে করে। দারুণ এক ভয় জাঁকিয়ে বসে মনে। বিলাসও সোহাগমাখা কণ্ঠে বলে— 'অত যখন ভয়, হাত তোল ক্যান্ ?' কিন্তু জীবন সম্পর্কে ভালোবাসার সম্পর্কে একটি বিতৃষ্ণা দেখা দেয় যুগলকিশোরের। তাই তো সে হাত তোলে বিলাসের গালে। এই অতৃপ্তি ও রাগের কারণ সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা নেই। সে সরল সাধারণ মানুষ হলেও ভালোবাসার গোপন সত্যটিকে পরিচর্যা করতে চেয়েছে। ফলে, মাছের পিত্তির তেতো ভাবটা জলে ধুয়ে পরিষ্কার করেছে। কান্না-হাসির জীবনে রোদ-বৃষ্টির মধ্য দিয়ে ভালোবাসা উঁকি মেরেছে যুগলকিশোরের দাম্পত্যে। সে অনুভব করেছে মেয়েমানুষের ভালোবাসার অনুতাপ। কিন্তু অজানা থেকেছে বিলাসের মনের পরিচয়টি। যা অসহ্য তেতোয় তাকে অস্থির করেছিল স্বাভাবিক জীবন যাপনের বিপরীত অবস্থানে পরিবারের মধ্যে

শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার জন্য ভালোবাসার বন্ধন থেকে বিলাসের মতো অতি সাধারণ নারীকে হারানোর আশঙ্কায়। গল্পকার প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে সমাধানের সূত্র এনে গল্পের নামকরণকে গভীর ব্যঞ্জনায় বেঁধে রেখেছেন—

> '—মাছের পিত্তি গইল্যা গেলে, জলে ধুইলে কাইট্যা যায়। কিন্তু মাইনষ্যের মনের পিত্তি . . . ?' [১০৮]

এই জিজ্ঞাসার অন্তরালেই গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

'কর্নেলের গোলাপচারা' নামক গল্পে আত্মকথনের জবানিতে কর্নেল সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। সামরিক বাহিনীতে যোগদানের যোদ্ধা কর্নেলের সামাজিক, পারিবারিক সম্পর্কের বন্ধনে সেই কর্নেল রায় কাকু সম্পর্কের মধ্যে অদ্ভুত মানবিক বন্ধনে ভালোবাসার চিরন্তন সত্যে মনের মানুষ রূপে ধরা পড়েছে। গল্পকার যেন কর্নেল রায়ের দ্বৈত রূপ প্রত্যক্ষ করে মানবিক কর্নেলকেই ভালোবাসার আসনে বসিয়েছেন। লেখক স্বয়ং কথক হয়েছেন। অর্থাৎ প্রথম পুরুষের জবানিতে কর্নেল রায় নামে ব্যক্তির মধ্যে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করেছেন।

পাড়ায় নতুন বাড়ি করা কর্নেল রায় সম্পর্কে অনেকের মতো কথকেরও কৌতূহল ছিল। কেননা যোদ্ধার স্থান পাড়ার লোকেদের এলাকায় ছিল না। তাছাড়া, কর্নেল-এর মতো বড় পদের দায়িত্ব সামলানো ব্যক্তির জীবন কথা নিয়ে সকলের কৌতূহল থাকাটাই স্বাভাবিক। আর পাঁচটা ছেলের ছোটবেলার মতো কর্নেল সম্বন্ধে কৌতূহল লেখকেরও ছিল—

> ''কর্নেল মানেই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার। ইয়া তাগড়া চেহারা, মোটা গোঁফ, বুকে অজস্র ব্যজের তাপ্পিমারা ম্যালেশিয়া শার্ট, পাথরের মত নিভাঁজ মুখ, গমগমে গলা, না-হাসি, না-কান্না, না-বাগী না যোগী মুখভঙ্গি।" [১০৯]

এই সব ধারণা নিয়ে পাড়ার সবাই নিশ্চিন্ত হয়েছে এবার চোর ডাকাত পাড়ায় আর আসবে না। কেউ কেউ বলেছে কর্নেল রায় খুব রাগি মানুষ, 'চোর-ছ্যাঁচোড় দেখলে সিধে ফায়ার করে দেবে।'

এই কর্নেল রায়কে দেখে কথক পল্টনের সমস্ত কল্পনা ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। যে মানুষ কচুর লতি ও বকফুল খায় সে সত্যিকারের কর্নেল কিনা সন্দেহ জন্মায়। তাছাড়া সকালে জগিং, ঝিমুনি দৌড় দেখে মন খারাপ হয়। পল্টনের রঙিন ভাবনা হোঁচট খায়। ছিরিছাঁদহীন শরীর, বাজে পোড়া তালগাছের মতো চেহারা তার, পরনে সাদা হাফপ্যাণ্ট ফুলে ওঠা দড়িপাকানো শিরা দেখে ভয় দূর হয় পল্টনের। কেননা যে কর্নেলের মোটা মোচ নেই, শরীরে মোষের মতো তালতাল মাংস নেই— সে কিসের কর্নেল।

পল্টনের কাছে কর্নেল রায় শুধুমাত্র একটা নাম! পল্টন নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে— 'নামে কি যায় আসে ?' অতি সাধারণ আর দশটা নামের মতো দশটা লোকের মতো কর্নেল রায় অতি পরিচিত নাম হলেও অপরিচিত ব্যক্তি। একদিন টেনিসের বল ব্যাটে লেগে কর্নেল রায়ের বাড়ির বাগানে চলে যায়। সেইসময় পল্টন ছুটে গিয়ে দেখে কর্নেল ক্যাচ ধরার আনন্দে চেঁচিয়ে বলে— 'হাউজ দ্যাট্'—এই

অপ্রত্যাশিত খুশি দেখে পল্টন তার ভক্তে পরিণত হয়। শ্রদ্ধা জাগে। বল পড়ার অপরাধে শাস্তির অপেক্ষায় থাকে পল্টন। প্রকৃত কর্নেলের ভয়ংকর পরিস্থিতির শিকার সে। কিন্তু না, কর্নেল রায় বলেন— '—এভাবে তুলে মারে ? গ্রাউন্ড শট নিতে হয়।' বাগানে গোলাপের পরিচর্যায় সময় কাটে কর্নেল রায়ের। গাছের সাথে মানুষের যে নিবিড় সম্পর্ক সে কথা পল্টনকে শোনায়—

> "পড়াশুনা করলে যেমন মানুষের মনে ফুল ফোটে মনুষ্যত্বের, তেমনি গাছের বুকেও ভালোবাসার রঙ ফোটে। মনুষ্যত্ব আর গাছের ভালবাসার রঙে কোনই তফাত নেই।" [১১০]

আর এইভাবেই পল্টন তার বাবার সাথে কর্নেল কাকুর তফাত খুঁজে পায়। হাজারো ঝক্কি সামলে, অর্ধেক জীবন রাইফেল-মটার-ট্যাঙ্কারের সাথে কাটিয়ে কর্নেল রায়ের অবসরের জীবন যাপনেও রয়েছে দরদ ও ভালোবাসা। তিনি গোলাপ চারাগুলোর মধ্যে, নতুন ফুলের গন্ধের মধ্যে মেলাতে চান আনন্দময় বিগত দিনগুলিকে।

গল্পের 'তিন' নম্বর বয়ানে নাটকীয়তা বেশ চমকপ্রদ হয়েছে। জামাই-ষষ্ঠীর দিন পল্টনের বাবা বাজার থেকে ফিরে চটি জোড়া জুতোর র‍্যাকে রাখতে গিয়ে সাপের ছোবল খায়। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত পরিজনের ব্যবস্থাপনায় তাকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেই সময় কর্নেল কাকু এসে সাপটার লেজ ধরে শূন্যে তুলে সাপটিকে ধোপানীর কাপড়ের মতো মাটিতে আছাড় মারে এবং স্পষ্ট চিনতে পেরে বলে গোখলে সাপ। বাড়ি সুদ্ধ লোক ভয়ে আধমরা। পল্টনের বাড়ির সমস্যার কথা জেনে কর্নেল রায় সব বন্দোবস্ত করে। সবার খাওয়া দাওয়ার খবর নেয় চিন্তা না করে শুয়ে পড়তে বলে। পল্টনকেও সঙ্গে নিয়ে যায় কর্নেল রায়। এই পল্টনের সাথে তেমন পরিচয় নেই কর্নেলের। এমন এক ভয়ংকর মুহূর্তের উপযুক্ত সমাধানের ব্যবস্থা করেন কর্নেল রায়, যা কিন্তু কর্নেলের দায়িত্বের মতোই সেই বন্দোবস্ত। সকলকে অভয় দেয় সে। এমন কি খাওয়ার জন্য বলে—

> "আপনারা অন্তত দুটো মুখে দিয়ে শুয়ে পড়ুন। চিন্তা করবেন না।" [১১১]

সকলের চিন্তাকে অবলীলায় অতি সহজে দূর করে দিয়েছেন কর্নেল রায়। আর বাড়িতে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পদকগ্রহণ যেন তাঁকে প্রতিভাধর বাঙালীর যোগ্য সম্মানে ভূষিত করেছে। আর এই দৃষ্টির পাশে তাকে আপাত ছোট ছেলে বলে মনে হয়। কিন্তু পল্টন সাহস করে জিজ্ঞেস করেনি কর্নেল প্রকৃত জীবন কথা। আর কর্নেলের দুঃখময় জীবন কথা আছে বলেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছে কর্নেল কাকিমা। রান্নাঘরে ঢুকে থালা ভর্তি ফল-মিষ্টি এনে খেতে দেয় পল্টনকে। নিজে হাতে আমের খোসা ছাড়িয়ে দেয় কাকিমা। এমনকি কালোজাম মুখে পুরে দিয়েছে আদর করে। নিজের ছেলে ভেবে যত্ন করেছে। যে মানুষটা রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে পদক পেয়েছে সে যে পল্টনের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে, এ কথা মুহূর্তে যেন ভুলে যায় পল্টন। দেয়ালে অজস্র ছবির মধ্যে একটা ছবির সাথে পল্টন তার স্বপ্নের কর্নেলের মিল খুঁজে পায়। যা তাকে মোহাবিষ্ট করে রাখে। তারপর কর্নেল রায়কে সে জিজ্ঞেস করে প্রকৃত পরিচয়—

> 'কাকু এটা কার ফটো,
>
> —তোমার মতই এক পল্টনের।' [১১২]

চমকভাঙে পল্টনের। কর্নেল রায়ের মতো আর এক পল্টনের অর্থাৎ আর এক কর্নেলের ছবি। যে কিনা অদৃশ্যলোকে চলে গেছে। কর্নেল রায়ের প্রকৃতস্বরূপ জেনে মর্মাহত পল্টন। কর্নেল রায়ের এখন সহায় পরিজন কেবল বাগানের গোলাপ– পারফিউম ডে-লাইট, গ্যালিভার্দা-র মতো ফুলেরা। দুধসাদা রঙের গ্যালিভার্দার নতুন চাষের জন্য অনেকদিন থেকেই কলম বাঁধার চেষ্টা করেন কর্নেল। কিন্তু না সফল হননি। তাঁর ভাগ্যকে দোষ দেন স্বজন বিয়োগের জন্য সন্তান বিয়োগের জন্য। তাই গোলাপের সুবাসে ছোট কর্নেলের মন ভরাতে চান। আর বেঁচে থাকতে চান শিশুসুলভ সারল্যে, ভালোবাসায়। পল্টনের কাছে ভয়ংকর সাহসী যোদ্ধা, দেশসেবক কর্নেল রায় মায়ায় ঘেরা, স্নেহে ভরা পিতার মতো অতি সাধারণ একজন মানুষ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। কর্নেলের হুহু করে কান্নাই বুঝিয়ে দিয়েছে তা। জটিল জীবন যন্ত্রণায় বিদ্ধ কর্নেল রায়ের হাহাকারময় জীবনের অনুসন্ধান পেয়ে পল্টনও আশ্বস্ত হয়েছে নিবিড় অনুষঙ্গ পেয়ে। আর অসহায়তা ও নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে সংগ্রামী মানসিকতায় নতুন সৃষ্টির আনন্দে নতুনভাবে ফুল ফুটিয়ে সুবাস পাবার জন্য। তার তাই আক্ষেপ—

> "হচ্ছে না, কিছুতেই হচ্ছে না। যতবার কলম বাঁধি, মরে যায়। দোষ আমাদের জলবায়ুর। দোষ ভাগ্যের।" [১১৩]

শেষ পর্যন্ত বিধাতার পরিহাসকে মাথা পেতে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে কর্নেল রায়।

'মিছা' গল্পে তিলির মধ্য দিয়ে নারীর মোহিনী রূপ, বিদ্রোহিনী প্রতিবাদী ভাবমূর্তি ধরা পড়েছে। ধুনি মাঝির বউ তিলি। একটি মেলাপ্রাঙ্গণের মধ্যে সত্যমিথ্যার মধ্যে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। মেলায় হাজারো মানুষের ও অজস্র রকমের দোকানের মধ্যে আনন্দ পেতে চেয়েছিল ধুনি ও তিলি। সাত মাসের সন্তান গর্ভে নিয়ে তিলি মেলায় এসেছে। মেয়ে বলেই মাতৃত্বের অনুভূতি পাওয়ার অপেক্ষায় থাকে সে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ধুনির সাথে তিলি মেলায় এসেছে। মেলায় মণ্ডপের মাথায় কাপড়ে রঙ করা একটা কিম্ভূত ছবি। ছোট্ট শিশুর ফটো দেখে তিলি অবাক হয়। তাছাড়া পাতাল-চিতি, মানুষখেকো পাখি, আটপাবিশিষ্ট গরুর বাচ্চা ইত্যাদি তিলিকে ভাবায়। এই গরুর বাচ্চাকে দেখে কেউ প্রণাম করল কেউ বা দু-দশ পয়সা দান করল। এইসব দেখল ধুনি ও তিলি। তারপর এগিয়ে শুনতে পেল দু টাকায় দেখাচ্ছে 'মানুষের পেটে রাক্ষসের বাচ্চা'। এ কথা শুনে আৎকে উঠেছে তিলি। একে সে গর্ভবতী তার উপর রাক্ষসের বাচ্চা মানুষের পেটে হবে কেন— এই সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর নেই বলেই তার বিশ্বাস ছিল। তাই ধুনিকে বলেছে একথা মিছা কথা। এই কথা শোনার পর তার মন খারাপ হয় নিজের সন্তানের কথা ভেবে। মেলায় এগরোল খেয়ে বমি করে সে। একটু আধো অন্ধকারে স্বামীর সোহাগ পেতে চেয়েছে সে। আর হরেকরকম সুগন্ধে ধুনির জিভে জল এসেছে। অভাবের সংসারে খেতে পায়না পোয়াতি মেয়েটা। ধুনির তেমন কাজ নেই, কাজ বলতে—

> "লোকের বাড়ি মাটি কাটে ধুনি। আগাছা ওপড়ায়, বিয়ে বাড়ি, শ্রাদ্ধ বাড়ি জল তোলে, এঁটো শালপাতা ফেলে টেবিল চেয়ার মুছে দেয়, আর একটা কাজ তার বাঁধা। নগেন ঘোষের বাচ্চা ছেলেটাকে কল্যাণগ্রামের দিদিমণির বাড়ি নিয়ে যায়, নিয়ে আসে।" [১১৪]

নগেন ঘোষের ছেলে হলেও ধুনির গর্ব রয়েছে। কারণ সে তার বাহক। ছোট্ট ছেলেটাকে ব্যাগ জলের বোতল সমেত যখন নিয়ে যায় তখন তার বুক গর্বে ভরে যায়। সেও স্বপ্ন দেখে—

> "একদিন তার ছেলেও নগেন ঘোষের ছেলের মত ধবধবে পোশাক পরে হাতে জলের বোতল ঝুলিয়ে ইস্কুলে যাচ্ছে..." [১১৫]

চোখ বন্ধ করে ধুনি এভাবেই তার মায়াময় ভাবনায় হারিয়ে যায়। মানুষের পেটে রাক্ষসের বাচ্চার কথা ভেবে সে জ্ঞান হারায়, নিজের পেটের রক্ষিত সন্তানের সঠিক নড়াচড়া না হওয়ার আশঙ্কা করে। তারপর ধুনি কান পেতে পরীক্ষা করে যে, সন্তানের স্পন্দন সঠিক রয়েছে তিলির পেটে। তিলি তখন আনন্দে উন্মাদিনী হয়। তার স্বভাব সুলভ আচরণে ধুনি ভয় পায়, অবাক হয়। তিলির সুন্দর ও মধুর কথায় ধুনি হেরে যায় এই হারের মধ্যে সে বেঁচে থাকে।

তাদের বেঁচে থাকার ও স্বপ্ন দেখার জন্য আগামী দিনে তাদের সন্তানের ভালোবাসা অপেক্ষা করেছে—

> "যে স্বপ্ন দুজনের চোখে রুক্ষ টাঁড় মাটির বুকে সবুজের ঝালর দুলিয়ে চলেছে, তার জন্য ধুনির কৃতিত্ব কম নয়। সে বাপ হবে।" [১১৬]

যাকে ঘিরে এত স্বপ্ন, ভালোবাসা সেই মেলা প্রাঙ্গণ থেকে বাইরে বেরিয়ে মাইকে ২ টাকায় মানুষের পেটে রাক্ষসের বাচ্চার কথা শুনে ফিরে যায়। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রুজি রোজগার করা প্রদর্শনের মালিকের সাথে বাজি ধরে তিলি। কেন না মালিক মেলায় লোক ঠকিয়ে রোজগার করছে। মালিকও সম্মান ফেরানোর জন্য বাজি ধরেছে। তার পয়সার সাথে তিলির সাধ্যমত সামর্থ বেসামাল হয়। দু'শ টাকার বাজি পাঁচশ টাকার গলার হার এমন কি ঘিয়াডোবার দু'কাঠা জমি পর্যন্ত দিতে রাজি হয়। এদিকে সংগ্রহশালার মালিকের গলদঘর্ম অবস্থা। সে বলতে চায় 'মাতৃজন্মের অমন ব্যর্থতায় বেঁচে থাকা মৃত্যুরই নামান্তর।' রাক্ষস সন্তানের জন্ম দেওয়া সম্ভব নয়। কোন এক শক্তিতে ভর করে মাতৃত্ব বিশ্বাস করে সত্যের মুখোমুখি হতে চেয়েছে। সমাজের সামনে মাতৃত্বের স্বাদ ও স্বপ্ন, বিশ্বাস ও আনন্দের প্রকৃতবোধের প্রকাশ ঘটিয়েছে তিলি। তাই দ্বিধাহীন দৃঢ়তায় লক্ষ্যে লোক ঠকানোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। কানে তালা ধরা আওয়াজে মাইকের দাপটের সামনে এতক্ষণ ধরে লোকের সমাগম ছিল। কিন্তু তিলির বাজি ধরার সাথে সাথে মাইক থেমে যায়। প্রকৃত স্বরূপের সন্ধানে মানুষের উপস্থিতির কথা ভেবে ভয়ে সংগ্রহশালার মালিক গদি থেকে নেমে ছুটতে শুরু করে ঘন অন্ধকারেই। স্তম্ভিত পরিবেশে সকলে যেন সকলের দিকে তাকিয়েছে। আর তিলি তাকিয়েছে সত্যের দিকে, সম্মানের দিকে, নিজের সন্তানের দিকে, মনুষ্যত্বের প্রতি বিশ্বাসের দিকে। গর্বে, শিহরণে, বিশ্বাসে, ভালোবাসায়, তুলি ধুনির হৃদয়ে চিরকালীন জায়গা পেয়ে যায়। আর অবাক বিস্ময়ে ধুনি দেখল সত্যকে, সমাজকে, তার সহধর্মিণীকে সর্বোপরি নারীশক্তিকে—

> "অবাক বিস্ময়ে ধুনি দেখল, তিলির শরীরটা বড় হতে হতে ক্রমশ ছাড়িয়ে যাচ্ছে সব মানুষ জনের মাথা, গাছ, লাইটপোষ্ট, নাগরদোলার চূড়ায় বাঁধা দাম্ভিক সার্চলাইট...সব...সবকিছু।" [১১৭]

এই বিস্ময় ও বিমূর্তি, স্বপ্ন ও বাস্তবের মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন গল্পকার মানব চক্রবর্তী তাঁর কাহিনী বয়ানের নিখুঁত সৃষ্টি কৌশলে।

'দানো' গল্পটি একটু ভিন্ন স্বাদের রচনা। দানো পেশায় একজন কসাই। তার নেশা হল ফুটবল নিয়ে। 'মথুরা বুলেট' নামে দানোর ফুটবল টিম নিয়ে গর্বের শেষ নেই। গল্পের মধ্যে দানোর ফুটবল প্রীতির কথায় কাহিনী বৃত্ত নির্মিত হয়েছে। দীনবন্ধু বাউরি থেকে দীনু হয়ে দানো নামে পরিচিত এই কসাই। উত্তম পুরুষের জিজ্ঞাসায় লেখক স্বয়ং দানোর মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছেন। দানো গল্প ভালোবাসে তার আজেবাজে কোনো গল্প নয়। সমস্ত গল্পের মূলে কেবল ফুটবল। তার মুখ বন্ধ নেই এক মিনিটের জন্যও—

> "আংটায় ঝোলানো পাঁঠা-খাসির রাং, সিনা, গর্দান আলাদা করতে করতে, তেঁতুল কাঠের কুন্দায় কাটারির কোপ্ মারতে-মারতে, সে বলে যেত। কোথায় কোন ক্লাব 'ক' গোলে জিতেছে। কোন ছেলেটার পায়ে কাজ আছে।" [১১৮]

সে কেবল পাশাপাশি গ্রাম বা ক্লাবের খবর জানে তা নয়। ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান, মহামেডান স্পোর্টিংয়ের প্লেয়ারদের নামও বেমালুম বলে দেয়। তা শুনে সবাই অবাক হয়। এই দানোর চেহারা বিরাট, বিশাল, কুচকুচে কালো শরীরের জন্য এবং কসাই বলে অনেকে ভয় পেলেও দানোর কথাবার্তা ও ব্যবহার যথেষ্ট ভালো। গলার স্বর অতি সুমধুর ও সুন্দর গুছিয়ে কথা বলতে পারার জন্য গোটা চারেক মাংসের দোকানের চেয়ে দানোর মাংস দোকানে ভিড় সব সময় বেশি থাকত।

কলেজে ছাত্র সংসদের গণ্ডগোলে পক্ষপাতিত্বের জন্য 'মেজদা'-কে দানোর দোকানের সামনে ছেলেরা একা পেয়ে কলার চেপে ঘুঁসি মারতে উদ্যত হলে দানো কসাই মাংস কাটার বড় ছুরিটা নিয়ে বিকট চিৎকার করে ছুটে যায়। মানুষের পাশে ভালোবাসার সম্পর্কের প্রমাণ দেয় সে। তার ফলে লেখকের মা-এর প্রচণ্ড ইচ্ছে জন্মায় দানোকে দেখার। তাকে বাড়িতে ডেকে এনে মাছ মাংস নানান তরকারী করে খেতে দেয়। দানো মাংস খায় না শুনে সকলে অবাক হয়। সে মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে এঁটো পাতা নিজেই তুলে। ধুতে চায়। ছোট জাত বলে সংকোচ ছিল তার। লেখকের মা-এর স্পষ্ট বক্তব্য হল—

> "...অতিথির আবার জাত হয় নাকি! অতিথি নারায়ণ... যাও, ওঠো—" [১১৯]

দানো ছলছল চোখে উঠে যায়। যাবার সময় মা জননীকে, প্রণাম করে। আর বলে— 'পিলিয়ারের পা মাঠে : আজ জাইনলম হাতও কিছু কম নয়।'—অর্থাৎ মায়ের হাতের রান্নার প্রশংসাতেও ফুটবলের সাথে তুলনা টেনেছে।

দানোর ফুটবল টীমের নাম শুনে কথক অবাক হয়। 'মথুরা বুলেট' আসলে বুলেটের মতো খেলোয়াড়েরা ছুটবে শট নিবে তাই এমন বলে দানো জানায়। অজয় নদীর গোটা এলাকা দানোকে যেমন চেনে তেমনি মথুরা বুলেটকেও চেনে-এভাবেই তার বেঁচে থাকা। জীবনে সামান্য রোজগার করে সংসার চালায়, ছেলে মানুষ করে সে। তার ছেলেকে ফুটবল প্লেয়ার করতে চায়। তার জন্য খাসির টেংরি, ছাল,

মুণ্ডি সে বিক্রয় করে না। একমাত্র ছেলে নুনাকে খাওয়ানোর জন্য নিয়ে যায়।

একবার 'মথুরা বুলেট' টীম "হরিহর মাহাতো কাপ"-এর ফাইনালে ওঠে। টাউন থেকে ভালো ভালো প্লেয়ার যোগাড় করে দলকে শক্ত করতে চেয়েছে দানো। তার জন্য—

> "ই মাসে পাঁঠাখাসির মহাজনের টাকা রুইখে দিয়েছি। বইলেছি, ফাইনালে খেলার পর সব হিসাবপত্তর হবেক। ইটো আমার মরণ-বাঁচনের খেলা বটে।" [১২০]

সাইকেলের সামনের পিছনে দুজনকে বসিয়ে কয়েক মাইল দূরে খেলার মাঠে হাজির হয় দানো। ছেলেকে এই ম্যাচে খেলাবে সে। খেলা শুরু হতে বিপরীত পক্ষে খেলোয়াড়রা এলোপাথাড়িভাবে বল খেলে ম্যাচ ড্র করে দেয়। দানোর মন খারাপ হয়। তার ইজ্জতও নষ্ট হয়। সে ছেলে নুনাকে মারধোর করে। এত দিন ধরে টেংরির জুস খাইয়ে তাকে খেলোয়াড় করেছে আজ সে ব্যর্থ। তার জন্য জিততে পারেনি। ভুল শটে বল বাইরে গেছে বারবার। গোল করার লোক না থাকায় ছেলে ভালো না খেলায় দানোর রাগ চড়ে যায়। নুনা অর্থাৎ 'ফক্‌রি পিলিয়ার' হবে কিনা দানো দুশ্চিন্তায় পড়ে। ফুটবল খেলতে হলে যে শক্তি, সাহস ট্রেনিং দরকার তা ছিল না নুনার। দানো কসাই হতাশ হয়ে— 'একা একা হেঁটে গেল অন্ধকারে।'

দানো কসাই স্বপ্ন ও ভালোবাসায় নুনাকে প্লেয়ার করার প্রাণপণ চেষ্টায় নামে। তাকে ছুটিয়ে ছুটিয়ে দম ফুরিয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি করে দেয়। নুনা রোগাটে ও অসুখে আক্রান্ত ছিল, যা দানোর জানা ছিল না। তারপর হঠাৎ করে নুনা মারা যায়। আর দানো কসাই সেই শোকে ও বউয়ের অপমানে ঘর ছাড়া হয়। এখন তার আশ্রয় প্লাটফর্ম। একদিন চিত্তরঞ্জন প্লাটফর্মে দানোকে কথক চিনে ফেলে। সে একটি বলকে আঁকড়ে নোংরা ধুতি বড় চুল ও দাঁড়ি সমেত পড়ে ছিল। তার কুচকুচে কালো রঙ আরও বেশি কালোয় উজ্জ্বল হয়ে গেছে। সে এখন পাগল। বলে—

> "পাঁঠা-খাসি আর কাটি না দাদাবাবু। ফক্‌রি (নুনা) গেল। ঘরের বউ পর হইয়ে গেল। গাঁয়ের লোক দুর্দ্দুর করে, বলে হুই দ্যাখ্...দানো যায়...দানো সত্যিকারের দানো..." [১২১]

দানো সত্যিকারের জীবনের সন্ধান পেয়েছে। বাস্তবতার পরিচয় পেয়ে নিজেকে অপরাধী ভেবেছে সে। জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্ণা দেখা গেছে। সে নিজের নামের যথার্থ অর্থ সম্পর্কে বিদ্রুপ করেছে। এমনকি যে নামকরণ করেছিল তাকেও দানো মেরে ফেলতে যায়, এমনই তার আক্রোশ। ফুটবল প্রীতির সাথে জীবন জড়িয়ে পারিবারিক বিচ্ছেদ ও সঙ্গহীন জীবনে হত্যালীলার মতলব দানোর মধ্যে দেখা গেছে। ভালোবাসার বিপরীতে স্বপ্নভঙ্গের কাহিনী এনে লেখক এই গল্পে সংকল্পের সাথে বাস্তবতাকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

'ভয়ের পল্লী' ও 'সমীপেষু' গল্পদুটিতে মূল্যবোধের ধ্বস্ত কাঠামোয় বহুধাবিভক্ত মানুষের প্রতিবাদী উচ্চারণ অভিব্যক্ত হয়েছে। যে কোনো গল্পকারের নিজস্ব রচনা কৌশলে গল্পের ভেতরে সম্ভাবনা নির্ভর এক পরাজগতের আদর্শ তৈরী হয়। তাতে খানিকটা স্মৃতি থাকে, থাকে কল্পনা, ইচ্ছাপূরণের প্রচেষ্টা

আর খানিকটা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রাণবন্ত করার লক্ষ্য। তবে সমস্ত গল্পকারের ক্ষেত্র নির্বাচন, পরিসরের মাপ যেমন আলাদা তেমনি আলোকিত অংশে বর্ণনার বিপরীতে আঁধার ছায়ায় চরিত্রেরা নিশ্বাস নেয়। বাস্তব ও সম্ভাবনার দ্বিবাচনিকতায় নির্মিত সন্দর্ভে লেখকের উচ্চারণে ব্যাখ্যা লুকিয়ে থাকে। মানব চক্রবর্তী গল্পে সমাজ পরিসর ও সময় চেতনার অভিব্যক্তির মধ্যে উদ্ভাষিত 'ভয়ের পল্লী' ও 'সমীপেষু' গল্প দুটি। এখানে গল্পকারের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও ভাবাদর্শগত অবস্থান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়েছে 'ভয়ের পল্লীর' ভাবনা। পরিচিত বাস্তবতা থেকে অপরিচিত এক নতুন ভাবজগতে পাঠক পৌঁছে যায় জীবনের ভিন্ন ধরণের ভাষ্য উন্মোচনে।

সমসাময়িক সমাজের গোপন অলিন্দগুলি মানব চক্রবর্তী অতি সহজেই আবিষ্কার করার ক্ষমতা ও সাহস রেখেছেন। তাই গল্পের ভিতর ভুবনে 'চুকলিবুড়ির না জাগন না ঘুমের মাঝামাঝি প্রতীক্ষা'– 'ঘুমে চোখ ফেটে আসতে চাইলে চোখ খোলা রাখে'—এই সংকেত গর্ভে গল্পের আখ্যান প্রবাহিত হয়েছে। চুকলিবুড়ি সন্তান হারা স্বামী হারা অসহায়া এক নারী। পৌরুষ যেখানে সমাজের চোরাস্রোতে অন্ধকারের সন্ত্রাসে হারিয়ে গেছে, সেখানে অন্তেবাসী সমাজ পরিত্যক্তা বৃদ্ধা গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করে চালিকা শক্তি পেয়েছে। তার অসহায় প্রেক্ষিত থেকে ভয় ভেঙে দেওয়া মানিয়ে নেওয়ার ক্লীবতা থেকে সাহস ফিরে পেয়ে প্রতিরোধের বার্তা সবই ছোটগল্পের নির্মাণ ভূমিতে মহীয়ান। গল্পে চুকলিবুড়ি ফাইফরমাস খাটে, নারাণের চপ-ফুলুরির দোকানে বেসন ফাটে, ঝিরিঝিরি পেঁয়াজ কুচে দেয়, হিলহিলে বেগুন ফালি করে। আর দিনের বেলায় ভেবে রাখা প্রশ্নগুলো রাতের বেলায় সব তালগোল পাকিয়ে ফেলে। সন্তান হারানোর যন্ত্রণায় নিজেই নিজেকে যেন প্রশ্ন করে—

> "ঘুরে ফিরে সেই এক কথা— নিঃসন্তান বাতাসের একটানা গোঙানির মত, শোনায়,
> —হ্যাঁরে গোবিন্দ, কে মারল তোকে অমন করে ? বুড়ো বয়সে ভিক্ষের চাল পেটে সয় ?"[১২২]

সে অভাবের তাড়নায় অনেক রকমের কাজ করতে বাধ্য হয়। বাচ্চা বিয়োনোর পর 'বাবুদের বৌ-ঝিদের পেট-পাছায় তেল মালিশ' করে সেবা করার মধ্য দিয়ে সুনাম পেয়েছে সে। 'লোকে বলত চুকলিবুড়ির মালিশে মরা মানুষ বেঁচে ওঠে।' লেখকের বাস্তবতা ধরা পড়ে— 'ওতে কি আর জীবন কাটে ?' যে জীবনের সঙ্গে অনেকান্তিক সূত্রধার যুক্ত রয়েছে। নিরাপদ মিস্ত্রি, গোবিন্দ, সন্তোষকুমার বুগলু সর্দার, জংগুল, কেষ্ট, দীপেন, হরেন-মাখন-রাম-শম্ভু এদের ঘিরেই চুকলি বুড়ির জগৎ। এত মানুষ থাকতে তার অন্ধকার দূর করতে কেউ পারেনি। কেবল সন্তোষ কুমারের একশো চুয়াল্লিশ ঘন্টা অবিরাম সাইকেল চালানোর তৃতীয় দিন চুকলিবুড়ির চোখে পড়ে 'সামনের অন্ধকার ডিঙিয়ে একটু দূরেই আলোর চক্র।'

গল্পে অন্ধকার থেকে আলোকিত সমাজে উঠে আসার বৃত্তান্ত যে নান্দনিকতায় প্রতীয়মান হয়েছে তা অবক্ষয়ী সমাজের ক্লেদে– জংগুল ও তার দলবলের দাপটে তৈরী। মুখ আড়াল করা মুখোশের নির্লজ্জতায়, মিথ্যার বিপুল বিস্তারের মধ্য দিয়ে সত্যে পৌঁছতে চেয়েছেন গল্পকার। বিবাদী সুরকে বোঝার জন্য যেমন

বাদী সুরের প্রয়োজন তেমনি রিক্ততার ছবিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চুকলিবুড়ির ছেলে গোবিন্দের মৃত্যুহীন স্মৃতি জাগরুক থেকেছে। বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ জংগুল গোবিন্দকে খুন করেছিল। কয়েকটি মাত্র শব্দের রেখায় গল্পের বয়ানে তা ধরা রয়েছে—

> ''প্রহরে প্রহরে অন্ধকারের রঙ বদলে যায়, ক্ষণে ক্ষণে বদলে যায় ভয়ে তরাসে পেছিয়ে যাওয়া চুকলিবুড়ির মুখের ভাষা।'' [১২৩]

কীভাবে এই ভয় আর সন্ত্রাস গোটা পৌর সমাজকে পঙ্গু করে দেয়— এই প্রতিবেদন 'ভয়ের পল্লী'র মধ্যে স্পষ্ট। একদিকে জংগুলের দল আর অন্যদিকে কেষ্টদার পার্টি, দাপুটে আধিপত্য তাদের মধ্য দিয়ে পৌর সমাজে চোরাপথ তৈরী হয়। সত্যভ্রম যে সত্যকে আড়াল করেছে গল্পকার তা এই গল্পে তুলে ধরেছেন শৈল্পিক গুণে, ভাষা ব্যবহারের নিপুণ কুশলতায়। জংগুল ও কেষ্টদার দাপটে যে প্রাণ ওষ্ঠাগত তা গল্পকারও বলতে ভুলেননি—

> ''কি আশ্চর্য মিলমিশ খেয়ে আছে দু-মেরুর দুজন, ঐ এক বিলবইয়ের পতাকাতলে যেন একই সোয়েটারের দুই হাত, শুধু রঙের প্রভেদ; একই কারিগরের হাতে তৈরি ঠাকবুনুনি গরম জামার দুই দখলদার...'' [১২৪]

কেষ্টদার চ্যালা দীপেনের চাঁদা আদায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করতে গিয়ে বর্তমান কালের সাথে গ্রথিত হয়েছে অতীত স্মৃতি। সমাজ পটভূমিতে চুকলিবুড়ির দ্বিবাচনিকসম্পর্ক সময়ের অন্তরালে প্রতিষ্ঠিত। বাস্তব থেকে সম্ভাবনাময় নিঃশব্দ প্রয়াণে তথা উপসংহারে গল্পের আখ্যান পৌঁছে যায়। চুকলিবুড়ি অন্ত্যেবাসী অবস্থান ছেড়ে মঞ্চের আলোয় উজ্জ্বল হয়। সে কেবল নিষ্ক্রিয় দর্শক নয়। সন্তানহারা বৃদ্ধা ও সময়ের শাসনে, পরিমাপে যথেষ্ট পরিণত বাস্তবতায় উন্নীত। এখন সে প্রতিবাদে ও প্রতিরোধে সক্রিয় এক সংগঠক, একটি উচ্চকণ্ঠের জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর প্রচেষ্টায় চরিত্রটি রাজনৈতিক আবর্তে ক্রিয়াশীল। 'উত্তরে হাওয়ার সঙ্গে ভেসে আসে ভয়ের গন্ধ।'

নিশুতি রাতের অন্ধকারে জংগুল আর তার তিন সাগরেদ কাকে যেন টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যায়— এ দৃশ্যায়নের পরই ঘুরে দাঁড়ানোর পালা, শীত কাটানোর মুহূর্ত, জেগে ওঠার মুহূর্ত তৈরী হয়। তখনই চুকলিবুড়ি রূপান্তরিত হয় জাগরণের বার্তাবাহী সংগঠকে। সকলে ডেকে তুলে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের আয়োজনে ব্যস্ত হয়— 'বলি কত আর ঘুমাবে ?' তীক্ষ্ণ এই স্বরক্ষেপণে বিচ্ছুরিত হয় চেতনালোক। তখন ঘুম থেকে উঠে পড়ে হরেন সুর। সে বলে— 'আর নয়, ঘুমিয়ে থাকলে সবাই ভাবে মরা মানুষ।' তারপর সে জড়ো করে মাখন দর্জি, শম্ভু, নেপাল, রামকে। গল্পকার বলেন— তাদের 'চোখের আগুনে পথ চলার নির্দেশ।' কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা শোরগোল তুলে বীভৎস ভয় পাইয়ে দেয়। পাঁচ জনের ছায়া ক্রমাগত দীর্ঘতর হয়।মহল্লা থেকে অসংখ্য মানুষ বেরিয়ে আসে—

> ''ওদের পায়ের শব্দে বেজে উঠেছে ঘুম ভাঙার গান, মাটিতে পাথরে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিতে প্রতিরোধের ভাষা।'' [১২৫]

ফলে জংগুল ও তার দলবল শেয়ালের মতো ছুটে পালিয়ে যায়। জয়ী হয় জনতার দৃপ্ত সাহস। চুকলিবুড়ি

এগিয়ে যায় সাহসের সাথে, যে সাহস আগে হারিয়ে গিয়েছিল। ভয়ের শেকল ছিঁড়ে জয়ের বার্তা দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে মহল্লা থেকে সব তল্লাটে।

'ভয়ের পল্লী'র উপসংহারে লেখক পৌঁছে যান সামান্য বৃদ্ধার অসামান্য হয়ে ওঠার বার্তা দিয়ে। তার গলায় দশ সমুদ্রের গর্জন। বাস্তব ও সম্ভাবনার সীমান্তে দাঁড়িয়ে চুকলিবুড়ির কথায় জাগে ভিন্ন স্বরের দ্যোতনা—'ভয় আমাদের চারিদিকে, একদিকেরটা কেটেছে, হুঁশিয়ার থাকো' গল্পের সূচনায় ভয়ের বার্তা থাকলেও সমাপ্তি অংশে ভয় ক্রমশ দূরে সরে গেছে। তাই ঘুম-ভাঙানিয়ে চুকলিবুড়ির জমাট আবেগ-প্রসূত কান্নার বিপ্রতীপে প্রতিস্থাপিত হয়েছে 'মানুষের মুখে দীর্ঘদিনের ভয় খেদানো হাসি।' ভয়ের পল্লী থেকে 'ভয়ের ভূত ছেড়ে গেছে তল্লাট।' গল্পের ব্যঞ্জনাগর্ভে উপসংহার যথাযথ হলেও পাঠকের চেতনালোকে চুকলিবুড়ির উপস্থিতি চরিত্রায়নকে শুদ্ধিকরণের সাথে সজাগ করেছে। তাই চুকলিবুড়ি গল্পকারের উপস্থাপনায় পাঠকের মুখোমুখি হয়। কেননা— 'ভোরের আর বেশি দেরি নেই।' যে যার মতো পথ করে চলেছে। দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত শোক-রাগ-ঘৃণা ও পুত্রশোকের পাহাড় প্রমাণ হাহাকার ও কান্নার বিপরীতে ভয় খেদানো হাসি ফিরে পেয়েছে। আর তারা জেনেছে বিপ্লব ও প্রতিবাদকে বাঁচিয়ে রাখার মন্ত্র—

> 'চুকলিবুড়ি উনুনে বাতাস দেয় আর বুকভরে আগুনফুলের আস্বাদ নিতে নিতে, মনে মনে বলে— ভয় যখন ভেঙেছে,তাকে জাগিয়ে রাখতে হবে।' [১২৬]

গল্পের শেষ বাক্যে বেঁচে রয়েছে চুকলিবুড়ি ও পাঠক। গল্পকার মানব চক্রবর্তী এক নিখুঁত শিল্পের পরিবেশনে ত্রুটিমুক্ত থাকার জন্য পাঠকের অন্তরে দ্যোতনা তৈরী করে সমাপ্তি টেনেছেন। যা পাঠককে মুক্তির আস্বাদ দিয়েছে। কেবল পাঠকৃতির জন্য নয়, ভাষা ব্যবহারের সাথে চরিত্রটির মানানসই সংযোগ সাধনসূচক পরিবেশ পরিবেশনে, চরিত্রটির স্বচ্ছন্দ ও সহজ উচ্চারণে, বাস্তবতা থেকে সম্ভাবনাময় গতিশীলতায় পথের সন্ধানের জন্য গল্পে সমাজজীবনের ছবি প্রশংসার দাবী রাখে।

'সমীপেষু' গল্পটির মধ্যেও রয়েছে মূল্যবোধহীন ক্ষয়িষ্ণু সময়ের সংকটময় মুহূর্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিমাধব সান্যাল আসলে প্রতীকী চরিত্র। যে কিনা বিলীয়মান প্রজন্মের প্রতিনিধিস্থানীয়। এরা স্বপ্ন দেখত উপনিবেশিক শোষণ অবসানে নতুন চেতনায় গড়ে উঠবে সমাজ-সভ্যতা। কিন্তু এদের চোখের সামনে ধ্বংস হয়ে যায় স্বপ্নসৌধ। উপনিবেশিকোত্তর সমাজে ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের মারণবীজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে পচনশীল সমাজ সম্পর্কে 'বোধ' কবিতায় জীবনানন্দ দাশ লেখেন— 'যেই কুঁজ–গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে/নষ্ট শশা–পচা চালকুমড়ার ছাঁচে/যে-সব হৃদয়ে ফলিয়াছে/সেই সব'—স্বাধীনতা সংগ্রামী হরিমাধব সান্যাল হাসপাতালে রুগ্ন অবস্থায় শয্যাশায়ী। এদিকে সরকারী হাসপাতালে মহাদেবের মতো রক্তচোষা ছারপোকাদের অবাধ দৌরাত্ম। ভারতীয় সমাজে তারা এখন ভোগদখলকে কব্জা করতে অভ্যস্ত। রোগীদের দেখাশোনা যাতে ভালো মত হয় তার জন্য নজরানা দেওয়াটা বাধ্যতামূলক। একসময় যে সংগ্রামী ব্রিটিশের রক্তচক্ষু ও বুলেটের মোকাবিলা করেছে সেই আদর্শবাদী বিপ্লবী আজ নরক যন্ত্রণায় কাতর। মাথানত করে সইতে হচ্ছে অন্যায়। সমাজের নির্গমহীন চক্রব্যূহে হরিমাধব আটকে গেছে।

মহাদেব, লালগঞ্জের যুবক বিডিও, গেমস্ টিচার শংকর বালা, আত্মজ দীপু ও পুত্রবধূ ছন্দা, নকুল হাজরা থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কারোরই মুক্তি নেই, পরিত্রাণ নেই। এখানে মূল্যবোধ, ইতিহাস, স্মৃতি ইত্যাদি শব্দ অচল অবান্তর। বাচনের বিন্যাসে ও পারম্পর্যে বিচরণ বা সাংকেতিক ভাষায় গল্পের নির্মাণ কৌশল নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে। 'ভয়ের পল্লী'-র মতোই ভাষার নিখুঁত বুননে আখ্যান সাহিত্যগুণে মর্যাদা পেয়েছে। যেমন—

> 'মহাদেবের মেচেতা ধরা মুখ ক্রমশ চওড়া হচ্ছে। বিশাল . . .সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্যাপ্ত ওইমুখের নিশ্বাস আলকুশে বিষ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, জ্বলে যাচ্ছে দেহ, মুখের আদল থেকে অস্পষ্ট বলিরেখাগুলি স্কুল মাস্টার হরিমাধব সান্যালের প্রৌঢ় শরীরটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে।' [১২৭]

মানব চক্রবর্তী তাঁর গল্পে জীবনের একটি বিশিষ্ট প্রকরণকে কল্পনায় সত্য করে তুলেছেন। গল্পে সময়চেতনা নানাভাবে সক্রিয় থাকায় সন্দর্ভের ভিন্ন পাঠে তা ভিন্ন ভাবেই ধরা দেয়। আসলে সার্থক গল্পকার সময়ের অভিব্যক্তিকে ধরে রাখেন পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী বিন্যস্ত উপকরণের মধ্যে। আর গল্পকারও তাঁর সৃজন প্রতিভায় সময়ের সীমাকে প্রতিকায়িত করেন বিষয়গত ও বিষয়ীগত ভাবনার সংশ্লেষণে। গল্পকারের ভাবাদর্শ ও অভিব্যক্তিতে ধরা থাকে একটি বিশেষ বার্তা। হরিমাধবের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত সময়বোধ গল্পের পাঠকৃতিকে চমকিত ও সঞ্চারিত করেছে। পরিবর্তনশীল সমাজের ছবি অনুপুঙ্খরূপে তুলে ধরেছেন লেখক। সময়ের কেন্দ্রিয় অবস্থানে সমাজের সচলতা ও পরিবর্তনশীলতা ধরা রয়েছে গল্পে—

> ''আশ্চর্য! চারপাশের মানুষজন কত দ্রুত বদলে যাচ্ছে। কারো দিকেই এখন সরাসরি মুখ তুলে তাকানো যায় না। সম্ভ্রমহীন নীরক্ত মুখে লোভের এঁটোকাটা। চোখের উপর চোখ রাখতে হরিমাধব ভয় পান। অথচ এমন তো হওয়ার কথা ছিল না।" [১২৮]

লেখকের সজাগ দৃষ্টি ধরা রয়েছে সময় ও সমাজের দিক চেয়ে। কেননা 'যে স্বপ্নে, দীক্ষায়, আদর্শে, যৌবনের রক্তঝরা দিনগুলি চরম দারিদ্র্য ও অনটনের মাঝে মুহূর্তের জন্যেও মাথা নোয়ায়নি, তা কি চতুর্দিকে ছড়ানো ছিটানো অসফল এইসব বিষবৃক্ষের জন্য।' অন্ধকারের ভয়াল গ্রাসে মহাদেবের ভয়াবহ ঘূর্ণিচক্রে হরিমাধবের মতো জ্যোতিমান পথিক কীভাবে বিপন্নতায় পৌঁছাতে পারে— সেই ব্যাখ্যায় উপনীত হতে চেয়েছেন গল্পকার তাঁর আখ্যান বয়ানের মধ্য দিয়ে।

স্বাধীন দেশের নবীন সমাজ গড়ে তোলার জন্য যারা আত্মাহুতি দিতে দ্বিধা করেনি, আদর্শনিষ্ঠ জীবনযাপন করার জন্য আপস করেনি—এখন তারা পরিবারে ও সমাজে নিঃসঙ্গ। মানব চক্রবর্তীর বয়ানে রয়েছে— 'টেবিলের এপারে, ওপারে দুই যুগ, দুই কাল এবং সম্ভবত দুই ভিন্নতর আদর্শ'। 'সমীপেষু' গল্পে হরিমাধবের চেনা জগৎ ক্রমশ ঝাপসা হয়েছে। পরিচিত মুখগুলি অবিশ্বাসের দাপটে অপরিচিত, এমনকি সন্তান দীপুও তাকে চিনতে ভুল করেছে। বিয়াল্লিশের আগুনঝরা দিনগুলির স্মৃতিও অনিকেত এখন, কোথাও কোন প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্নও নেই। যে সমাজে অর্থমূল্যেই মনুষ্যত্ব নির্ভর করে,

সেখানে খাঁটি স্বাধীনতা সংগ্রামীর বিপ্লবী ভূমিকা হারিয়ে গেছে অন্ধকারে, নীরবে,নিভৃতে।এ যেন জীবনানন্দের কবিতার ভাবনার মেলবন্ধন— 'যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা' —এই বিপ্রতীপে হরিমাধবের বেঁচে থাকা যেন দৃষ্টিহীন সমাজে মুর্খ অন্ধ হয়ে বয়স গোনা। তার রাজনীতি ভাবনা কিংবা সংগ্রামী জীবনের প্রশংসা না করলেও তার কোনো ক্ষতি নেই। সে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে বলে—

> ''জানি না, চোখে কম দেখি কি না, অনেক কিছুই বাঁকা ঠেকে। মনে হয় ভুল, বিরাট এক ভুল ষ্ট্রাকচারের ওপর দশতলা বিশতলা দালান উঠছে, উচ্চতার মোহে ভিতরের দুর্বলতা ভুলে যাচ্ছে মানুষ। ভবিষ্যৎ ভাবলে বড় ভয় হয়।'' [১২৯]

হরিমাধবের ভয় নিজের বেঁচে থাকার জন্য নয় আগামী প্রজন্মের জন্যে। 'ভয়ের পল্লী'তে চুকলিবুড়ি শেষ পর্যন্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। বর্তমানকে সংগঠিত করার আপ্রাণ চেষ্টায় ভবিষ্যৎকে সুগম করেছিল। কিন্তু হরিমাধব তা পারেনি।

মানব চক্রবর্তী গল্পভাবনার ক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধান দেন। পাঠকের নিরন্তর অধ্যবসায়ের উপযোগী পরিসর তৈরী করেন। যা ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্যের ভুবনকে আরো বেশী প্রাঞ্জল ও আকর্ষণীয় করে তোলে। 'সমীপেষু' গল্পে পাঠকও অন্বেষণ করেন গল্পের নানান চোরাপথের সাথে হারিয়ে যেতে, আবার জয় পরাজয়ের দোটানায় সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে। মানুষের পৃথিবী যখন ঘূর্ণাবর্তে বিধুর সেখানে কেবল হরিমাধবের পরাজয় কোনো ব্যক্তির পরাভব নয় সমগ্র মানব জাতির আত্মমর্যাদা ও মূল্যবোধের করুণ অবস্থানকেই চিহ্নিত করে। আসলে হরিমাধব একা বলেই অসহায়, দুর্বল তাঁর রক্ষণশীল বেষ্টনি ক্রমশ দুর্বল হয়ে গেছে। অসহায়তার দহন জ্বালা তাঁকে মর্মবিদারক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে—

> ''মনে হল সারাটা পৃথিবী যেন হরিমাধবের বিপক্ষে চলে গেছে, তিনি একা। তবে কি তিনিই ভুল পথে হাঁটছেন এতকাল ধরে ? নতুন করে তাকে আবার এ যুগের বর্ণপরিচয় শিখতে হবে ?'' [১৩০]

গল্পকার হরিমাধবের বিপরীতে ঘুণ ধরা সমাজের নানান সমস্যাকে সূক্ষ্মাতিভাবে তুলে ধরেছেন। হরিমাধবের নিভন্ত জীবনদীপ কোনক্রমে টিকে থাকে। আত্মগ্লানিতে হরিমাধবের পরাজয়জনিত জীবনযন্ত্রণা প্রগাঢ় বলে স্ত্রী মনোরমার উপস্থিতিতে পলকহীন দৃষ্টিতে দেওয়ালের দিকে মুখ করে থাকে। আর পুত্র ও পুত্রবধূর ব্যবহার প্রতিবেশীর মতো মনে হয়—

> 'তার সামনে দেয়াল—চকচকে সাদা, অথৈ।' [১৩১]

আবার গল্পের দ্বিতীয় অংশে অস্থির সময়ের মধ্যে ব্যধিগ্রস্ত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। হরিমাধবের স্মৃতিপটে প্রতিবাদী সত্তা ফুটে উঠেছে। গল্পকার বলেছেন—

> ''অন্ধকারে দূষিত শেকড়ের গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে। মনে হল তাঁর প্রতিটি বেডেই যেন হাত-পা কোমর ভাঙা একজন মানুষ, প্রতিবাদের সামান্য ক্ষমতা নেই, নির্জীব, মৃতবৎ জেগে বসে আছে।'' [১৩২]

সমাজ সচেতন লেখক বলেই সমাজের চোরাপথের নানান বাঁক পরিবেশনে প্রতিবাদের বার্তা ঘোষিত হয়েছে। হরিমাধব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ভাবনায় মনস্থির করে স্বাস্থ্যমন্ত্রিকে পত্র লিখেছে। চরিত্রনির্মাণ কৌশলে গল্পকারের সাহসী মনোভাব যথেষ্ট দৃঢ়তার সঙ্গে ধরা রয়েছে— 'চকচকে ওয়ার্ড। ধোয়া মোছা শেষ। অথচ শরীরের মধ্যে ঘায়ের মত পচা গন্ধটা রয়েই গেছে।'

মন্ত্রীর হাতে চিঠিটা ধরিয়ে দিতে চেয়েছিল হরিমাধব। সেবার নামে প্রত্যেকটি স্বাস্থ্যকর্মীর প্রকৃত স্বরূপ জানিয়ে দিতে চেয়েছে সে। তার বর্ণময় চিঠিতে মন্ত্রীমহাশয় প্রকৃত সত্য বুঝে সঠিক ব্যবস্থা নেবেন— এই ছিল হরিমাধবের ভাবনা। প্রত্যেক ওয়ার্ডে মন্ত্রী মহাশয় আসছেন শুনে খুশিই হয়েছেন হরিমাধব। উত্তেজনায় অস্থির হয়েছে। কেননা তাঁর হাতেই যেন চরম সময়ে গর্জে উঠবে 'পিস্তল...হ্যাঁ...পিস্তলের চেয়ে কম নয় ওই আর্জিপত্র... পেন ইজ মাইটার দ্যান সোর্ড...'

সমাজের চোরাপথকে খোলনলচে পরিষ্কার করে সরলরৈখিক জীবনাচরণে অতি সাধারণ মানুষের বাঁচার পথ তৈরীর স্পষ্ট বার্তা শুনিয়েছেন গল্পকার। তাঁর বয়নের মধ্যে কৌশলে রাজনৈতিক বক্তব্য ব্যঞ্জনায় ধরা পড়ে—

> "একি! একই সঙ্গে এত রূপ ? নাকি শত রূপের সমাহার অঙ্গে অঙ্গে ? স্বাস্থ্যমন্ত্রী, সেক্রেটারী, সুপার, ডাক্তার, রিপোর্টার সব মিলেমিশে এক ও অদ্বিতীয় মহাদেব..." [১৩৩]

সমবেত জনতার প্রতিবাদের মতোই অজস্র শব্দে গড়া হরিমাধবের সাদা চিরকুট যথেষ্ট শক্তির আধার রূপে প্রতিভাত— 'হরিমাধবের পাঁচটি আঙ্গুল আজ বজ্রের শক্তি'-তে পরিণত। গল্পকারের প্রতিবাদের ভাষা যথেষ্ট তাত্ত্বিক ভাবনায় গল্পের অবয়বকে ও মানানসই উপসংহারকে রক্ষা করেছে। মূল্যবোধহীনতায় আক্রান্ত হরিমাধবের মতো চরিত্রেরা গল্পের চালিকা শক্তি। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে এভাবেই ধরা পড়ে।

'বাজার' গল্পে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির পরিচয় রয়েছে। লেখক ব্যবসাকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক সমস্যার সাথে ধর্মের সংযোগ ঘটিয়ে মানবিক মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েছেন।খালেদ মিঞা ও তার ছেলে গিয়াসের লেপ-তোশকের দোকান, অন্যদিকে পালান সরকারের জয়গুরু মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে অবৈতনিক কর্মচারী ফুলুটবাবুর মানবিকতায় গল্পের আখ্যানভাগ গড়ে ওঠে। '১০০১ সংকটমোচন হনুমান্ জিউ মন্দিরের পাশেই খালেদ মিঞার দোকান।' এই মন্দিরে হিন্দুরা পুজো দিতে আসে। ব্যবসা বাড়ানোর জন্য পালান সরকারের মতলব খালেদ মিঞার দোকানের জায়গাটায় একটা হোটেল খোলা। উচিত মূল্য দিয়ে সে হিন্দুহোটেল খুলতে চায়—

> "পুজোটুজোর শেষে হিন্দু হোটেলে দুটো খাওয়া-দাওয়া করবে,এই আর কি..." [১৩৪]

দশ বছর আগে মন্দির গড়ে ওঠার সময়ও বিস্তর সমস্যা দেখা দিয়েছিল।ময়লা জমে থাকা পচা ডোবাটাকে বাঁশকঞ্চি দিয়ে ঘিরে জনতা চলতে শুরু করে 'আরে বাবা মন্দির মসজিদ বড় পুণ্যের জায়গা। মাটির তলে যদি পাপ থাকে, তার ওপর হাঁটু গেড়ে বসতে পারে ধর্ম ?' তারপরও মন্দির হয়েছে, গড়ে উঠেছে বাজার কমিটি, বছরের নির্দিষ্ট দিনে পুজোর সময় কলকাতার যাত্রা পার্টি, কবির লড়াই, মহাধুমধামে

কীর্তন, তিনদিন ধরে কাঙাল ভোজন চলে—

> ''সে কি মার-মার খাওয়া। সত্যি; মানুষের অভাব না দেখলে বোঝা যাবে না। দোকানের চৌকিতে বসে সব দেখে খালেদ মিঞা।'' [১৩৫]

দোকানপাট বন্ধ হলে সন্ধ্যা হওয়ার সাথে সাথে মন্দিরে নেশাখোরদের আড্ডা বসে। তারা উদ্ভট চিৎকার করে। খালেদ মিঞা এইসব পরিবর্তন দেখে চমকে ওঠে— 'মানুষগুলো আজকাল কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। সোজা নজরে আর কেউ তাকায় না। ত্যারচা চাউনি।' খালেদ মিঞা মুখে কিছু বলে না। নেশার ঘোরে রাতের আড্ডায় 'অযোধ্যার গপ্‌পো' বেশি হয়। মসজিদ ভেঙে মন্দির হবার গল্পে মাতিয়ে রাখে বেশ কিছু নেতা। অযোধ্যা যাওয়ার লক্ষ্যে শয়ে শয়ে ট্র্যাক ছাড়ার কথা হয়। ডাক্তার ও খালেদের মনে সংশয় জাগে। তাদের মধ্যে আলোচনা হয়। ডাক্তার বলে—

> ''আসলে পার্টির লোকেরা হচ্ছে বোতলের ভূত, বুঝলে ? কাজ দিতে না পারলে নেতার গলা টিপে মারবে। তা কাজও তেমন, যাও... ছায়ার সঙ্গে যুদ্ধ করো। এ যুদ্ধ কখনও শেষও হবে না, মসজিদ ভেঙে মন্দিরও হবে না নেতাদের নেতাগিরি বাঁচবে।'' [১৩৬]

লেখক সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে সময়ের রাজনীতিকে স্পষ্টতর করে দিয়েছেন। হাজার মাইল দূরের অযোধ্য যেন বাজার সংলগ্ন মন্দিরের পাশাপাশি এলাকায় অবস্থিত। তাই সকলের চিন্তাভাবনা। এই চিন্তার সাথে যুক্ত হয়েছে 'হনুমান জীউ' মন্দিরে রূপোর গদা চুরির প্রসঙ্গ। সকলে তীক্ষ্ণস্বরে চিৎকার করে বলে—'হনুমানের গদা চুরি। হিন্দুর বুকে ছুরি।' তার সাথে বলে মন্দির লাগোয়া বিধর্মীর দোকান চলবে না। অর্থাৎ খালেদ মিঞার দোকানের কথা চলে এসেছে। সে মুসলমান এবং তাকেই গদাচোর হিসেবে সকলে চিহ্নিত করে, দোকানে আগুন লাগানোর কথা ওঠে। চাচাকে সকলে মারে। সেই সময় ফুলুটবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে প্রতিবাদ জানায়। সবার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে বলে—

> ''গদা তো আমি নিয়েছি। জনতা চুপ।
>
> — তুই নিয়েছিস ?
>
> —হ্যাঁ গো আমি। সরকার মশাই বললে কিনা, ওরে ফুলুট, আমার একটা উপকার করবি ? ...হনুমানের রূপোর গদা চাই, কেউ যেন না দেখে। পুরোহিতমশাই গাঁজা খেয়ে মন্দিরের গেটে তালা দিতে ভুলে গেছিল...'' [১৩৭]

মুহূর্তে জনতার রোষে চোর বলে প্রমাণিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইট দিয়ে ফুলুটের মাথায় প্রহার করে। পালান সরকারের প্ররোচনায় ও চক্রান্তে লাঠি পেটার ফলে সে অজ্ঞান হয়। হিন্দুর ছেলেরা তাকে প্রহার করেছে। এমনকি পালান সরকার চুরি করতে বলেছে— এ কথা ফুলুট বলার জন্য প্রহৃত হয়। বেইমানের প্রতিশোধ নিতে ফুলুট প্রহৃত হয়। আবার খালেদ মিঞাকে অর্থাৎ মুসলমানকে বাঁচাতে ফুলুট নিজেকে শেষ করে।

সিরিয়াস কেস বলে হাসপাতালের ডাক্তার ফুলুটের পরিচয় জানতে চায়। তিনকালে তার কেউ নেই। পালান সরকারের মিষ্টি দোকানোর কর্মচারী হলেও আজ তার পাশে কেউ নেই। নিজে প্রহৃত হয়ে

খালেদকে বাঁচিয়েছে ফুলুট। এই অপরিচিত ফুলুটের পাশে মানবিকতায় খালেদকে চেনা যায়। ডাক্তারকে সে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দেয়। ডাক্তার তিন বোতল রক্তের প্রয়োজনের কথা বললে খালেদ বলে— 'আমি আছি ডাক্তার বাবু... নিন কত রক্ত লাগবে'—রক্তের গ্রুপের কথা মনে করালে খালেদ ধরা গলায় চাপা কান্নায় জানায়—

> "গ্রুপ ? কিসের গ্রুপ ডাক্তারবাবু ? রক্তেরও কি জাতপাত আছে নাকি ?" [১৩৮]

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের 'গোরা' জাতপাতহীন উদারমনস্ক চরিত্র হিসাবে পরিচিত। মানব চক্রবর্তী ধর্মের ভেদাভেদকে দূরে সরিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামকে আড়াল করে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে মানবিক মূল্যবোধকে মর্যাদা দিয়েছেন। আর ভালোবাসার মাধ্যমে জাতিভেদকে দূরে সরিয়েছেন।

'কামেশ্বরের বিগ্রহ' একটি নিটোল গল্প। জনমজুর খেটে খাওয়া কামেশ্বর ও ফাগুনের সন্তানহীনতার অন্তরালে প্রতীকী হয়েছে পুকুর খোঁড়া ও কাঞ্চন গাছের প্রসঙ্গ। গল্পকার মাটিকে উৎপাদন শক্তির আধার হিসেবে গভীর ব্যঞ্জনায় মাটির জল ও মানুষের বৃত্তে মিলিয়ে দিয়েছেন। কাজ খুঁজতে আসা কামেশ্বরের পেশীবহুল চেহারা দেখে কথকের বাবার মন ভরে যায়। জঙ্গল সাফ,ঘাস চাঁছা, গাছ কাটা, গাছ লাগানোর কাজে দক্ষ কামেশ্বর খাঁটি মানুষ হিসেবে বাবুর কাছে ঠাঁই পায়। বাবুর দীর্ঘদীনের শখ পুকুর কাটার। দলছুট কামেশ্বর ও ফাগুন পুকুর কাটার কাজে রাজি হয়। বাবুর মতামত হল পুকুরে জল বের হলে তবেই পয়সা, তার আগে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা দেবে বাবু—

> "রাত্তিরে জলঢালা ভাত নুন মরিচ মেখে সকালে একপেট খেয়ে, মাঠে নেমে যায় কামেশ্বর- ফাগুন। শুরু হয় মাটি কাটা কাজ।" [১৩৯]

মাটি কাটার কাজ এক বর্ষায় শেষ হয় না। তাই বছরভর কাজ চলে কেবল বর্ষার কয়েকদিন বাদে। কিন্তু গাঁইতি চালিয়েও বালির দেখা নেই। এদিকে আনমনা ও ক্লান্ত ফাগুন যেন নারীত্বের মর্যাদা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ততায় ধরা পড়ে। কামেশ্বর খিঁচিয়ে ওঠে। সে বাবুর সামনেই ফাগুনকে তাচ্ছিল্য করে বলে—

> "কাজের সময় কেউ কারো বউ নয়। আমি খেটে মরছি, পাথ্থর ফুঁড়তে ফুঁড়তে জান কয়লা হয়ে যাচ্ছে, আর ও শালি কাঞ্চনগাছের মাটি খুঁড়ছে...ছুঁ...নখরামি" [১৪০]

কাজপাগল মানুষ ধীরে ধীরে আপনজনকে ভুল বুঝতে শুরু করেছে। মাতৃত্বের অভাবে জীবনযন্ত্রণা সংগোপন করে চলে ফাগুন। আর কামেশ্বর প্রত্যক্ষভাবে অপমান করে ফাগুনকে।

কামেশ্বর প্রাণপণে জল বের করার প্রচেষ্টা করে। রাত্রে, রৌদ্রে দুপুরে কাজ চালিয়ে যায় কামেশ্বর। একদিন ফাগুনকে না পেয়ে বারবার ডেকে শেষে দেখে কাঞ্চনগাছের গোড়া খুঁড়ে কুঁয়ো তোলা জল ঢালছে। এই দৃশ্য দেখে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এক চড় কষায় ফাগুনকে। আর তখনই জ্ঞান হারায় ফাগুন। থরথর করে কেঁপে তার শরীর নিথর হয়। মারা যায়। পুলিশ-কেশের ঝামেলা এড়াতে চেনাজানা ডাক্তারের কাছে ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে দাহ করা হয়। তারপর থেকে কামেশ্বর একা একাই বকে। দিনরাত গাঁইতি চালিয়ে জল বের করতে চায়। অবশেষে জলের সন্ধান পেয়ে কামেশ্বর আনন্দিত হয়,

বাবুকে জলের কাছে নিয়ে যায়। বাবু আনন্দে কামেশ্বরকে জড়িয়ে ধরে। কামেশ্বর তখন—

'বোবাচোখে চেয়ে আছে কাঞ্চনগাছটার দিকে।

পাথুরে মাটিতে গাছটা তখনও বেঁচে আছে।' [১৪১]

বিভূতিভূষণের 'পুঁইমাচা' গল্পে খেন্তির মৃত্যুর পর সুপুষ্ট পুঁই মাচাভর্তি হয়ে যেমন বিরাজ করেছে। এখানেই তেমনি মানব চক্রবর্তী দেখালেন ফাগুনের মৃত্যুর পর তারই হাতে লাগানো কাঞ্চনগাছটি পাথুরে মাটিতে বেঁচে রয়েছে। অথচ পুকুরে জল খোঁড়ার কাজে ব্যস্ত কামেশ্বরের জল বা গাছরূপী মন আগেই শুকিয়ে গেছে, মরে গেছে। বন্ধ্যা পুকুরে জলের আগমন বার্তায় বাবুর সাথে যে চুক্তি হয়েছিল তা মিটিয়ে দিতে চেয়েছে বাবু। পরিশ্রমের যথার্থ দাম দিতে চেয়েছে বাবু। কিন্তু কামেশ্বর কেঁদে জানায়—

"—বাবু বলেছিলাম ঠিকই। কিন্তু জলে আমার মুখ কই। যতবারই তাকাই। শুধু ফাগুনের মুখ ভাসে।" [১৪২]

এই দহন জ্বালা কেবল কর্মজীবনেই নয়, দাম্পত্য জীবনের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল, যা বাবু বুঝতে পারেননি। তাই মর্মজ্বালায় নিজের হাত কথা শোনে নি। কিন্তু কামেশ্বর জানে আসলে সে মারতে চায়নি। ভগবানই তাকে সরিয়ে দিয়েছে। সে বলে—

"মেয়েরা তো মাটি-ই, বটে নাকি। তিন বচ্ছর কোশিস করে করে আলা হয়ে গেলাম বাবু। যত খুঁড়ি, শুধু অন্ধকার। আর শেষমেশ ফাগুনকে আর সহ্য করতে পারলাম না। সব মেয়েছেলে কি আর মাটি হয় বাবু ? কিছু তো পাথর থাকেই। যা টুটে না। এ হল ভগবানের মার।" [১৪৩]

কামেশ্বরের শখ ছিল ছেলে পুলে হলে বাবুর কাছ থেকে সোনা চেয়ে সন্তানের মুখ দেখবে। তা আর হয়নি। অভিমানে রাগে নিজের ভাগ্যকেই দোঁহাই দেয়। গল্পকার নিটোল বয়ানে গল্পের আখ্যানকে সাজিয়েছেন। তাই কাঞ্চনগাছটাই আসলে কামেশ্বরের বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। আর তার ফুলগুলো গয়নারূপে প্রতীকী হয়েছে। আর জীবন্ত হয়ে রয়েছে কামেশ্বর ও ফাগুনের শরীরের আনাগোনা—

"জ্যোৎস্না রাতে হঠাৎ দেখলে মনে হয় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে সাদা শাড়ি পরে। তার নিচে কালো পাথরের মত একটা মানুষ। কামেশ্বর।" [১৪৪]

'দাগা' গল্পে চমকপ্রদ গল্প বলার দক্ষতা দেখিয়েছেন মানব চক্রবর্তী। অবক্ষয়ী সমাজের কদর্য রূপের সাথে মায়ামমতাময় সংসারে সন্তানহীন পুলিশের গোপন যন্ত্রণার ছবি ব্যক্ত হয়েছে। আখেরিগঞ্জ থানার বড়বাবু বনতুলসী রক্ষিত ও তার বউ সুশীলার নিঃসন্তান জীবনযাপনে টাকা পয়সার অভাব ছিল না; ছিল মানসিক শান্তির। ঊনত্রিশ বছরের চাকরি জীবনে জেলার থানায় থানায় ঘুরে সে জাঁদরেল ওসি—

"কত ডাকাতি মার্ডারের কিনারা করেছেন, কত ক্রিমিনাল-কে পেঁদিয়ে হাঁটুভাঙা-দ করে ছেড়েছেন, কত পকেটমার-গাঁটকাটার হাতের আঙ্গুল কুঁদো-ছেঁদা করে লুলা করে দিয়েছেন।" [১৪৫]

কিন্তু আখেরিগঞ্জ থানার ঘটনা তার জীবনে প্রথম অভিজ্ঞতা। আর সেইজন্যই লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে থানায় চা বিক্রেতার মুখের ভাষায় চমকে ওঠে থানার ওসি—

'কংসের কারাগারে যার জন্ম, তার নাম বাসুদেব হওনই ভাল, কি কন্ ছ্যার ?' [১৪৬]

ওসির কাছে রাষ্ট্রদ্রোহী কথাবার্তা হলেও ঘটনার বিবরণে লেখক পাঠককে আকৃষ্ট করে নেন।

শাকুলডাঙ্গাতে চোলাইয়ের ঠেকে একজন পুরুষের লাশকে কেন্দ্র করে কাহিনীবৃত্ত গড়ে ওঠে। আখেরিগঞ্জ থানাটি আধা-গ্রাম, আধা-শহর এলাকায় হলেও এখানে তেমন কোন অশান্তি ছিল না বলে ওসি জেনেছে—

''আগে ছিলেন শিল্পাঞ্চলের এক জমজমাট জায়গায়। আমদানিও ছিল প্রচুর। তার তুলনায় আখেরিগঞ্জ নুলো।'' [১৪৭]

শেষ জীবনে বদলির জায়গায় অচেনা মানুষদের মধ্যে তাকে নিয়ে সমালোচনা চলতেই থাকে। গল্পকার প্রশাসনিক কাজের সাথে যুক্ত শান্তি রক্ষার দায়িত্বে থাকা পুলিশের পেশার মানুষদের মধ্যেই ভালোমন্দের চর্চার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছেন। হাবিলদার বিরজু মহান্তির কথায় ওসির প্রকৃত স্বরূপ উঠে এসেছে—

''সেদিন বেড়াতে এসে ফাঁস করে দিল ভাণ্ডা। বলল, বড্ড খাঁক বেড়েছিল শালার। নামেই বনতুলসী। স্বভাবে রুস্তমজী। যাঃ শালা এবারে 'পানিশমেন্ট এরিয়ায়', আমড়া-আঁটি চোষ গে...'' [১৪৮]

চোলাই ঠেকের মেয়েটির ক্ষেত্রে তিনশদুই ধারায় কেশ দেওয়ার কথা ভেবেছে বনতুলসীবাবু। সে নাকি খুন করে ডেডবডির সামনে বসেছিল। রাত্রি দশটার সময় তাকে থানার লক আপে রেখে সাড়ে দশটা থেকে রাত এগারোটা অবধি অগুন্তি প্রশ্ন করেও উত্তর না পেয়ে বাড়ি গিয়ে মাছের ঝোল খেয়ে ঘুমিয়ে যায় ওসি। ভোর পাঁচটার সময় মেজবাবু দরজায় ধাক্কা দিয়ে জাগালে ওসি বলে—

''—কী ব্যাপার ?

—কেলেংকারির কাণ্ড স্যার। মেয়েটা টেসে গেছে।

— টেসে গেছে ? বলেন কি!'' [১৪৯]

কারাগারেই জন্ম মৃত্যু ঘটে যায়। ভোর রাতে পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়ে মেয়েটি মারা যায়। বাচ্চাটাকে মানুষ করার জন্য ওসিকে বলে চা বিক্রেতা দ্বিজপদ ও তার বউ ধানু নিয়ে যায়। বনতুলসীবাবু সিগারেটে স্বস্তির টান দিয়ে বলে—

''শোন দ্বিজপদ, বাচ্চাটাকে এখন তুমি রাখতে পার। কিন্তু যদি কখনও ওর কোনো রিলেটিভ এসে পড়ে বাচ্চা ফেরত চায়, তখন কিন্তু তোমায় ফিরিয়ে দিতে হবে।'' [১৫০]

অবশ্য বাসুদেব নাম নিয়ে ছেলেটি বছর দেড়েকের বয়স হয়। তার 'চোখা নাক, বড় বড় চোখ। এক মাথা কোঁকড়া চুল।' দেখে সকলেরই মন টলে যায়। বাসুদেব মাঝে মধ্যে থানায় ঢুকে লক আপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলের চেনা ছেলে বাসুদেব। বড়বাবুর বউ সুশীলার শরীর ভালো না থাকায় কাজের

বাড়ির কাজের লোক হিসেবে দ্বিজপদের বউ ধানু রাজি হয়। কাজের প্রথম দিনেই ছোট্ট বাসুদেবকে নিয়ে ধানু সুশীলার কাজে যোগ দেয়। বাসুদেব ঘুরে বেড়ায়। মাতৃত্বের গোপন যন্ত্রণায় অস্থির হয় সুশীলা। সামনে ফুটফুটে বাচ্চাকে দেখে তার অভাবী মন চঞ্চল হয়— 'মুখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুশীলা।' ঘুমের ঘোরে সে বকবক করে। সে শুনেছে বাচ্চাটার মা একটা খুনে, বেঁচে থাকলে ফাঁসি হত। তা সত্ত্বেও সুশীলার দরদ ভরা মায়ের মন বলে—

'—আহা, বাচ্চাটার কি দোষ! ও তো শিশু।' [১৫১]

নিয়ম রক্ষক বনতুলসী বাবুর কাছে এ সব কথার কোনো গুরুত্ব নেই। সে ভেবে রেখেছে রিটায়ার করে মোটা টাকা দিয়ে সোজা চলে যাবে হরিদ্বারের আশ্রমে।তার কাছে এই শিশুর মায়া 'ফালতুভাবনা'। কিন্তু সন্তানহীনা সুশীলা কাঁদতে থাকে— 'সে স্বামীর হাত ধরে মিনতি করে বলে, আমার যে বড্ড পুষ্যি নিতে ইচ্ছে করে বাসুদেবকে।' এই খুনের ছেলে যে খুনে হবে তা বলতে ছাড়েনি বনতুলসী রক্ষিত। দয়া মায়াহীন দাপুটে পুলিশের কাছে সুশীলার চোখের জলের কোন মূল্য নেই। তার কথা হল— 'এর চেয়ে একটা কুকুর পোষো, কাজে দেবে।'

থানার সমস্যা অনেকটা স্বাভাবিক, বলা ভালো শান্তিতেই রয়েছে বনতুলসী বাবু। কিন্তু পারিবারিক অশান্তি ক্রশম বেড়েই চলেছে। সুশীলা ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা খেলনা কিনে রেখেছিল বাচ্চার কথা ভেবে। বিকেলে ধানু বাসুদেবকে নিয়ে কাজে এলে সুশীলা বাসুদেবকে খেলনা দেয়। পাগলের মতো চুমো খায় বাসুদেবের কপালে। যা ধানু দেখতে পায়নি। গল্পের উপসংহারে গল্পকার দাপুটে পুলিশের দাম্পত্য সুখের সন্ধানের সাথে, মাতৃত্বের দীর্ঘকালীন যন্ত্রণার অবসান ঘটাতে চেয়েছেন। একদিকে আইন রক্ষক, সমাজ সংসারে সম্মানিত ব্যক্তি, অন্যদিকে মানসিক যন্ত্রণায় বিপন্ন হৃদয়। চা বিক্রেতা দ্বিজপদের সুখের সংসারের সাথে অর্থ, কীর্তির মোহে অন্ধ বনতুলসী রক্ষিত জীবন যুদ্ধে পরাজিত সৈনিক। অভাব থাকলেও সুখ শান্তি রয়েছে দ্বিজপদের। কিন্তু বনতুলসী বাবুর পরিবারে শান্তি বিরাজ করেনি। গল্পকার নাটকীয়তায় গল্পের সমাপ্তি এনেছেন—

> "স্তম্ভিত চোখে সবাই দেখল, খোলা বুকে শুয়ে থাকা সুশীলার স্তনবৃন্ত সজোরে কামড়ে ধরেছে ন্যাংটো বাসুদেব। প্রাণপণে চিৎকার করছে সুশীলা।" [১৫২]

তা দেখে বনতুলসীবাবু বাচ্চা বাসুদেবকে লাথি মারতে যায়। সন্তানহীন বনতুলসী রক্ষিতের প্রকৃত ভালোবাসা বেরিয়ে পড়ে। সুশীলা কাঁদতে কাঁদতে সামাল দেয়। বাসুদেবকে ধানু কোলে নেয়। বাচ্চাটিও প্রমাণ-করে সুশীলা প্রকৃত মা নয়। সুশীলার কথায় গোপন সত্য উদ্ঘাটিত হয়—

> "অইটুকুন বাচ্চা কি করে জানবে আমার এত্তো বড় বুকটাতে একফোঁটা দুধ নেই,
> শুধু পাথর...শুধু বিষ..." [১৫৩]

মানব চক্রবর্তীর গল্পে বিশৃঙ্খল পায় শৃঙ্খল, প্রতিফলিত সম্ভাবনাময় জগত বিকশিত হয়, অবক্ষয়ের দাপট সত্ত্বেও কৌণিক অংশে আলোর শিখা পৌঁছে দেন, নতুন বার্তা ছড়িয়ে দেন সন্দর্ভের অন্দরে, আর চাক্ষুষ মানুষের ছবি আঁকেন, সামাজিক ক্লেদ ও হিংস্রতার মধ্যেও ভালোবাসার বার্তা বাহিত হয়।

নলিনী বেরা

নলিনী বেরার গল্প বাংলা সাহিত্য সৃজনের ক্ষেত্রে একটি প্রশস্ত পথ তৈরি করেছে। তাঁর গল্প সত্তরের দশকের উত্তাল বাংলার ভয়াবহ সমাজ ও রাজনীতির পথ পেরিয়ে বাংলা গদ্যের সৃষ্টিশীল ও পরীক্ষামূলক প্রয়াস পেয়েছে। আর বিচিত্র সমাজ, বিকৃত ও বিকলাঙ্গ সমাজ-দেশ-কালগত দৃষ্টিবিন্দু যেন দৃশ্যশিল্পের মতোই একটি স্থানিক অবস্থান থেকে সময় ও সমাজের সমস্যাকে চিত্রিত করেছেন লেখক। এই স্থানিক ও কালিক দৃষ্টিবিন্দু নির্ভর গল্পের ভিতর ভুবনে দেশকালগত অসহায় নিরীহ অশিক্ষিত কিংবা অর্ধশিক্ষিত নিয়তি নির্ভর মানুষগুলি পৌরসমাজ থেকে দূরে জীবনকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

নলিনী বেরার গল্পের চরিত্রগুলি গ্রাম্যজীবন কেন্দ্রিক। কখনো বা নগর জীবনে বসবাসের সুবাদে শহর ও গ্রামের যোগসূত্রে দোটানায় জীবন স্থিতু হতে চেয়েছে হয় শহরে নয়তো গ্রামে। তবে পল্লীপ্রকৃতির অনাবিল ও উদার স্নেহ, সুশীতল বাতাস ও সুমধুর মেঠো সুর, গাছপালা নদীনালার দিগন্ত প্রসারিত মানুষজনই তাঁর সৃজনভাবনার অন্তর্বীজ। সেই মানুষেরা অশিক্ষা ও দারিদ্র্যে স্থবির, নয়তো অনাহারে রুগ্ন। তবুও তাদের সদাজাগ্রত গোপন ও দুঃখী মনের সত্য অভীপ্সাগুলিকে নিরাভরণ ভাবে চিত্রিত করেছেন, অনুসন্ধান করেন নি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মতো পর্যবেক্ষণে না গিয়ে জন্মভূমির স্বজনদের বাস্তবতাকে ঘর গেরস্থালির সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনার অনুভূতিকে বিনম্র ছবিতে নির্মাণ করেছেন। এই নির্মাণ তথা অন্তেবাসী মানুষদের জীবন কথা সাহিত্যের নানান শাখায় ত্রিশের দশক থেকে উঠে আসছে। তবে এই বিশ্বায়নের যুগেও নলিনী বেরা গল্পের চরিত্রদের পরিপাটি করে পথ হাঁটিয়েছেন। আর শিল্পময় সংস্কৃতিময় সচেতন মানুষজনের পাশে অচেনা মানুষদের অল্পায়ু জীবনকথাকে, সামান্য চাহিদা ও অতৃপ্তির অশান্তময় সমাজকে বাঙ্ময় করেছেন। আর বাংলা বর্ণমালা দিয়ে নিপুণ শিল্পীর ন্যায় নিঃস্ব হতশ্রী গ্রামের ছবি এঁকেছেন। সুবর্ণরেখা নদী, ডুলুং নদী, জেঠতুতো ভাই ক্ষিতীশের কথা, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যেবেলা বেড়াকীর্তন বা নগর কীর্তন, কাড়া-শিং-ফুঁকা বাবাজী কিংবা হ্যাট-কোট পরা ভবানী ডাক্তারকে দেখে ভয় পাওয়া, সরস্বতী প্রতিমার মতো টুকুরাণীকে দেখে ফুল ফোটার শব্দের মতো অনুভব, নদী পেরিয়ে রোহিণী গ্রামের বড় স্কুল-হোস্টেলে দিন কাটানো, হাঁফিয়ে ওঠার পর গ্রাম দর্শন— 'হরিমন্দির, শীতলা মাড়োর থান, খড়ের গাদা, খামারে ডাঁই করা চিনে বাদামের ঝাড়, রোদে শুকোচ্ছে, তখনও ঝাড়া হয়নি। গ্রামের আশেপাশে মুগচনার খেত, বেগুন-বরবটির খেত।' হোস্টেলের বন্ধুদের সাথে গ্রাম দর্শনের অভিজ্ঞতা নিয়ে নদীর ধারের পাঁচ কাঠা জমি জলের দরে বিক্রি করে মেদিনীপুর কলেজে বাংলা অনার্সে ভর্তি হওয়া, তিনমাস পরে বাংলা ছেড়ে ফিজিক্সে ভর্তি হওয়া, অবশেষে পড়া ছেড়ে মেদিনীপুর ছেড়ে ঝাড়গ্রামে থিতু হয়ে বলেন— 'এই শহরেই আমি মাটি কামড়ে পড়ে থাকব।

কারোর বাড়িতে খাটা-পায়খানা পরিষ্কার করার কাজ নেব, রাস্তায় ঝাড়ুদারের কাজ করব, সেই থেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েই অভাব ও কর্মহীন জীবনকে অনুভব করেছেন। এমনকি সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ও-ডি-বি-এল' বইটা হোটেল মালিককে দিয়ে বলেছেন— 'বইটা রেখে আজকের মতো খেতে দিন।' না, তিনি খাবার পাননি, পেট ভরানোর উপায় খুঁজে পাননি কিন্তু পেয়েছেন জীবন যন্ত্রণাময় নানান অভিজ্ঞতা, যা তাকে লেখার রসদ যুগিয়েছে—

> "এইসব ছোটখাটো রাগ-অনুরাগ, মান-অভিমান, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, পাপ-পুণ্য বোধ থেকেই আমার লেখালেখি। তাছাড়া যে জায়গায় জন্মেছি, তার ভূগোল ভূ-প্রকৃতি আবহাওয়া জলবায়ু মানুষজন। সবই কেমন যেন অদ্ভুতুড়ে। অন্তত আমার কাছে। সেখানকার নদ-নদী পাহাড়-টিলা, বন-ডুংরি, বট-অশ্বত্থ-চল্লা-চুরচু-শাল-পিয়াশাল গাছেরা আমার সঙ্গে কথা বলে, হাঁটে। ...মেয়েরা হাটে বাজারে-গ্রামে-গঞ্জে 'কুরকুট পটম' অর্থাৎ ডিমওয়ালা লাল পিঁপড়ের চাক বিক্রি করে। তেল-নুন মাখিয়ে শিলে বেটে, পাতায় মুড়ে, পোস্ত পোড়ার মতো পুড়িয়ে খায়। ...তো এরা সবাই আমার আত্মীয়, বড় আপনার জন। এদের ছেড়ে শহরে এসে, মাঝে-মাঝেই মনে হত, তারা সব কোথায় পড়ে আছে একলা, একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। লেখার ভিতর দিয়ে সেই দ্বীপের সঙ্গে, সেইসব মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করি।" [১৫৪]

আসলে জীবনের অভিজ্ঞতা নয় বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতাকে গল্পের ভুবনে ধরতে চেয়েছেন নলিনী বেরা। শিল্পের প্রয়োজনে তাঁর গল্পে অন্তেবাসী মানুষের ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্যকর জীবনীশক্তি নির্ভর নিঃস্ব মানুষগুলি কেবল বিষয়ী হয়েছে তা নয়, তাদের দৈনন্দিন জীবন কথা বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও অস্তিত্বের নিখুঁত বিবরণ যেন গল্পের মধ্যে ঠাঁই পেয়েছে উপস্থাপনা ও স্বাতন্ত্র্যের গুণে।

'হোমগার্ডের জামা' গল্পটি এক চমৎকার স্মৃতি মেদুরতাময়। যৌথ পরিবারের ভালো লাগার দিনগুলি মনে করায়। এ গল্প বুঝিয়ে দেয় পৃথগন্নের একাকিত্ব কতটা যন্ত্রণাময়। প্রতীকধর্মীতায়, অতৃপ্তিবোধে গল্পের নামকরণ চমৎকার ভাবে প্রাণবন্ত থেকেছে। সমাজ সংসারের অভাব অনটনের দৈনন্দিন ছবিকে পরিপাটি করে উপলব্ধির গভীরতায় গল্পকার সাজিয়ে দিয়েছেন। গল্পে ছোটকাকা ও ছোটকাকি চরিত্র যেমন প্রাণবন্ত হয়ে গ্রামীণ জীবনের প্রতিনিধি হয়েছে তেমনি ছোটকাকা চাকরি না করার জন্য অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখময়তায় আমরাও যেন কাতর হই। গভীর বিষণ্ণতায় ডুব দিয়ে পাঠকও এগিয়ে যায় কাহিনির উজ্জ্বল কিনারে। বলা ভালো অনুজ্জ্বল ছায়াময় প্রান্তে পাঠককে যে পথ দিয়ে যেতে হবে তা নলিনী বেরার প্রত্যক্ষ জীবনাভূতির পথ। পাঠক তৃপ্ত হন সমৃদ্ধ হন জীবনদর্শনে, হোমগার্ডের H.G. লেখা অংশের মরচে পড়ার অকপট পিঙ্গল দাগের কথা ভাবলে। এক পুরুষের জীবন বৃত্তান্তের মধ্যে বেঁচে থাকা ছোটকাকির কাছে ছোটকাকার জামাটুকুই সম্বল। যেখানে লুকিয়ে রয়েছে— "আমাদের ছোটকাকা, মেজোকাকা, একটা গোটা পরিবার, একটা গ্রাম..."

এখানেই গল্পের শেষ টেনেছেন, আর চিনিয়ে দিয়েছেন সমাজের মধ্যে অর্থনৈতিক সংকটের ছবিকে ও গ্রাম বাংলার পরিবারের ভাঙনকে।

'ভূতজ্যোৎস্না' গল্পটি যথেষ্ট তাৎপর্যে মন্ডিত। এই গল্পের উৎস ও রচনার প্রাক্‌কথন সম্পর্কে 'ভূতজ্যোৎস্নার ইতিকথা' নামক প্রবন্ধে লেখক বলেছেন—

> "আমরা জনাকয়েক একদিন আষাঢ়ের শেষবেলায় সীতানালা খালের মোহনায় সুবর্ণরেখা নদীধারে বসে আছি।...জলের ফেনার উপর কালো পিঁপড়ের সারি দেখে মুরুব্বী-মাতব্বরেরা বলতে শুরু করেছেন, রাতের দিকে নদীর জল আরো বাড়বে।...আমাদের গ্রামের মাছমারা জন্মেঞ্জয়ের বাপ সুরেন্দ্র বা 'সরিন্দর' ভুসাচিংড়ির লোভে 'চারাগোড়িয়া' জাল পেতে খালের জলে দাঁড়িয়ে আছেন সেই দুপুর থেকে, তাঁকে জাল ওঠাতে সাহায্য করছেন আমাদেরই গ্রামের বাণীকান্তের বাপ কংসহরি বা কংসরি।'...সরিন্দরের কিছু হয়েছিল কী না জানি না, ভূতগ্রস্ত জ্বরগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম আমি নিজেই।" [১৫৫]

আধিভৌতিক প্রসঙ্গ এনে গল্পকার এখানে জীবন-মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে, উপনীত হয়েছেন। আসল নকলের সংঘাতে, অস্তিত্ব সংকটের ঘূর্ণাবর্তে চরিত্রগুলি দিশাহারা। ভূতজ্যোৎস্নার বর্ণনায় কাব্যময় ভাষা বেরিয়ে এসেছে—

> "বাঁশঝাড় পেরিয়ে চাঁদ এখন ওপরে উঠেছে, খাড়া জ্যোৎস্না এসে পুকুরের জলে পড়েছে, গুঁড়ো গুঁড়ো হলুদ চাঁদের রেণু মাঝপুকুরে ঝরে পড়ে গুলিয়ে যাচ্ছে।" [১৫৬]

এই গল্পে সৃষ্টিধর আগুয়ান ছোট ছোট পাঁঠা-বাচ্চার অণ্ডকোষ কেটে 'খাসি' করে। বিনিময়ে গৃহস্থের বাড়ি থেকে 'সিধে' পায়— 'এক থালা সিদ্ধ চাল, একটা আলু, একজোড়া হলুদ মাখানো পান-সুপারি আর দক্ষিণা বাবদ আড়াইশো কি তিনশো গ্রাম পোস্ত খোল।' বিস্ময়ের বিষয় এই অভাবী মানুষটি সেক্সপিয়রের ওথেলো জানে, তাছাড়া ভ্যানগগ, পল গঁগ্যা, মাতিস বোঝে। তাই তাঁকে বোঝেন গ্রামের বড় স্কুলের হেড-মাস্টার শ্রী অমূল্যধন দে ডবল এম.এ.। এই সৃষ্টিধরের কাছে হেডস্যার অনুগ্রহ প্রার্থী কেবল ইংরেজী অনুবাদের জন্য।

গল্পে এক অপ্রার্থিব জ্যোৎস্না রাতের বর্ণনা আছে। চাঁদের আলো যেন গুঁড়ো হয়ে জলে ভাসে— জ্যোৎস্নার ঘর। সরিন্দর, কংসহরি, সৃষ্টিধর, অনন্ত, নাকো হাড়ির বউ-সবাই যেন চাঁদের মায়াবী পরিমন্ডলে ঘুরে বেড়ায়, পারস্পরিক সম্পর্কের বৃত্তে বিভাজিত হয়। লোকবিশ্বাসের কারণে সরিন্দরের কাছে কংসহরি ভূত কিংবা কংসহরির কাছে সরিন্দরও ভূত বলে সন্দেহ হয়। এই সন্দেহের আবহেই গল্পকার গল্পের ইতি টেনে দেন— "এরকম ঘটনা যুগপৎ অনন্ত প্রবাহে ঘটতে লাগল।"

'শীতলামঙ্গল' গল্পের সনকা এক জীবন্ত চরিত্র। বিয়ে দিতে না পারার জন্য অর্থাৎ পাত্রস্থ করতে সমস্যা ঘটায় সমাজের প্রতি ধিক্কারের ছবি দেখা গেছে। জটিল সমাজ জীবনে হিংসা ও পরশ্রীকাতরতায় অস্থির মতিত্ব গল্পের কথক তথা উত্তম পুরুষের জবানীতে লেখক স্বয়ং যেন সমাজের প্রতিনিধি বলে নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন। আর তাঁরই অনুভবে গল্পের শেষে ব্যক্ত হয়েছে সমাজের পঙ্কিলতার আবর্তের কথা— 'জানি জানি, দাদা অনাদিই ইচ্ছা করে ওইসব লিখে বোনের বিয়েতে ভাঙচি দিয়েছে ?

মনে পড়লে অন্তর ব্রহ্মাণ্ড থরথর করে কেঁপে ওঠে। ভিতরে কোথাও যেন একটা ধারালো ব্লেড খরখর কেটে চলেছে।' হবু জামাইয়ের বিরুদ্ধে পিটিশান হওয়ায় বিয়ে ভেঙে যায়, সনকার অবিবাহিত জীবন যেন হাহাকারে পরিণত হয় গ্রামীণ সমাজের প্রতিশোধ স্পৃহায়— 'হায় রে ভিলেজ পরিটিক্স! হায় রে গ্রাম্যতা।' গল্পকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা— 'গ্রামে ঘরে হাতের লেখা ভালো হবার হ্যাপা কত!' কেননা অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিটিশানটা লিখেছিলেন গল্পের কথক। এক অতৃপ্তির বোধে কথক সমাজের নিয়মকে ও প্রতিহিংসাকে মর্যাদা দিয়েছেন।

'বর্ষামঙ্গল' গল্পে প্রকৃতির অনুষঙ্গে মানবিক আবেদন মূর্ত হয়েছে। ছোটগল্পের স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যে দীর্ঘ অবয়বে গল্পের বিন্যাস রয়েছে। আর নামকরণের সাথে সামঞ্জস্য হয়েছে বৃষ্টি ও বর্ষাকেন্দ্রিক নানান ঘটনার সমাবেশ। পরমেশের পরিবারের অভাবের একটি ছবি নিলে ১৯৯৩ সালে গ্রামের অর্থনৈতিক ও খাদ্য-উপাদানের পরিচয় পাওয়া যায়। একটানা বৃষ্টির পর মাটির তলা থেকে অজস্র পোকা বেরিয়ে পড়তেই— "পরমেশের মা-কাকিমারা ছা-ছানাদের হাতে একেকটা বাঁশের টুকরি, ঝড়া-পাছিয়া গছিয়ে দিয়ে বলেছিল— যা, যত পারিস শালুইপোকা ধরে আন, নুন মাখিয়ে খইয়ের মতো ভেজে দিব, খাবি!"[১৫৭] এই লোকখাদ্যই বেঁচে থাকার একমাত্র উপায়। আবার অলৌকিক শক্তির প্রতি বিশ্বাসের কারণে ভীত পরমেশরা রাত্রে জেগে থাকে। ঘন বর্ষার মতো যৌবনের বসন্তে রাজপুত্রের কাছে (পরমেশের ছোটকা) রাজকন্যাদের সমাবেশ ও সহবাস— এক অসাধারণ যৌবন কাহিনি জমিয়েছেন গল্পকার। অনবরত বৃষ্টি আর হলহলিয়া সাপের আগমনে পরমেশের পরিবারটা আঁতকে উঠেছিল। দমকা হাওয়া আর বৃষ্টিতে বিপ্রতীপতায় ও মানবিক বীর্যপাতের দ্যোতনা সৃষ্টি করে চিরন্তন প্রকৃতি ঋতুর পরিচয় তুলে ধরেছেন গল্পকার— "রাত বাড়ে। রাত ফুরোয় না। আরো ঘন করে বৃষ্টি আরম্ভ হয়। এ বৃষ্টি থামে না।"[১৫৮] ঋতুচক্রের আবর্তে এ গল্প ভিন্ন স্বাদের। পাঠকের কৌতূহলকে জাগিয়ে রাখে। আর লোককথা, গান, ছড়া, লোকবিশ্বাসের সমাবেশে এ গল্প চিরকালীন হয়েছে।

আবার 'হাঁসচরা' গল্পে দ্রুত সমাজ পরিবর্তনের সাথে চেনা পথ ঘাট অচেনা মনে হয়েছে কিশোরপুরের বিনয়েন্দ্র-র। জন্ম গ্রামের স্মৃতি নিয়ে দূরে চাকরি করলেও নষ্টালজিয়ায় তাঁর মন ডুবে থাকে প্রশান্তিতে। স্মৃতি যে সুখের হয় শান্তি দেয়, পরম মমতায় লেখক ফেলে আসা দিনগুলোকে ছুঁতে চেয়েছেন হাঁসচরা, হাঁসবনি ইত্যাদি গ্রামীণ জীবনকেন্দ্রিক স্থানগুলোয় বসবাস সূত্রে। পরিবর্তনশীল সমাজে কথক একাকী হয়ে বিপন্নতা বোধ করেন। আর স্মৃতি মেদুরতায় ডুব দিয়ে বাঁচতে চান— 'বাস থেকে নেমে ভেবেছিলাম। হাঁসচরায় যেতে অনেক সঙ্গীই পেয়ে যাব। দু-চারজন কিছুদূর এসেও ছিল। তারপর এদিক ওদিক হয়ে গেল। এখন আমি একা। একা একাই একটা নদী পেরিয়ে হাঁসচরায় উঠে যাব। নদী পেরোনোর সময় ভূতের প্রসঙ্গ কিংবা সতীশ রাউতের পাঠশালা, গিরিবালার কীর্তন— 'মরিব মরিব সখী নিশ্চয় মরিব, আমার কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়া যাব, কারে দিয়া যাব গো।' দরদীয়া সেই গানের সুরেই গ্রামীণ জনজীবন প্রাণবন্ত থাকে। এখানেই গল্পের ব্যঞ্জনা অন্য মাত্রায় পৌঁছে গেছে।

'আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ' গল্পের শুরুতেই যাত্রার প্রসঙ্গ রয়েছে। গ্রামীণ সমাজ জীবনে যাত্রা নামক বিনোদন ব্যবস্থা খুবই জনপ্রিয়। 'যাত্রাদলের ম্যানেজার ভবা দাশের চাপাচাপিতে বাণীকান্ত

ফিমেল সেজে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল একেবারে।' আর বঙ্কু একবছর রাণী তো একবছর রাজা সাজে, বাণীকান্ত এবারে ফিমেল তো অন্য বারে মেল, সত্য এবারে সীতা তো অন্যবারে রাম সাজে। লেখক গ্রামীণ সমাজ জীবনের ছবি এঁকেছেন—

> "আশ্বিন কার্ত্তিকে আমাদের গ্রামে আসো যদি তো দেখবে, পায়ের বুড়ো আঙুলে টিপনী রেখে খড়ের দড়ি পাকাচ্ছে ভীম। ন্যাকড়ায় খড়ের পুঁটলী বেঁধে আলতা দিয়ে গদার চোখ এঁকে নিচ্ছে জয়দ্রথ। মুচকি হেসে একজন আরেকজনকে টার্গেট করে পাট মুখস্থ বলে যাচ্ছে জলের মতো—
>
> আয় আয় রে পামর! আমি রণে
> একজন ধরা হতে লইবে বিদায়—
> হয় ভীম নয় জয়দ্রথ।" [১৫৯]

গল্পকার চেনা গ্রামের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছেন বেশ কয়েকটি চরিত্রের (ভবা দাশ, বাণীকান্ত, সত্য, শ্রীমন্ত, কেদার, বিমলা, পিওন, বঙ্কিম বধুক, হিজড়ে পুটুরাণী, ভজহরি ও তার ছেলে) মাধ্যমে।

গ্রামের বাণীকান্ত যেমন যাত্রাদলের ফিমেল সাজার সখ তেমনি শ্রীমন্ত কেদাররা যাত্রার নেশায় সারা বছর মজে থাকে। সেন্টার পরীক্ষায় ডিস্ট্রিক্ট ফার্স্ট হয় বিমলা দঁড়পাট। সেইগ্রামের পোস্টাপিসে কালীপ্রসন্ন ডাক-হরকরা ও পিওনের কাজ করে বঙ্কিম বধুক। অশৌচ জামাকাপড় কাচে সুবোধ শীট, কলকাতায় চাকরি করে চুনারাম বেহেরা, এর বাবা নিত্যানন্দ; যার "কথায় কথায় 'হয়তো' বলা মুদ্রাদোষ, ঐ হেতু গ্রামসুদ্ধু লোক বলে 'হয়তো' বুড়ো।" মরা মানুষের ভাত জ্যান্ত মানুষের পেটে গেলে মানুষটি বাঁচে কিনা এমন অবান্তর অঘটন ও অনটনের কথা পাওয়া যায় এই গল্পে। হারু বেহেরার 'আশ পালনার' ভাত-মাংস মাঠের মধ্যে হাঁড়ির ভেতর পেয়ে ভজহরির অভুক্ত ছেলেটা পেটপুরে খেয়ে "চোখ দুটো আহ্লাদে বুজে এল।" কিন্তু এমন ভাত খেলে মানুষ যে বাঁচে না যখন জানতে পারল তখন ভজহরি এক সার্থক ওঝার আখড়ায় নিয়ে গিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে। গল্পকার বিচিত্রসব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা গল্পের পাতায় পাতায় তুলে ধরেছেন। আর গল্পের শেষে যেন বলতে চেয়েছেন— আমার কথা ফুরলো নটে গাছটি মুড়লো— "আর বিশেষ কী বলব ? —এই আমাদের গ্রাম, আওয়ার ভিলেজ। আমাদের গ্রামের রকম-সকমই এই!" গল্পকার প্রত্যেকটি চরিত্রের সাথে, সামাজিক আদব কায়দার সাথে নিজেকে যেন জড়িয়ে দিয়েছেন। আর ছড়িয়ে দিয়েছেন শিল্পের বন্ধনে গ্রামের জীবন কথাকে।

'বড়া ভাজা, কটা চোখ ও বঙ্কিম বধুকের গল্প' নামক গল্পটিতে দীর্ঘ নামকরণের মধ্যে মানবিকতার স্পর্শ, কুসংস্কারের চেতনা রয়েছে। গল্পকার গতিময় ও সাবলীল ভঙ্গিমায় চেনা মানুষগুলিকে দীর্ঘ অদর্শনের পর পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন। এমনকি গ্রামের ও মানুষজনের যে বদল ঘটেছে তা নলিনী বেরার গল্পে ধরা পড়ে— "গ্রামের সে চেহারা আর নেই। ফ্রি প্রাইমারী কে টেক্কা মেরে জুনিয়র হাই হয়েছে। হয়েছে একটা পোস্টাপিসও। এখন অক্লেশে Vill+P.O. লিখে গ্রামের নামটা লিখে দিলেই হল।"[১৬০]

এখানে 'ডাইনী' নামক কুসংস্কারের কথা আছে। আছে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্ন। নেই প্রতিবিধান বা সাহসের কথা ? সামাজিক বিশ্বাসের চিরন্তন সত্যতাকেই এখানে তুলে ধরেছেন গল্পকার। ঠিক যেমনটি ছিল তারাশংকরের ডাইনী কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর 'ডাইনী' গল্পে সামাজিক অবক্ষয়ের ছবি। গল্পকার নলিনী বেরা চেনা মানুষের প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার সাথে নিজের অচেনা ও অদেখা বিষয়গুলিকে ছুঁতে চেয়েছেন। তাই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির বেঁচে থাকা, ঘোরাফেরা ও সংলাপের মধ্যে যেন নানান অনুষঙ্গ জড়িয়ে রয়েছে।

'পুষ্করা' গল্পে রয়েছে চরম কুসংস্কারের সাথে অর্থহানির প্রসঙ্গ। টিকিধারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কবলে পড়ে গ্রামের একটি পরিবারের সর্বসান্ত হওয়ার কথা গল্পকার 'পুষ্করা' নামক একটি অলৌকিক বিশ্বাসের প্রসঙ্গ এনে গল্প জমিয়ে দিয়েছেন। অর্থাভাবের সংসারে অলৌকিক শক্তির দাপটে পরিবারের অমঙ্গল সাধন আটকাতে গ্রামের নিরীহ মানুষের ঐক্যবদ্ধতা ও প্রতিকারের উপায়ের কথা যেন গল্পকার কাঁচি দিয়ে টিকি কাটার উপস্থাপনের মধ্যে বুঝিয়ে দিয়েছেন। পুরাণ কথায় যজ্ঞের প্রকৃত পদ্ধতি বাস্তবতায় নতুন মাত্রা পেয়েছে এই গল্পে।

'শতরঞ্জি' গল্পের কাহিনিতে গ্রাম্যজীবনের ক্ষুদ্র স্বার্থপরতা, সংকীর্ণতা ও জাতপাতের প্রসঙ্গ রয়েছে। কাবুলিওয়ালার চরিত্রের আগমনে গল্পের একমুখীনতা চূড়ান্ত মর্যাদা পেয়ে ছোটগল্পের সংরূপ রক্ষা করেছে যেন। সুধন্য চরিত্রটি কলকাতা শহরে ঘরসংসার পেতে মজে থাকে। সে গ্রামে যায়নি অনেক বছর। কিন্তু পুরনো নস্টালজিয়া সক্রিয় থাকে। আর এই নস্টালজিয়াকে বাঁচিয়ে রাখে অফিসের গ্রুপ 'ডি' কর্মী; একই গ্রামের ছেলে সত্যেন। একদিন ওর কাছে শোনা যায় বাছুরখোয়াড় গ্রামে অষ্টপ্রহর সংকীর্তনের আসর। গ্রামে এত বড় অনুষ্ঠান। তার উপর স্ত্রীর তাড়নায় সুধন্য দেশে ফিরে এসে কীর্তনের আসরে চলে যায়। গ্রামের আসরে তখন কলকাতা থেকে কেনা নতুন ও রঙিন বড় বড় সাইজের শতরঞ্জির প্রতিযোগিতা চলছে। শতরঞ্জির বহর ও সাদৃশ্য যার, মালিকানার দিক থেকে ইজ্জতও তার। যার বা যাদের শতরঞ্জি গ্রামের নানান পালাপার্বণে বিয়ে-সাদি বা অন্যান্য পারিবারিক, সামাজিক অনুষ্ঠানে কতবার কত বেশি টাকায় ভাড়া খাটায়, তাদের মধ্যেই চলে প্রতিযোগিতার দ্বন্দ্ব।

একবার গ্রামের নামকীর্তনে সকলের প্রবেশ অবাধ থাকায় হই হট্টগোলে গরু ছাগলও ঢুকে পড়েছিল। কারও হুঁশ ছিল না, সবাই বিভোর থাকল পালাগানে। অতর্কিতে অগুনতি নারীপুরুষের ভিড়ে ধুন্ধুমার কান্ড বাঁধলে, শতরঞ্জিগুলো মানুষের নাগাল ছাড়িয়ে যেন উড়তে লাগে। প্রাথমিক ধাক্কায় হতচকিত সুধন্য বুঝে উঠতেই পারেনি কি হয়েছে ? হুঁশ হতে সে দেখল, যে শতরঞ্জি গুলোর ওপর দিয়ে গরু-ছাগল চরে বেড়াতে পারে তার উপর দিয়ে 'মোঘিয়া' সাজ্জাদ (কাবুলিওয়ালা) ঘাতক খুঁজতে ঢুকে পড়েছে জনতার মাঝে। এদিকে জনতা মারমুখো হয়ে পড়ল, আসন অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কায়। সমাজের বিধি রক্ষার জন্য প্রতিবাদী শক্তি নিয়ে শতরঞ্জিগুলো টাঙি বল্লমের চেয়েও যেন ক্ষুরধারও ও তীব্রতর। একটা ঘূর্ণিঝড় তুলে উড়ে উড়ে চারপাশ থেকে জাপটে ধরতে চায় লোকটাকে। এদিকে সাজ্জাদ (কাবুলিওয়ালা) পালাতে থাকে, প্রাণভয়ে দৌড়য়, সে বাঁচতে চায়। বাঁচার দম যেন ফুরিয়ে আসে, ঘূর্ণি হাওয়া তীব্রতর হয়।

গল্পের এই একমুখীনতা পাঠককে অবশ্যই কৌতূহলী করে। কিন্তু গল্পের সমাপ্তি অংশ যেন অসংগতি ও অস্বাভাবিকতায় ডুবে যায়। হাল্কা চালে নিছক জীবনসত্যকে যেন ধীরে ধীরে পাঠকের জীবন সত্যে পৌঁছে দিয়েছেন নলিনী বেরা। ফলে শিল্পের নিরিখে এই আতিশয্য যেন ভিন্নতর কোনো সত্যে পৌঁছে দেয়। যা অধিকতর বাস্তব। আসলে জাগতিক ঘটনা-অঘটনের প্রতিক্রিয়ায় জীবনের দুঃসহ তিক্ততা বা মানবেতিহাসের চরম লাঞ্ছনায় যদি কোনো শিল্পী সত্তা গভীরভাবে আন্দোলিত হয়, বিরূপ পরিবেশে বিষাক্ত পরিমন্ডলের মধ্যে যখন কোনো ব্যক্তি দ্বিধা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয় তখন তার কাছে বিষয় গৌরব ঐতিহ্য আধিপত্য তুচ্ছ ও নগণ্য মনে হয়। কৌতুক রসাবেদনের ছলে, পরিহাসের হালকা আস্তরণে হয়তো সুদৃশ্য রঙিন সব শতরঞ্জির আবরণ পাঠককে স্তম্ভিত করে। একটা গভীর অনুভবের প্রদেশে আমরাও যেন পৌঁছে যাই নিজেরই অজান্তে। এভাবেই নলিনী বেরা ছোটগল্পের নিরবয়বকে মূর্তিমান করে তোলেন। এখানেই তাঁর সার্থক সত্তা জীবন শিল্পীসত্তায় প্রাণবন্ত রয়েছে।

নলিনী বেরার শিল্পীসত্তার সমগ্রতা জুড়ে গ্রাম বা পল্লী প্রকৃতির রূপ বিরাজ করেছে। আকাশ, মাঠ, গাছ-পালা-পশু-পাখি-নদী-নালার দিগন্তপ্রসারে মানুষই তাঁর সৃজন ভাবনার শক্তি। 'এই এই লোকগুলো' গল্পের কথক স্বয়ং লেখক নান্টু। এখানে পাঁচ-ছয়টি চরিত্রের মাধ্যমে জীবনের নানান অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত হয়েছে। সমাজের নানান মানুষের পেশা ও ব্যবহারের সাথে বেমানান দেখা গেছে। তাই লেখকের রাগ থেকে গেছে আজীবন। যেমন—

১) প্রমথ পরামানিক জুতসই চুল কাটতে পারেনি বলে 'সেই প্রমথর ওপর আমার রাগ।'

২) টিউশনের ছাত্রী ইলা-শীলার মাকে খুশি করার জন্য মিথ্যা গল্প বাঁধিয়ে ছিল নান্টু। কিন্তু হংসীবধুক বলে দেয় যে নান্টুর বক্তব্য আসলে মিথ্যা আভিজাত্যে ভরা। তাই ইলা মুখ ফিরিয়ে নেওয়ায় হংসীবধুকের ওপর নান্টুর রাগ জন্মায়।

৩) ঝাড়গ্রামে রিনতির সাথে প্রেম প্রেম খেলায় মিথ্যা বড়লোকের পরিচয় দিতে গিয়ে নিকুঞ্জ সাইকেলিয়ার কথায় সব সত্য প্রকাশ পায়। তখন থেকে 'রিনতিদের বাড়ি আমার বিসর্জন হয়ে গেল। নিকুঞ্জ, শয়তান নিকুঞ্জ।

৪) বাসের কনট্রাক্টরকে পয়সা দিতে না পারার জন্য জনতার কাছে অপমান সহ্য করতে হয়েছে নান্টুকে। সেই থেকে কনট্রাক্টরের ওপর রাগ জন্মেছে।

৫) জগন্নাথের 'পাইস সিস্টেম' হোটেলে জমিদারের ছেলের পরিচয় দিয়েছিল নান্টু— 'মেদিনীপুরে পৃথ্বিরাজ সিং মান্ধাতার আমল থেকে আমাদের জমিদারী। এখনও এস্টেটের আয় বছরে দশ লাখ টাকা'। একথা শুনে জগন্নাথ কয়েকমাস ধরে ধারে খাওয়ায়। কিন্তু নান্টু ধার শোধ না করে অন্যত্র খাওয়ার সন্ধানে ব্যর্থ হয়ে জগন্নাথকে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ODBL বইটি দেয় ও বিনিময়ে খেতে চায়। মালিক জগন্নাথ বইটির ওজন ও ছবিটবির অবস্থান বুঝে জবাব দেয় বিক্রয় করলে মিলের দাম উঠবে না। তখন নান্টু না খেতে পাওয়ার জন্য অভিমান করেছে।

৬) পরিশেষে একটু রূপকের আশ্রয়ে গল্পকার বলেছেন যে— অফিস করা, টিফিন করার মাঝে কে যেন পাশের চেয়ার টেবিলে ছায়া সঙ্গীর মতো ঘুরে বেড়ায়— লেখকের প্রশ্ন— 'ওকে নিয়ে আমি এখন কি করি!'—আসলে এই সব মানুষের সহাবস্থানে লেখকের বেঁচে থাকা। এই সমাজ জীবনেই তাঁর লেখনীসত্তা বিরাজ করেছে।

'শ্রীকান্ত পঞ্চম পর্ব' গল্পে শ্রীকান্তের অভাবী সংসারে ভাই নলিনীর প্রতি অপার ভালোবাসার পরিচয় আছে। তাকে মানুষ করা, শিক্ষিত করার মধ্যে গর্ব অনুভব করেছে শ্রীকান্ত। শ্রীকান্তের অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায় সরলার সাথে। সরলা বাপের বাড়িতে থাকে। ছাগল চরায়। শ্রীকান্তের রাগ হয় দুঃখ বাড়ে। সে কঞ্চি দিয়ে সরলাকে মারে। তারজন্য বিচার বসে। জরিমানা হয় শ্রীকান্তের। গ্রামের মাতব্বররা নির্দেশ দেয় টাকা অনাদায়ে জল, আগুন বন্ধ করার। এখন তারা একঘরে। সমাজের জটিল নিয়মে প্রেম স্তব্ধ হয়ে গেছে। ভালোবাসার কোন মূল্য নেই এইসব মানুষদের কাছে। ছোটভাই নলিনী, কলেজের ছুটিতে বাড়ি ফিরলে শ্রীকান্তের বাবা শ্রীকান্তের কুকীর্তির কথা জানায়। অভিমানে রাতের খাওয়া তার হয় না। এদিকে সামাজিক জটিল নিয়মের হাত থেকে ভাইকে বাঁচাতে ঝাড়গ্রাম শহরে পাঠিয়ে দেয়। অতি সহজ সরল শ্রীকান্ত বাবা-মা মারা যাবার পর বলদ জোড়া নিয়ে চাষ করতে গেলে নিজের কাকা বাধা দেয়। মায়ের শ্রাদ্ধের খরচের অজুহাতে শ্রীকান্তের অর্ধেক জমি কাকা বন্ধক রাখে। তা সত্ত্বেও ভাইকে (নলিনীকে) মানুষ করার স্বপ্নে সর্বস্ব খুইয়েছে শ্রীকান্ত—

> "লড়ে যা ছোটভাই, হয়েছে কি এখনও কত বড় হতে হবে। আরও এক বিঘা জমিন বন্ধক দিয়ে ভাইয়ের নামে তিনশত টাকা মানিঅর্ডার করে দিল শ্রীকান্ত।" [১৬১]

এদিকে অল্প জমি, বলদগুলো দুর্বল হয়েছে বয়সের ভারে। কাজ নেই শ্রীকান্তের। না কাটা দাড়ি-গোঁফে নিরুপায় হাত বুলোয় আর ভাবে। ভাই বড় হবে শিক্ষিত হবে চাকরি করবে তখন অভাব দূর হবে। স্বপ্নগুলো পূরণ হবে। কিন্তু তা পূরণ হয়নি, এমনকি নতুন বলদ জোড়াও কিনতে পারেনি। নলিনী এখন চাকরি করে। কলকাতার মেয়ে ইরিনাকে বিবাহ করেছে দাদা শ্রীকান্তকে না জানিয়েই। গ্রামের অভাবী ও স্বপ্নাতুর দাদা শ্রীকান্ত ভায়ের ভালো চেয়ে মরতে বসেছে। একটা টেলিগ্রাম পেয়ে নলিনী গ্রামে চলে আসে মুমূর্ষু দাদাকে (শ্রীকান্তকে) দেখতে। শেষ দেখা ও কথা হয়। এখনও শ্রীকান্ত স্বপ্ন দেখে এক হাল গরু কিনতে পারলে চাষ করেই সমস্ত স্বপ্ন পূরণ করতে পারে।

একটি গ্রামীণ জীবনযাপনের সাথে শহরে চলে যাওয়া নলিনীর উত্তরণের সঠিক পথ দেখিয়েছে শ্রীকান্ত চরিত্র। এ যেন মানুষ করা নয়, নলিনীকে সভ্য সমাজের একজন হতে জীবনপণ সংগ্রামে ব্রতী শ্রীকান্ত কিনা হৃদয়বান দয়ালু ও আদর্শ চরিত্র। এ সংগ্রাম ও শপথ গ্রামীণ জীবনযাপনে চিরন্তন ও চেনা ছবি। একটি স্বপ্নপূরণের নিটোল গল্প জমিয়েছেন নলিনী বেরা। আমাদের চির চেনা গ্রামের শ্রীকান্তরা এভাবেই স্বপ্নের জাল বোনে, আশাপূরণের লক্ষ্যে সংগ্রামী যোদ্ধার মতো ভালোবাসাকে আঁকড়ে রাখে। যা অমলিন ও চিরন্তন মানবিক আবেদন সমৃদ্ধ।

সৈকত রক্ষিত

পুরুলিয়ার ভূমিপুত্র সৈকত রক্ষিত-এর ছোটগল্পে বিভিন্ন বিষয় ভাবনা, বিস্ময়কর প্রেক্ষিত, বিচিত্র মানুষের পেশাগত সমস্যা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। বিশশতকের সাতের দশকের পর থেকে তাঁর ছোটগল্পগুলির সাহিত্যগুণ একটু ভিন্ন স্বাদের। চিরাচরিত বাংলা গল্পের নির্মাণ কৌশলের বিপরীতে তাঁর রচিত গল্পগুলিতে পাওয়া যাবে পারিপার্শ্বিক পরিচয়। সেখানকার সমাজজীবনের অর্থনৈতিক পরিবেশের সাথে শ্রেণি অবস্থান বিশেষ ভূমিকায় উপস্থাপিত। প্রান্তিক মানুষের জীবনকাহিনি তাঁর রচনায় বর্ণিত হলেও চরিত্রের মৌলিক অধিকার সম্পর্কে লেখক স্পষ্টতই সচেতন। সৃজন কর্মের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজ তথা শাসন ব্যবস্থাকে দায়ী করেন নি, বিদ্রোহ বা প্রতিবাদী চরিত্র নির্মাণের লেখক তিনি নন। নিজের সৃষ্টিকর্মের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> "আমি আমার সারস্বত কর্মের সর্বস্ব দিয়ে যা চাই, তা হলো, মানুষের মনের পরিবর্তন আসুক, চেতনা আসুক, আদিমতা থেকে তা মানবিক হয়ে উঠুক। কোনো বিদ্রোহ দিয়েই মানবজাতির এই পরিবর্তন আসতে পারে না। তা নিজের মধ্যে নিজস্ব প্রক্রিয়ায় ঘটতে পারে।"[১৬২]

তাঁর গল্পের চরিত্রগুলি সামাজিক পরিস্থিতি মেনে অসহায়ভাবে জীবন কাটায়। লেখক এই ছবিই তুলে ধরতে সিদ্ধহস্ত।

পুরুলিয়া জেলাকেন্দ্রিক লোকায়তিক জীবন কথা লেখকের গল্পে ধরা রয়েছে। রাঢ়বঙ্গের এই অঞ্চলের মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি, জীবনযাপন, আচার-আচরণ, আর্থিক অবস্থানগত মুখ্যপ্রবণতা গুলির বাহ্যিক প্রকাশ সময় ও রাজনীতির প্রভাবে কিভাবে উজ্জ্বল, তার পরিচয় রয়েছে গল্পের পাতায়। আত্মমগ্ন সংগীত শিল্পীর মতো সুরের সন্ধানে অভিনিবিষ্ট থেকেছেন সুর-তাল-ছন্দের অনুরণনের দ্যোতনায়। তাঁর গল্পগুলি স্থানিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভারতবাসীর অন্যান্য প্রান্তের মানুষের জীবনকথার ইতিকথা, সত্যকথা রূপে রাঢ়বঙ্গের প্রেক্ষিতটিকে ধরে রেখেছে।

সৈকত রক্ষিত চিরন্তন পথের পথিক। পথে পথে তাঁর জীবনের দিন গোনা, রয়স গোনা। পুরুলিয়ার পাহাড়ে-জঙ্গলে, নদীর চরে চরে, শবর সাঁওতাল-বাউরি-কুর্মী-মুচিদের গ্রামে, আদিবাসীদের মেলায়, বাউল-ঝুমুর নাচের আসরে ঘুরে তাদের অনালোকিত জীবনের আনন্দ-উল্লাস-দুঃখ-বিষাদ-উজ্জীবনের প্রতিরূপ পাঠকের কাছে উপস্থাপিত করেছেন— চলমান জীবনের ভেতর দিয়ে যে বিচিত্র ভূ-খন্ড ও মানব সমাজের অখন্ড প্রেক্ষাপট তাকে সামনে রেখে। ফলে, 'আমার কাছে তাই একটা গল্প মানে একটা জার্নি ও।' আর সেই জন্যই—

"আমার লক্ষ্যই হ'ল এই সীমিত জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ধারা এবং বাঁচার দুর্মর প্রয়াসকে বাংলা সাহিত্যে নিয়ে আসা।" [১৬৩]

সৈকত রক্ষিতের 'আঁকশি' গল্পে অদ্ভুত জীবিকার পরিচয় ধরা রয়েছে। অভাবী মুচি সম্প্রদায়ের মানুষের প্রতিনিধি মাগারাম ও তার পরিবারের সংগ্রামী জীবনকথা গল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেছে। মাগারামের অভাবী জীবনকে অবলম্বন করেই কাহিনি গড়ে উঠেছে। নানান উপায়ের অনুসন্ধান, নানান পথ, এ পথের যেন শেষ নেই। পথ অতিক্রমণের মধ্যদিয়েই মাগারামের জীবন ও মৃত্যুর আহ্বান। তাঁর সংসারে রয়েছে বুড়ি মা, বেদেনী বউ, দুটো ছেলে— নুনু ও লীলকমল। জুয়ালকাঠির জঙ্গল প্রান্তে মাগারাম-এর বাস। আত্মীয়কুটুম্বহীন, শহর না দেখা মাগারাম মুচির জীবনে দুর্দিনের কামাই নেই। তবুও সে বেঁচে থাকতে চায়। সে দিনমজুর খাটে, মাটি কাটে, পাথর ভাঙে, অন্যের জমিতে লাঙল ঠেলে ফসল ফলায়। গল্পকার গভীর অনুসন্ধান চালিয়ে জেনেছেন—

"আবার কখনো নিতান্ত নিরুপায় হলে, জীবিকার তাড়নায় সে কেবল ঘুরেই বেড়ায়। গ্রাম-গ্রামান্তরে। জঙ্গলে। তার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে তার পরিবারও।" [১৬৪]

'আঁকশি' হল উঁচু থেকে নিজের কাছে আনার জন্য লগা, অর্থাৎ আঁকড়ষী (আকর্ষী-শব্দজাত)। গল্পের নামকরণের ব্যঞ্জনায় এবং কাহিনির বয়ানে মাগারামের বেঁচে থাকার জন্য নিরন্তর সংগ্রামী জীবন— গ্রাম থেকে জঙ্গলে আবার জঙ্গল থেকে গ্রামে শিমূল ফল সংগ্রহের তাড়নায় ছুটে বেড়ায়। আর 'কাঁধের লম্বা আঁকশিটা ধীরে ধীরে আশমানের দিকে তুলে ধরে।' মাগারামের মতো এই জুয়ালকাঠি গ্রামে কালুয়া ডোম, ভদ্র মাহালী, বৈদ্যনাথরাও শিমূল ফলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া মধুপুরের রৈথা মুচি, কাহলে পাড়ার বাউরিরা, ঘাঘরা, কাশি ডি, ভালুবাসা, বামনি, পিয়ারশোল— এরা সব গ্রামের অভাবী মানুষ। প্রতি বৎসর চৈত্র বৈশাখের গরমে যখন সবাই কাজ পায় না, সেই দুর্দিনে শিমূলই তাদের বাঁচিয়ে রাখে। তারা শিমূলের ফল ফাটিয়ে তুলো বের করে মানবাজারের আড়তখানায় বিক্রি করে। আশেপাশের গাছগুলি খালি করে নেওয়ার পর তিন-চারজনের এক একটি দল আঁকশি আর ঝুড়ি, বস্তা নিয়ে শিমূলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারা চলে যায় দূর-দূরান্তে অচেনা গ্রামে। যেখানে কোনো শিমূলয়ালা পৌঁছয়নি। প্রখর অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। কাঁধের আঁকশি নাচিয়ে মাগারাম হেঁটেই চলে।

মাগারাম স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে সঙ্গে নিয়ে প্রখর রোদে অনাহারে বৈষ্ণবপুর, তড়াডি, মালাডি গ্রামের পথ ধরে হেঁটে চলে। কিন্তু ফলভর্তি শিমূল গাছের দেখা মেলে না। শেষ পর্যন্ত রঞ্জনডির ভকু গরাই-এর বাড়িতে তিনটি শিমূল গাছ চল্লিশ টাকায় চুক্তি করে আঁকশি দিয়ে এবং পরে গামার গাছে উঠে গাছ ঝাড়াই করে সে। ইতিমধ্যে ভুকু গরাইয়ের বাগাল দিনেরবেলার ফ্যানটা গরুর জাবনার পাত্রে না দিয়ে জামবাটি সমেত নুনুকে খেতে দেয়। অভুক্ত মানুষগুলির কাছে এই প্রাপ্তি যেন অপ্রত্যাশিত। লেখকের কথায়—

"ঠান্ডা জল হয়ে যাওয়া মাড়ের গন্ধও কেমন করে যেন পৌঁছে যায় মগডালে। তার

অমোঘ আকর্ষণে। মাগারামও তড়াক করে নামতে থাকে। ডালে ডালে লাট খেতে খেতে, সে আপনা আপনিই ধপাস করে পড়ে মাড়িতে। সামলেও নেয়।" [১৬৫]

গরাই নিজের হাতে মহানুভবতায় ফ্যানটুকু দিয়ে ধন্য মনে করে। ফল পেড়ে বস্তায় পুরেছে মাগারাম। বস্তার মুখে দড়ি টানটান করে বাঁধতে গিয়ে তার পাঁজরগুলো যেন চড়চড় শব্দ করে ওঠে। তারপর ঝুড়ি-বস্তা মাথায় করে নিয়ে ওরা সন্ধ্যের আগেই বেড়িয়ে পড়ে। ওদের কাছে পথ যেন অন্ধকারের বার্তাবাহী। অন্ধকারে নেমে ওরা হাঁটতে থাকে, হারিয়ে যায়। মাথায় বোঝা হাতে আঁকশি নিয়ে লৌকিক গীত আউড়ে ওরা এগিয়ে চলে। এভাবেই ওদের বেঁচে থাকা হারিয়ে যাওয়া। সুরে সুর মিলিয়ে মাগারামের বউ-ছেলে এগিয়ে চলে অনন্তকাল, খাদ্যের সন্ধানে তথা-আঁকশি নিয়ে শিমূল ফলের সন্ধানে। গল্পকার মাগারাম চরিত্রের মাধ্যমে গার্হস্থ্য জীবন থেকে উৎখাত হওয়া এক পরিবারের ভ্রাম্যমান জীবনকথার আলেখ্য রচনা করেছেন।

সৈকত রক্ষিতের প্রতিটি চরিত্র নির্মাণ ও ঘটনা বর্ণনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল। যদিও তিনি মনে করেন যে অভিজ্ঞতাই সব নয় লেখকের নির্মাণ কৌশলমূলক প্রতিভা তথা জ্ঞান থাকা দরকার। নিজের কথায়— 'সব মিলিয়ে লেখা মানে আমার কাছে একটা জার্নি। অজ্ঞাত দুষ্প্রবেশ্য ভূ-খন্ডে পাঠককে নিয়ে যাওয়া আমার অন্যতম উদ্দেশ্য।' লেখকের 'পাঘা' গল্পটি এই ভাবনারই পরিণত শিল্প পরিচয়—

"কাড়িয়র গ্রাম থেকে ঝালদার হাট অনেকটা রাস্তা। কম সে কম তিন মাইল। কিন্তু এই দূরত্বের কোন একটানা পথ নেই। কখনো মাঠে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে আছে জগদ্দল পাথর। আবার কখনো সংকীর্ণ মেঠো পথ এঁকে বেঁকে ক্ষেতে গিয়ে নেমেছে।" [১৬৬]

এই পথ লেখকের চির চেনা পথ। এই পথ ধরেই তিনি খালি পায়ে সহস্র খালি পায়ের কাছে সহজে পৌঁছে গেছেন বিগত বছরগুলিতে। গল্পের চরিত্র শামাউন আনসারি আর আবুদনের সাথে পাঠকও দুর্গম পথ ধরে ঝুরা ঝুরা বারিশকে তোয়াক্কা না করে পাখা-দড়ির প্রান্ত ধরে হিড়হিড়িয়ে গাই ও মুখে জল বাঁধা দু-মাসের বকনার সঙ্গে পাকা সড়ক রাঁচি রোডের দুপাশে ঝালদার হাটে এসে উপস্থিত হয়। আর দেখতে পায়—

"হরেক জিনিসের দোকানপাট। কেউ চট বিছিয়ে আদা-রসুন-হারা মিরচার ঝুড়ি উপুড় করে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসেছে। হাঁটুর ওপর হাঁটু। মুখে জ্বলন্ত চুটি। কেউ এনেছে খড়-কাটা করাত, গরু-বাঁধার জন্য পাটের পাঘা, লোহার শিকল।" [১৬৭]

ইত্যাদি দ্রব্যের পসার সাজিয়ে বসেছে দোকানিরা। এতমানুষের কলরব এর আগে আবুদনও দেখেনি। সে আনন্দে নির্বাক হয়েছে। সুতোয় ঝোলা জিলিপির প্রতি তার লোভ। আর বাবার লোভ হয় তেলেভাজার উগ্র গন্ধে।

এদিকে মানুষজনের জমায়েত দেখে শামাউন হাটের আমেজ টের পায়। ভাবে তার গাই ও বাছুর ন্যায্য দামে বিক্রি হবে। হাটে গরু কেনাবেচার ওস্তাদ লোক ইউসুফ শামাউনকে বলে 'এত বেলায়' আসা ঠিক হয়নি। তারপর গাই-এর বাঁট, স্তন দেখে বাছুর দেখে দাম আন্দাজ করে। ক্রেতা লক্ষ্মণ ও

বাগমুন্ডির কালিন্দী মুড়ার কথাবার্তায় দরদাম চলতে থাকে। কিন্তু চাষবাসের সিজিনে কেউ গাই কিনতে চায় না। সবাই বলদ কিনবার মতলবে হাটে এসেছে। শামাউন জানে কম করে পাঁচশো টাকাতেও যদি বিক্রয় করা যায় তবে সেই টাকায় ছোটমোট দু-দাঁতের গরু কিনে ফেলবে চাষাবাদের জন্য। বড় অভাবের সংসার তার। এমনকি পেটপুরে একমাত্র ছেলে আবুদনকে খেতে দিতে পারে না। আজ হাটে হঠাৎ বৃষ্টি আসায় মানুষজন ভিজে যায়। আবুদন ভিজে যায়। 'গুঁড়ির গায়ে ঠেস দিয়ে বসতেই নিমগাছের ডেঁয়ো-পিঁপড়ে ঘাড়ে গলায় উঠে আসে।' সে এলোমেলো হাত নেড়ে ঝেড়ে ফেলে। এমনকি গায়ে মাথায় বৃষ্টির জলটুকু ও সরিয়ে দিতে চায়। শামাউন এক গিলাস চা-এর খানিকটা খেয়ে তলানিটুকু আবুদনকে দিয়ে বলে— 'খা ব্যাটা'। কিন্তু ব্যাটার আব্দার 'জিলিপি খাব।'

গাই-এর দাম কম করে পাঁচশো টাকায় বিক্রয়ের মতলব নিয়ে শামাউন হাটে এসেছে। গত জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমে তার হালের গরুটা জঙ্গলের বিষাক্ত লতাপাতা খেয়ে মুখে ফেনা তুলে পাতলা পায়খানা করে মারা যায়। তাই গাই বেচে গরু কেনার জন্য হাটে আসা তার। শেষ পর্যন্ত দালাল ইউসুফ ও লক্ষ্মণের পাল্লায় পড়ে তিনশ পঁচিশ টাকায় গাই বাছুর বিক্রয় করে শামাউন। কিন্তু এখন তার অন্য চিন্তা, অন্য উপায়ের উপান্তে এসেছে—

> "এই টাকায় সে কার কাছ থেকে গরু কিনবে ? দু-দাঁতের একটা ছোটোখাটো গরু ? নাকি জোয়ালের অন্যপাশে ব্যাটা আবুদনকে জুড়ে সে ক্ষেতে লাঙল ঘুরিয়ে যাবে ?" [১৬৮]

অভাবী মানুষের এই চিন্তার সাথে পাঠকের সহানুভূতি মন শামাউনের বন্ধু না হয়ে পারে না। শামাউনের দুশ্চিন্তার শরিক হয়ে মুহূর্তের জন্য হলেও পাঠক চোখে জল আনে। আর এখানেই বাস্তব জীবনের রূপকার সৈকত রক্ষিতের শিল্প নির্মাণের সার্থকতা।

এইসব প্রান্তিক মানুষদের জীবন কথার প্রতিচ্ছবি ধরা রয়েছে 'পট' গল্পের মধ্যে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুহিরাম। অত্যধিক গরম আর পিঠফাটা রোদে পাকদন্ডীতেও যখন পা ফেলা যায় না, পিচের রাস্তাগুলো গলতে শুরু করে, তখন মাইল মাইল পথ হাঁটতে না পারায় বড় বেশি নিরুপায় মনে হয় তার। পায়ে এক জোড়া হাওয়াই চপ্পল জোটানোর ক্ষমতা তার নেই। তার যত রাগ তাই প্রকৃতির প্রতি, নিজের প্রতি। আসলে পাইট্‌কার শ্রেণির লোকেদের পায়ে জুতো থাকে না। বলা ভালো জুতো জোটে না। অথচ তারা প্রতিদিন ভোর থেকে উঠেই গ্রামের পর গ্রাম পেরিয়ে কম করে দশ মাইল দূরের গ্রামে গিয়ে 'মৃত্যুদূত' হিসেবে সদ্যমৃত 'মড়াঘর'-এ উপস্থিত হয়। কোন কোন দিন প্রবল নিষ্ঠা ও অনুসন্ধানের তাড়নায় অনাহার পেট নিয়ে পাইট্‌কার ঘুরতেই থাকে এক মৌজা থেকে অন্য মৌজা বা অন্য গ্রাম।

এদিকে দিনের আলো কমে এলে নিজের ঘরে ফেরার তাড়ায় দ্রুত পা চালায়। তখন আর মৃতঘর নয় 'সে ফিরে আসে জীবনের তাড়নায় জীবনের আঙিনায়।' কেননা তার সারা দিনের রোজগারের অপেক্ষায় তার ঘরে ব্যাটাবিটি পরিবার সবাই 'নিকোনো উঠোনে, কিংবা দড়ির খাটে বসে অপেক্ষা করতে থাকে। ভোরের অন্ধকারে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া মানুষটি কখন ফিরে আসে। এই পাইট্‌কাররা দৈব নির্দেশ বহন করে চলে। গুহিরাম জানায়—

''এই যেমন ধর, কাল ভোররাতে আমি সপুন দেখলি— দ্যাবতা আমাকে বলছে, এ গুহি, তুঁই ঘুমাছিস ক্যানে বাছা ? উট্। যা, চৈলে যা তুঁই। সিধা উত্তরমুখে। আজ বাদে কাল উয়াকে (বুঢ়াকে) যমে লিবেক। তোর জন্যে উ একটা কাঁসার বাটি রাইখে যাবেক।'' [১৬৯]

তাছাড়া কিছু তথ্য জেনে নিতে হয় পাইট্কারদের। এভাবে স্বপ্ন বা বাস্তবের তথ্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ানোই এদের কাজ। আর ঘুরতে ঘুরতেই জেনে নেয় লোকটার বয়স কত ? 'কতদিন বিছানায় গোহৈলছে ? কী হঁয়েছে— ...মুহূর্তের মধ্যে পরপর প্রশ্ন করে।' লোকটির সঙ্গে তার ঘরের লোকের সম্পর্ক কেমন ছিল, রোগের দিনগুলোতে সে সেবা পেয়েছিল কি না, সে কী খেতে ভালোবাসত, টিনের থালায় নাকি কাঁসার থালায় খেত শ্রাদ্ধশান্তি করার সময় বেটাদের মধ্যে মারামারি লাঠালাঠি হয়েছিল কি না, কুটুম্বভোজনের জন্য কত করে চাঁদা তুলেছিল, কে কে কেঁদেছিল ইত্যাদি। কিংবা খোঁজ নেয় কোন গ্রামে কে কে মর মর করছে কত দিন পরে মরবে। এভাবে পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে গুহিরাম। পথ চলতি মানুষকে জিজ্ঞেস করে—

''তুমাদে গাঁয়ে এই একটাই যাব যাব করছে ? আর কৌ নাই ? তুমাদে পাশের গাঁটার ?'' [১৭০]

গুহিরাম চিত্রকরের চিত্রকর হল গুহিরামের পদবি। পাইট্কারদের নামের সাথে চিত্রকর পদবি প্রচলিত হয়ে রয়েছে। আসলে, কোনো একসময় চিত্রকর হিসেবে তারা প্রসিদ্ধ ছিল। ঘরে ঘরে এক একটি পরিবার পট বানাত, ছবি আঁকত। এবং এটাই তাদের বৃত্তি ও পরিচয় ছিল। সেই থেকে তারা সাধারণ জনমানসে 'পট্কার', 'পটিকার' বা পাইট্কার হিসেবে পরিচিত। অর্থনৈতিক সমস্যায় ও পেশা পরিবর্তনের ফলে তারা শিল্পকর্ম ছেড়ে দেয়। দারিদ্র্য ও অনটনে পড়ে প্রাচীন শৈল্পিক নৈপুণ্যকে হারাতে হয়। তবু তারা 'পাইট্কার' নামে পরিচিত। ছবি আঁকা ছেড়ে পেট ভরে খাওয়ার জন্য সংগ্রামী জীবন যুদ্ধের সৈনিক এই সম্প্রদায়ের মানুষজন। এদের সারল্য জীবনে মিথ্যাচার বলতে গ্রামের নাম গোপন করা। কারণ, সমাজের অন্য মানুষের কাছে এরা নিম্নজাতের মানুষ। আর সামান্য মিথ্যা বাচন তা তো অভাবী পরিবারের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই। এরা ভূতপ্রেত বা অলৌকিকতাকে ভয় পায় না। বরং লোকের মনকে প্রভাবিত করতে মড়াঘরে গিয়ে অশরীরীর সঙ্গে সাক্ষাতের কথা জানায়। এরা জানে মৃতকে পুড়িয়ে ফেললে বা পাথর জাঁকা দিলে সে কখনোই মাথা তুলে দাঁড়িয়ে ভয় পাইয়ে দিতে এগিয়ে আসবে না। তাই পাইট্কারদের সাহস একটু বেশিই বলতে হয়। পাইট্কার পরিবারের কেউ মারা গেলে, (শিশু বা নাবালক বাদে) তাকে ঘরের উঠোনে তুলসী থানের সামনেই পুঁতে ফেলার নিয়ম রয়েছে। মড়াকে দাহ করা হয় না; এমনকি শ্মশানেও নিয়ে যাওয়া হয় না।

মৃত মানুষ বা অলৌকিকতা সম্পর্কে ভয় না থাকলেও পাইট্কাররা আসলে ভীতু মানুষ। 'সব সময় চোরের মতো নিজের মধ্যে সিঁটিয়ে থাকে। ভাবে, যে কোনো সময় সে মানুষের হাতে প্রহৃত হতে পারে।' এই ভয়েই নিজের নাম যদিও বা বলে, নিজের ডেরা বা গ্রামের নাম কখনোই জানাতে চায় না। এরা শিক্ষিত পরিবারে ঢুকতে চায় না। কারণ, মানুষের মনে বিশ্বাস নেই। সারাদিন মড়াঘর অন্বেষণের

পর গুহিরাম সন্ধ্যের জমাট অন্ধকারে বাড়ি ফেরে। বাড়িতে বউ চেপি, বড়ছেলে মনদীপ ও ছোট ছেলে উত্তম অপেক্ষায় থাকে বাবার সারাদিনের খাদ্য সংগ্রহের আশায়। অভাবী না খেতে পাওয়া মানুষের জীবন্ত চিত্র তুলে ধরেছেন সৈকত রক্ষিত। না খেতে পাওয়া পাঁচ বছরের ছোটছেলে (উত্তম) একটু আগে তাল দিয়ে বানানো চাকার গাড়িটি খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়ে। উত্তমকে শুইয়ে দিয়ে চেপি নিজের মনেই বলে যায়—

> "ই তো অ্যাল্লে আগেও গাড়ি চালাতে ছিল। বলতে ছিল, মাগো ভখ লাগছে। ত আমি বললি, ভখ লাগছে তো কী খাবি ? আমার গায়ের মাসটা খা।" [১৭১]

প্রবল অভাবের তাড়নায় মায়ের এই জ্বালাময়ী বাচনভঙ্গি আমাদের মনকে আহত করলেও মা-এর মন কতটা দুঃখময় হলে এ ধরণের বাক্য বেরিয়ে আসে তা লেখকের সূক্ষ্ম জীবন দৃষ্টির পরিচয়ে উজ্জ্বল হয়েছে— 'এই পাইট্‌কার তার উপোসী সন্তানদের জন্য কিছু না কিছু আনবেই।' ভাঙাভাঙি বাসনকোসন না হলেও, চালে টাকায় সে কিছু আনবেই। 'না আনলে বাঁচবে কী করে ?'

শরীরের ক্লান্তি থাকলেও গুহিরাম ঘুমুতে পারে না। পাশাপাশি পাইট্‌কারা মদ খেয়ে ফুর্তি করে, ঝগড়া করে রাতের শান্তি নষ্ট করে দেয়। শেষ প্রহরে গুহিরামের চোখটা লেগে গেলেও গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাওয়ার তাড়নায় উঠে পড়ে। ভোরের ঠান্ডা বাতাসে গুহিরামের একটু শীত শীত পায়। রাস্তায় লক্ষ্মণ সর্দারের কাছে জানতে পারে ভঁড়েগড়ায় বুড়া মরেছে। তারপর মড়াঘরে গিয়ে বুড়ার নাম, কি বারে মরেছে সব গড়গড় করে বলার পর বুড়ার কর্মফলের পট বের করে। পটের মর্মকথা সুর করে দ্রুতগতিতে বলতে থাকে। গৃহস্থবাড়িকে সন্তুষ্ট করে মৃতব্যক্তির রেখে যাওয়া থালাটি আদায় করে লৌতনডিতে বাউরি ঘরে ঢোকে। এখানে বাউরি বউ নতুন ব্যক্তির আগমনে চমকে ওঠে। বাড়িতে অসুস্থ মানুষ থাকায় গুহিরাম সে ভিখিরি হিসেবে ভিক্ষা দিতে রাজি নয়। কিন্তু গুহিরাম বলে— 'আমি ভিখারি লই, পাইট্‌কার বটি।' বাউরি বউটি অশুভ মানুষটিকে দেখে ভীত ও ক্রুদ্ধ হয়। ঘরের পুরুষেরা গুহিরামকে ঘিরে ধরে। তারা জানতে চায় গুহিরামকে কে আসতে বলেছে। গুহিরাম বলে— "কে আর বলবেক বাবু ? পাইট্‌কাররা ত দ্যাবতার টানে আসে। তুমার ঘরের ল্যা মড়া গেছে।" এই 'মড়া' কথা শুনেই তার গায়ে হাত তুলে দেয় জোয়ান ছেলেরা। ঘরে অসুস্থ মেয়েমানুষের অকল্যাণের ভাবনায় তারা মারতে থাকে। এমনকি চোর বলে অপবাদ দেয়। গুহিরাম নিরুপায় হয়ে ময়লা গামছার প্রান্তটা বাঁ-হাতে জড়িয়ে হাতজোড় করে ক্ষমা চায়। আর বলে— 'ভুল করে জিয়ন্ত ঘরে ঢুকে গেছি। আমাকে মাইরো না।' কিন্তু সকলে মিলে গুহিরামকে প্রহার করে। সে নিস্তেজ হয়ে যায় আর ভাবে অভুক্ত সন্তানদের মুখগুলি।

গল্পের মধ্যে লেখকের সমাজ জীবন অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে। লেখক গুহিরামকে উদ্দেশ্য করে এই প্রান্তিক মানুষগুলির প্রতি সমবেদনা জানিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন—

> "সত্যিই কি সে আর বেশিদিন এই পাইট্‌কারগিরি চালিয়ে যেতে পারবে ? উত্তরাধিকারসূত্রে, এই দড়ির খাটে শুয়ে থাকা অনাহারী শিশুটি কি বাপের এই বৃত্তিটা

নেবে ? নিলেও এই দিয়ে সে দুর্মূল্যের বাজারে টিকিয়ে রাখতে পারবে নিজের অস্তিত্বকে ?" [১৭২]

'মুখোশ' গল্পটি প্রতীকের আবরণের ভীমা সূত্রধরের পারিবারিক দুঃখময় জীবনকথার পরিচয়বাহী। মুখোশ বানিয়ে বিক্রি করে সামান্য রোজগারের চেষ্টায় এক একটি পরিবার কিভাবে সমাজ জীবনে সংসার চালিয়ে টিকে থেকেছে তারই পরিচয় রয়েছে এখানে। গল্পে প্রহ্লাদ সূত্রধরের ছেলে ভীমাও বাবার পেশায় যোগ দিতে বাধ্য হয়। ছোটবেলা থেকে মাটি নিয়ে খেলা করা, পাথর দিয়ে মাটি ভাঙা, কাদা মাখা ইত্যাদি খেলতে খেলতে কখন যেন সত্যিই দায়িত্ব নিয়ে মুখোশের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছে। সে বাবাকে দেখত মাটি নিয়ে খেলা করতে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল পর্যন্ত সেই মাটিমাখা হাত শুকিয়ে থাকত। আর এক নাগাড়ে পুতুল বানাতে বানাতে খিদেয় নাভিশুদ্ধ পেটটি ভেতরে ঢুকে যেত। 'কোমরে পাক দেওয়া ধুতিটি আলগা হয়ে নেমে যেত তলপেটে।' ছোট্ট ভীমা এতসব না বুঝলেও সে হাত লাগাতে চাইত বাবার কাজে— 'এ বাবা, এই মুখটা শুকাতে দিব ?' এভাবেই একটি অদৃশ্য পৈতৃক ছাঁচে গড়া ভীমার জীবন। বাবার অসমাপ্ত ও অপরিসীম দরদে গড়া মুখোশগুলিকে সে অতি যত্নে ও কৌশলে উত্তরাধিকার সূত্রে পালন করতে শেখে। দৈনন্দিন জীবনের গ্লানি আর অশ্রু অনাহার-ভালোবাসা দিয়ে ভীমা একটু একটু করে কারিগরী দক্ষতায় পূর্ণতা দিতে চেয়েছে। শিল্পীর সাধনায় ধরতে চেয়েছে পরম্পরাকে, ঐতিহ্যকে।

পুরুলিয়ার ডুমেরডি গ্রামের প্রায় অধিকাংশ ঘরে দু-চারজন করে মুখোশ তৈরির কাজ করে। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা প্রায় সবাই এই কাজে যোগ দেয়। এই কাজটি মাত্র তিন মাস চলে, চৈত্র থেকে জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত। কারণ এই সময় খেতে কাজ থাকে না, এটাই 'ছো'-নাচের সিজিন। গ্রামে গ্রামে মহড়া চলে, আসর বসে, ধামসা বাজে। ছৌ-পার্টিরা মুখোশ কেনার জন্য ভীমা, ভাগবত, সূত্রধরদের ঘরে মুখোশ কিনতে আসে। মুখোশ-শিল্পীদের এই সময় কোন ফুরসত থাকে না। সকাল থেকে শুরু করে দিনের আলো যতক্ষই থাকে ততক্ষণ ওরা মুখোশ বানিয়ে থাকে। ডুমেরডি গ্রামের মতো অযোধ্যার নিচে চৈড়দা গ্রামেও মুখোশের কারিগরদের বসবাস। পাহাড়তলিতে পঞ্চাশ ঘর রয়েছে। ডুমেরডি গ্রামটিও পাহাড় ও টিলায় ঘেরা। মাটির ঘর, মাথায় পচা খড়ের চাল দেখে দৈন্যদশা বোঝা যায়। বর্ষাকালের বর্ণনায় ভেসে ওঠে গ্রামের মায়াময় ছবি—

> "আষাঢ়-শরাবনে তাদেরই ঘরের দেয়ালের ফাটল বেয়ে নীরবে গড়িয়ে নামে বর্ষার জল। গলে গলে পড়ে কাদামাটি। যেন রং না করা দুর্গার মুখোশের গাল বেয়ে নামতে থাকে মায়ের বিষণ্ণ অশ্রু!" [১৭৩]

এদের অভাবী সংসারে একটি সিজিনেই চলে ব্যবসা। তাই বাচ্চাদের প্রতি যত্ন নেবার সময় থাকে না। মেঘ দেখলে এরা ভয় পায়। মুখোশ শুকোতে না পারলে অর্ডার বাতিলের ভয়। তবে বর্ষাকালে মেঘের আবির্ভাব ঘটলে জমিতে জল জমলে নৃত্যশিল্পীরা ছৌ-নাচ ছেড়ে লাঙল নিয়ে মাঠে চাষাবাদ করতে ছুটে— 'চাষ ভালো হলে তবেই তো নাচ ভালো হবে।' ভীমার তেমন জমি নেই কেবল মুখোশ-

নির্মাণের ওপরই ভসরা। মেয়ে ছুটুমণিকে সে গভীর মায়া-স্নেহের আদরে রাখতে চায়। তার সারল্য ও গভীর চাহনি, মুখের আদল অবিকল দুর্গার মুখোশটির মতো। লেখক সৈকত রক্ষিত ছুটুমণির মধ্য দিয়ে মুখোশকে সামনে রেখে এক রহস্যময়, স্বপ্নলোকে ভীমাকে তথা পাঠককে নিয়ে যান। সেখানে মুখোশের কারিগর ভীমার আত্মজা ছুটুমণি মুখোশের প্রতিমূর্তি তথা জীবন্ত মূর্তি রূপে উপস্থিত। অভাবী সাংসারিক জীবনের নিষ্ঠুরতা ভীমার জীবনকে কঠোর একমুখী ও সংকুচিত করে দেয়। তার বিমর্ষ হৃদয় সাংসারিক জীবনকে অভিশাপ বলে ঘৃণা করে। ভীমার ছেলে তপন মুখোশ গড়তে জানে না বলে ভীমার দুঃখ হয়। লেখকের জীবনদৃষ্টিতে ভীমার অনুভবটি ধরা পড়ে—

> "মুখোশ গড়তে গড়তে মুখোশের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পারত মুখের ভাষাকে, চোখের ভাষাকে। তবেই নিজেকে সার্থক মনে হত ভীমার। পুরুষানুক্রমে বয়ে আনা তাদের নির্বাক অথচ বাঙ্ময় অভিব্যক্তিকে।" [১৭৪]

ভীমা জানে জিনিসপত্রের যা দাম বেড়েছে তাতে মুখোশ তৈরির খরচসহ বিক্রয়ের দাম বাড়ানো উচিত। অথচ সে দাম পায় না। অভাবী ভীমা ভাবে তার হাতে গড়া প্রত্যেকটি জিনিস ভুল। মুখোশ, পুতুল— এমনকি শিল্পী জীবনও। তার ব্যর্থতা ও বঞ্চনার জীবনে ধিক্কার জন্মেছে। আর সন্দেহ জন্মেছে নিজের কন্যা সন্তান ছুটুমণির প্রতি। সে ভেবেছে মেয়ের জন্মের পর থেকেই জীবন অভিশাপে ভরে গেছে। আজ পর্যন্ত কোনো একটি মুখোশ ও তার মুখের অব্যক্ত ভাষাকে প্রকাশ করতে পারেনি। জ্বরের মধ্যে ভীমা অপ্রকৃতিস্থতায় দুর্গার মুখোশে পা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সচলার আর্তনাদে পা নামিয়ে নেয় ভীমা। দীর্ঘদিনের শিল্পী জীবনের ব্যর্থতা ও অভাবের জ্বালায় ভীমার মনে অশুভ শক্তি ক্রমশ জাগ্রত হয়। কুসংস্কারাচ্ছন্নতায় সে নিঃসন্দেহ হয় তার যাবতীয় সাংসারিক অশান্তির মূলে তার মেয়ে ছুটুমণি।

ভীমার শিল্পীসত্ত্বার ভুল সিদ্ধান্ত এখান থেকেই বলা যায়। রোগজ্বালা, সাংসারিক কলহের মধ্যে ভীমা শয়তানের দৃষ্টিতে মেয়ের গতিবিধি লক্ষ্য করে। তারপর একদিন আষাঢ়ের রাতে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় ভীমা মেয়েকে অন্ধকূপের কিনারে নিয়ে যায়। মেয়ে ছুটুমণি ভয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে অপরিসীম নির্ভরতায়। আসলে শিশুটির এই আত্মসমর্পণ ভীমার যাবতীয় অন্ধতাকে মুহূর্তে বিনীল করে দেয়। ছুটুমণির মধ্যে সে তৎক্ষণাৎ দেখতে পায় একটি অসহায় নিষ্পাপ দুর্বল করুণ সারল্যময় সন্তানকে। একটি নাবালিকার বেঁচে থাকার আর্তি তার জীবনকে মুহূর্তে যেন পরমার্থ করে দেয়। ঘাতকের (ভীমার) নির্মম হাত অসাড় হয়ে যায়। তার পাষাণ হৃদয় দুর্বল হয়, সে মেয়েকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ওঠে— 'মা! মা আমার!' ভালোবাসার মধ্যে বেঁচে থাকার মন্ত্র উচ্চারিত হয় গভীর ভাবাবেগে। গল্পকার ভৌতিক প্রসঙ্গ এনে একজন অভাবী মুখোশ শিল্পীর শিল্পী সত্ত্বার যথার্থ স্বরূপটি তুলে ধরেছেন। আর শিল্পীর মাধুর্যভাবের সাথে মিলিয়ে দিয়েছেন পিতৃসত্তাকে।

প্রান্তিক মানুষজনের বেঁচে থাকার নিরন্তর সংগ্রাম, তাদের দুঃখযন্ত্রণার প্রতিচ্ছবি রয়েছে 'রাঙামাটি' গল্পে। সামনে টিলা আর পিছনে বিস্তৃত পাহাড় এই দুইয়ের মাঝখানে কুড়ি-বাইশটি ঘরের শ-দেড়েক উপজাতি নিয়ে সাঁওতালদের গ্রাম রাঙামাটি। অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব জীবনের জন্য এরা লোকালয়

থেকে সরতে সরতে এত দূরে নির্জনে বসতি গড়ে রয়েছে। জঙ্গলের একাংশে তাদের চৌকো চৌকো ঘর। মাথায় শালপাতার টুপির মতো খড়ের চাল। দুই ঘরের মাঝের গলি সংকীর্ণ বলে এক ঘরের চাল ছুঁয়ে বা ফুঁড়ে উঠেছে যেন আরেকটি ঘর। ভূমি এখানে দিগন্তবিস্তৃত, প্রকৃতি এখানে উদার ও ব্যাপ্ত। গরমের দিনগুলোয় তাপের প্রাচুর্যে পায়ের পাতা ঝলসে যায় তাদের। গায়ের রঙ তাই অনেকটা 'মাদাল বিচির' মতো— কালচে অথচ মসৃণ। এই মাটির মানুষদের নিত্য অভাব।

ভূমিহীন বনমালী অন্যের জমিতে হাল-গরু নিয়ে চাষ করে। বউ সঞ্চরানি ক্ষেতে কাজ করে। আর যে বছর গ্রামে খরা হয় সে বছর কাজের সন্ধানে তারা বর্ধমানের দিকে চলে যায়। কেবল বনমালী নয় এই গ্রামের সবাই দৈবে বিশ্বাসী। কারণ অভাবের সাথে কুসংস্কার সম্পর্কযুক্ত বলেই বেশিরভাগ মানুষের কাছে লোকবিশ্বাস আজও বদ্ধমূল ধারণার মতো বহমান। রাঙামাটি গ্রামের মানুষদের হাতে কাজকর্ম কমে গেলে বা না থাকলে দৈব আক্রমণের ঘটনায় তারা আতঙ্কিত হয়। এই আতঙ্কিত ও ভীতি নিয়ে সামনের চাষবাদের সময় পর্যন্ত দিন কাটায়। গুঙারামের পশু চিকিৎসা পদ্ধতিকে তারা রীতিমত অব্যর্থ ও বিশ্বাসযোগ্য বলে মানে। এরজন্যই নন্দলালকে 'বরা-চোর' বলে টানা-হিঁচড়া করে জরিমানা স্বরূপ গ্রামবাসীরা দশ টাকা আদায় করে নিয়েছে। আবার কিছুদিন পর নন্দলালের গরু মারা গেলে ডাইনি সন্দেহে তাকে ওঝা ডাকার জন্য প্ররোচিত করেছে। ওঝা বংশীঠাকুর নানা ক্রিয়া কর্মের পর গরুর উপর অপদেবতার রোষ পড়েছে বলে দেয়। মরা গরুর চারপাশে গন্ডি কেটে, গন্ডির দাগে দাগে পাশে পাশে ধূপকাঠি সাজিয়ে বহুমুখী ধোঁয়ায় লোক দেখানো মন্ত্রশক্তির পরিবেশ তৈরি করে নন্দলাল ওঝা। সে পারিশ্রমিক হিসেবে একটা মুরগি ও এক গাঁট ধান বেঁধেছেঁদে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে চলে যায়। ওঝা চলে গেলে গ্রামে তুমুল হট্টগোল বাঁধে। বনমালীর সাথে পুরানো শত্রুতাবশত সবার সন্দেহ গিয়ে পড়ে তার বউ সঞ্চারানির দিকে—

> "মুহূর্তের ভেতরে বনমালীকে অমানুষ করে তুলল। সঞ্চারানির দিকে সে স্বামীর সৃষ্টিতে তাকাতে পারে না। তার চোখে সে এখন আর বউ নয়। তার ঘোলাটে হয়ে আসা চোখে— এই এক্ষুণি, সঞ্চারানি হয়ে গেল ডাইনি। অপদেবতা!" [১৭৫]

সাঁওতালদের সমাজে মুষ্টিমেয় মানুষ নিজেদের স্বার্থে নিজেরাই একটা প্রশাসন তথা রীতিনীতি বহন করে বা কায়েম করে রেখেছে। সেখানে বনমালীর মতো নিরীহ ও দুর্বল অভাবী লোকের বউ ডাইনি অপবাদে সাব্যস্ত হয়। তাদের ওপর অত্যাচার চলে। আর স্বযত্নে কুসংস্কারকে বাঁচিয়ে রেখে অর্থনৈতিক শোষণ জুলুম ও শারীরিক নির্যাতন চলতে থাকে। তার জন্যই ভয় দেখানো, ওঝা ডাকা, সখা বা জ্ঞানগুরুর কাছে যাওয়া। আর বিরোধিতা করলে তার প্রতিক্রিয়া ভয়ঙ্কর রূপ পায়। এরা পুলিশ ডেকে কুসংস্কারের বিবাদ মেটায় না। বিবাদ মেটাতে ওঝা ডাকা, সখা ঘর যাওয়া, ধূলা-উড়ানি বা রাস্তা খরচ বাবদ মোট ছ-কুড়ি খরচ হয়ে গেছে ধরে নিয়ে সঞ্চারানির কাছে জরিমানার পরিমাণ নির্ধারণ করে। আলোচনা সভায় গুঙা বনমালীর দিকে তর্জনী তুলে চিৎকার করে বলে— 'তুমার ঘরে ডাইন্ আছে। ডাইন্ থাকবেক ক্যানে ? এখন তুমাকে তার জৈর্‌বানা দিতে হবেক।' এই জরিমানা প্রদান অপবাদীদের অপরাধ ক্ষমার সাময়িক উপায় মাত্র। নির্মম প্রথার কাছে অসহায়তার কথা শুনিয়েছেন গল্পকার—

"জরিমানা যে দিতে হবে সেটা কে না জানে ? তবে মূলত এই জরিমানা আদায়ের পিছনে যে অপবাদ প্রদানের চক্রান্ত রয়েছে— শিক্ষাহীন গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা তা জানে না। তাই জরিমানাকে তারা শাস্তিস্বরূপ মাথা পেতে নেয়।"[১৭৬]

অদ্ভুত এদের বিচার ব্যবস্থা। শাস্তি বা জরিমানা ঘোষণার পর এই কঠিন অপবাদ 'কাটান'-এর ব্যবস্থা রয়েছে এদের সভার নিয়মে। তখন আরেক সখার কাছে গিয়ে আপিল জানালে সেই মানুষটি ডাইনি অপবাদ থেকে মুক্তি পায় দ্বিগুণ অর্থদন্ডের বিনিময়ে। গ্রামের অবস্থাপন্ন ও মাতব্বররা এমনি করে জরিমানা আদায় করে থাকে। হিংস্র ও নিষ্ঠুর মানুষগুলো কখনো ভাবে না একেকটি পরিবার কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সঞ্চারানির অপবাদ ও করুণ ভয়ার্ত অবস্থার জন্য বনমালী সত্যের মুখোমুখি হয়েছে। এতদিন সে ডাইনি বিশ্বাস করত। আর এখন নিজের বউয়ের শোচনীয় পরিণতির জন্য বনমালী মন থেকে কুসংস্কার মুছে ফেলেছে। তার বিবেক বুদ্ধি তাকে সজাগ করেছে, অন্ধকার থেকে আলোকিত করেছে তার মনকে—

"যে তার শ্রমে-দারিদ্র্যে, হতাশায় ক্লান্তিতেও অবিচল সঙ্গ দিয়ে এসেছে, তার অন্তর্নিহিত স্নেহ-মমতার অবমাননায় নিজেকে সে ভেবে বসল মূঢ়। অনুশোচনাও হল তার।" [১৭৭]

অকৃত্রিম এই ভালোবাসা বোধেই জড়িয়ে রয়েছে সম্পর্ক-ঘরবাঁধার। অথচ— 'ঘরটা ভাইঙে দিল, হ্যাঁ ? ভাইঙে দিল ঘরটা ?' তাই ভালোবাসা কে সম্বল করে রাঙামাটির পথ ছাড়িয়ে এই বিশ্বালয়ের অজানা ঠিকানার উদ্দেশ্যে পাড়ি দেয়। রাতের অন্ধকারে গরু, শুয়োর, সন্তান, স্ত্রী নিয়ে বনমালী শুকনো ফ্যাকাসে চোখে জমাট কান্না নিয়ে জঙ্গলের পথে হারিয়ে যায়। নিরুপদ্রব জীবনের নিবিড় সহাবস্থান ছাড়িয়ে রাঙামাটির বিষধর মানুষদের দূরে রেখে নিঃশব্দ অন্ধকারে হারিয়ে যায়।

কৃষিকাজ ও চাষাবাদকে কেন্দ্র করে প্রান্তিক মানুষের বিচিত্র জীবন ও জীবিকার অনুসন্ধান ধরা হয়েছে 'মাড়াইকল' গল্পে। লেখকের 'সিরকাবাদ' উপন্যাসের মতোই এ গল্পের পটভূমি অযোধ্যা পাহাড়ের নিচে সিরকাবাদ গ্রামকে কেন্দ্র করে। আখচাষ, চাষী ও মজুরদের দুঃখ, যন্ত্রণা অভাবের ছবি রয়েছে। গল্পের চেপুলাল বেশরা কষ্টক্লেশহীন মানুষ। তার মুখের অকপট হাসি, রক্তহীন বিবর্ণ মাড়িতে ভুট্টার দানার মতো দাঁতের উজ্জ্বলতা, নির্বিকারচিত্ততা চিরন্তন ক্রীতদাসত্বের প্রতিনিধি রূপে নির্মিত চেপুলাল। সে কুঞ্জ মোদকের চাকর তথা ক্রীতদাস। কুঞ্জ মোদকের ঘর-সংসার থেকে শুরু করে আখ চাষের সমস্ত কাজ করে দেয় চেপুলাল। তার মাংসহীন শরীর সুষম ছন্দে গাঁথা, যেন হাড়ের মালা। তার সারা গায়ে পিঠে ময়লা। যা আলাদা করে ময়লা বলে বোঝা যায় না। ময়লার গায়ের রং হয়ে গেছে। তার পাংশুটে চুল আবৃত মাথাটি গর্দানের উপরে একটু ভারি। এসব দেহের গঠন হলেও সে দায়িত্ব সচেতনভাবেই মনিবের কাজ করে। তার পরিবারে স্ত্রী-পুত্র থাকলেও তারা কুঞ্জবাবুর চাষাবাদে শ্রম দিয়ে বিনিময়ে সামান্য অর্থ, খাদ্য খেয়ে জীবন কাটায়। সে ভেবে নেয় তার বাঁচা এবং মরে যাওয়া পুরোটাই নির্ভর করছে কুঞ্জবাবুর ওপর।— 'হামি আর কৎদিন বাঁচব বৈলে দাও ক্যান্নে ?' এর উত্তরে কুঞ্জ তাকে চুপ থাকতে বলে— 'চুপ যা! চুপ, হারামী!'

গাড়োয়ান চেপুলাল মনিব কুঞ্জকে নিয়ে আখের খেতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। বাঘ-ভাল্লুকের ভয়, মালিককে লক্ষ্য রাখা, গরু জোড়াকে তাড়িয়ে নিয়ে চলার মধ্যে তার বেলা বাড়ে। খিদে পায়। কুঞ্জ তাকে কয়েকটা পিঠে খেতে দেয়— 'চেপু এক হাতে করে পিঠে খেতে থাকে। আরেক হাতে সে গরুর পিঠে মারে চাবুক।' খেত ভর্তি পাকা আখ দেখে কুঞ্জ আপ্লুত হয়, চেপুও। আখের খেতের উজ্জ্বল রোদের দিকে নিজের নগ্ন শরীরটাকে সরিয়ে নিয়ে যায় চেপুলাল— ভাবলেশহীন। প্রকৃতি পাল্টালেও চেপুলাল বদলায়নি তার স্থিতিজাড্যে। সে অনড়— 'গ্রীষ্মেও সে থেকেছে নগ্ন, এই শীতেও সে প্রায়-নগ্ন। চেপুলাল দাঁড়িয়ে থাকে যেখানের সেখানেই।' প্রতি বছর খেত ভর্তি পাকা আখ কেটে পাতা ঝাড়িয়ে মাড়াইকলে রস বের করার কাজ করে। তারপর শালঘরে গুড় তৈরি করা অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। মনিব কুঞ্জের আখ খেতে চেপুলালের ছেলে, বউও কাজ পায়। বিনিময়ে বাড়তি হিসেবে 'ঘরের এঁটো মাড়জল, জামবাটিতে বাসি পচা ভাত, ছেলে-বউয়ের খাওয়ার জন্য দুটো-একটা ফাউ আখ।' তাই কুঞ্জ বাড়তি মজুর লাগায় না। খেতের কিছুটা অংশ সাফ হলে শালঘরে বড় কড়াই-এর রসে আগুন দেয় চেপু। তারপর—

> "জ্বাল খেয়ে জ্বাল খেয়ে সেই প্রতিকৃতিই টলটল করতে করতে একসময় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যেন আগুনের তাপে ঘামে আর শ্রমে নিজেকে নির্মূল অথবা একাকার করে চেপুলালই চেপুলাল থেকে পাল্টে যায় গুড়ে।" [১৭৮]

শীতে যেমন সে কাঁপতে থাকে আবার আগুনের তাপে সে ঝলসে যায়। বুকের লোম, বগলের গোড়ার ময়লা জমা পুরু লোমগুলো, শরীরের ঘাম— সব কিছু ঝলসে যায় আঁচে। তাতেও চেপুর কোনো ভ্রূক্ষেপ থাকে না। তার মালিক শকুনির দৃষ্টিতে চেপুলালের প্রতি খেয়াল রাখে আর বসে বসে বিড়ির নিবিড় ধোঁয়া ছাড়ে। শহরের পাইকারকে উপযুক্ত দামে গুড় বিক্রি করতে চায় কুঞ্জ। এটিই তার লাভের সময়। তাই সদা জাগ্রত থেকে তদ্বির করতে রোজ সকালে শালঘরে চলে আসে সে। গুড়ের দরদাম পাকা করে পুরুলিয়ার বাজারে পাঠায়। আর চেপুলাল রোদে তাপে শরীর পুড়িয়ে সারাজীবন খেটেই চলে স্ত্রী, পুত্রের কথা না ভেবে। লেখকের কথায়—

> "তার পরবর্তী প্রজন্ম বড় হয়ে উঠেছে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সেই দাসত্বের বন্ধনে। তারা অসহায়। শিক্ষা নেই, চেতনা নেই, প্রতিবাদ নেই। তাই জীবনের এই করুণ দশাকে তারা নিয়তি বলেই মেনে নেয়। চেপুলাল জানে, বউ, ছেলে নিয়ে তার অন্ন দাসত্বের এই জীবন থেকে আর উত্তরণ নেই, মুক্তিও নেই।" [১৭৯]

মনিবের আখ পাহারা দিতে দিতে চেপুলাল শরীরকে অযত্ন করে, শীতে কাঁপে, কাশি বাধায়, দুর্বল হয় শরীর। ক্লান্তি আর শীতে প্রকৃতির নিয়মে চেপুলালের শরীর বেঁচে থাকতে চায়। হাড়পাঁজরা যুক্ত গুড় আর ঘামের চটচটে শরীর এখন নিস্তেজ, ঘুমের ঘোরে আচ্ছন্ন। আলুথালু তার শরীরের ছেঁড়া লুঙ্গিটি— 'একটা কুকুর চেটে চলেছে তার তল পা দুটো। তার পিঠ, তার ঘাড়।'— তার দেহে লেগে থাকা শেষ গুড় টুকু। মাড়াইকলে আখের সাথে পিষ্ট হতে হতে চেপুলাল বেশরাও একদিন ছিবড়ে হয়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়।

বিস্তীর্ণ রাঢ় অঞ্চলের মধ্যে পুরুলিয়ার অধিকাংশ জায়গার ভূমিরূপ উঁচু নিচু ও জঙ্গলময়। অতিবৃষ্টির সাথে অনাবৃষ্টিও এই অঞ্চলের আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য। এখানকার পাথুরে মাটি ও উঁচু নিচু ভূমি ভাগ জল ধরে রাখার ক্ষমতা হারায়। তাই পুরুলিয়ায় খরা দেখা দেয়। বহু মানুষ এ কারণেই কাজ হারায়। জল দেখে বসতি নির্মাণের সঠিক এলাকা নির্বাচন করে। প্রয়োজনে খরাকে সম্বল করেই কর্মহীন কষ্টের দিনলিপি রচনা করে। সৈকত রক্ষিত পুরুলিয়ার অধিবাসীদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের সমস্যাকে তুলে ধরেছেন 'খরা' নামক গল্পের আধারে জলের ভয়াবহ, দুর্বিষহ ও মর্মস্পর্শী চিত্রের মধ্য দিয়ে। ডারহা গ্রামের পল্টন আর লখা— 'মাটি-কাটা, চালাঘর মেরামত করা যে কোন ধরনের কাজ যে কোনো খোরাকির বিনিময়ে এখন করতে রাজি।' ক্ষুধার্ত পেটে তাদের কাতর আবেদন— 'হামাদের টুকু-টুকু মাড়জল দাও বাবু। ভখে পেটটা শুঁকায় যাছে।' আর এই আবেদনে খড়ু সাড়া দিলে তারা টিনের কানা থালায় উপচে পড়া মাড় দেখে হাত মুখ না ধুয়েই গিলতে থাকে।

'খরা'য় অভুক্ত মানুষদের প্রতিনিধি পল্টন ও লখা। প্রকৃত অনাহারী ও বঞ্চিত মানুষের জ্বালা নিয়ে কাতরকণ্ঠে তারা বারবার আবেদন করে। প্রার্থনা জানায় প্রকৃতির কাছে— 'এবার সর্বগ্রাসী বৃষ্টি এসে ডারহার পুকুর খেত-খলিহান সবকে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাক!' তারা কুঁয়ো খুঁড়ে জল বের করে। কখনো বা শুকনো কুঁয়ো পরিষ্কার করে দু-পয়সা উপার্জন করে। গ্রামগঞ্জ জলের অভাবে শুকিয়ে যায়, এমনকি পাঁকের কচ্ছপ মরে যায়— 'জলের জীব ডাঙায় আর ক-দিন বাঁচে।' ডারহা গ্রামের পুরুষেরা ভিন্ গ্রামে কাজে যায়, আর মেয়েরা সারা সকাল কাঠ কুচি আর গোবর কুড়িয়ে কিংবা দু-গন্ডা গেঁড়ি-গুগলির প্রত্যাশায় পাঁক ঘেঁটে ঘেঁটে পুরুষদের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকে। বেলা ডুবে গেলে একটু একটু করে আলো জ্বলে ডারহা গ্রামে—

> "কাজ পাওয়া মানুষদের সঙ্গে কাজ না পাওয়া মানুষরাও সারাদিনের ক্লান্তি নিয়ে ফিরে আসে ঘরে। কোনো ঘরের চালা ফুঁড়ে বেরিয়ে আসে ধোঁয়া। জলে টইটম্বুর হাঁড়িতে বগ-বগ করে ফোটা ভাতের গন্ধ— খাটোয়া লোকদের ঘরে ঘরে জানান দেয় প্রকৃত ক্ষুধার বার্তা।" [১৮০]

গুইহা কলু ব্যবসায়ী। চাষীদের কাছ থেকে তিল-তিসি-লাক্ষা-তেঁতুল ইত্যাদি কম দামে কিনে শহরে চালান দেয়, পুঁজি বাড়ায়। এক ছেলে বেকার। কর্মহীন জীবন কাটায়— 'কারণবশত মানুষ অপেক্ষা প্রকৃতিকেই সে দায়ী করে।' দারিদ্র্যের চাপে অক্ষম আক্রোশ জাগে পল্টনের মধ্যে।

কখনো বা শিশুসুলভ চাষাড়ে অভিমান দেখা দেয় পল্টনের মধ্যে। আর ভাবে সিকি পেট আধ পেট খেয়ে ছেলে মেয়ে নিয়ে সে তার গার্হস্থ জীবন ধর্ম পালন করে যাবে। এভাবেই আস্ত একটা জীবন শেষ হবে— 'সে মৃত্যুও বড় গৌরবময়। নিজস্ব মাটিতে পড়ে একান্তই নিজস্ব মৃত্যু!' এই মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও তা সম্বল করে দু'দণ্ডের জন্য সংসারে টিকে থাকা— নির্জীবের মতো, অতি সংযমী হয়ে। হাঁটতে হাঁটতে পথের ঘরবাড়িগুলো দেখে তাদের ঢুকতে ইচ্ছে হয়, হিংসে হয়— রাগও। যেন প্রাচুর্যের কাছে নিঃস্ব মানুষের হাহাকার। কারা বা কে যেন তাদের বঞ্চিত করে রেখেছে। প্রকৃত অনাহারী বঞ্চিত মানুষের জ্বালা নিয়ে কাতর কণ্ঠে পল্টনরা বলে—

"বাবু, হামরা পেট-পেট করে মরে যাচ্ছি। কিছু কাম দেন। হামরা কুয়া ঝালাই। দেয়াল তুলি। চাল ছাওয়া-ছায়ি, চুন পচড়া করা, মাটি কাটা, খাট বুনা— সোব হামরা জানি।" [১৮১]

কাজ না পেয়ে একসময় হরিমন্দিরের চালার নিচে শুয়ে পড়ে পল্টন। খাঁ খাঁ গ্রামের দিকে পল্টন তাকিয়ে থাকে প্রচন্ড শূন্যতায় তার চোখ ছলছল করে। প্রচন্ড খরায় কাজের সন্ধানে ঝৈরা-ধানবাদ যাওয়ার কথা ভাবে। এদিকে ধনঞ্জয় জানায় 'গায়ে জল নাই। কাম হবেক কীসে ? তুমরা শহরে চল।' শহরের দীপকবাবুর ভাটায় প্রচুর মজুর দরকার। 'বেকার কামিয়া লোকরা এখন ইচ্ছে করলে সেখানে যেতে পারে।' দারিদ্র্যের পাল্লা বড়ো ভারী সত্ত্বেও গ্রাম ছেড়ে কাজে যেতে মন চায় না পল্টনের— 'গাঁ ছাইড়ে হামি যাব নাই লখা। তুঁই যা। না খাইয়ে শুকাঁয় যদি মরি, ত হামি গাঁয়েই মরব।' মাটির মানুষগুলির সাথে গ্রামকে ভালোবেসে পল্টনের মতো লেখকের বেঁচে থাকা। প্রকৃতির স্বভাবের সাথে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাকে গোটা জীবন ধরে মিলিয়ে চলার আনন্দে চরিত্রগুলি জীবন্ত রূপে গড়ে উঠেছে।

জীবন ও মৃত্যু যেন জল ও ভাটার আগুনে প্রতিস্থাপিত হয়েছে। 'খাদান' গল্পে হাবল বাউরির বিচিত্র জীবন ও জীবিকার পরিচয়ে প্রান্তিক মানুষের সামাজিক অবস্থান, পেশা ও পরিবার তন্ত্রের পাশাপাশি দুঃখময় জীবনকথা ফুটে উঠেছে। সারাবৎসর এরা পাথর খাদানে কাজ করে। এমন কি মেয়ে বউরা পর্যন্ত। মায়েরা এক হাতে ছেলেকে রক্ষা করে স্তন দেয়, অন্য হাতে হাতুড়ির ঘা মারে পাথরে। এখানেই শিশুরা খেলতে খেলতে বড় হয়, হামাগুড়ি দেয়, কাঁদে।

"একটি পাথর খন্ডের পিছনে এমনি কত কথা, কত প্রস্তুতি। কত শিশুর কান্না আর মায়ের আক্ষেপ নিহিত থাকে।" [১৮২]

এদের পুরুষেরা রাস্তায় বসেই গল্পগুজব করে, রাস্তার ওপরেই দড়ির খাটে বসে সময় কাটায়। ঘর বাহিরের এদের তেমন তফাৎ নেই। ঘরের সংসারের চেয়ে বাইরের সংসার প্রসারিত। খোলামেলা পাথুরে মাঠ আর অফলা খেত পড়ে থাকলেও ঘরের বড়ো অভাব মানুষগুলির। আর ঘরগুলি খুবই লাগালাগি, সংকীর্ণ বলেই বাহিরই তাদের ঘর। সকালে রোদ খাদানে পড়ার আগেই এরা খাদানের নির্দিষ্ট গর্তে বসে শাবল বা কোদাল দিয়ে মাটি ধসায়। আর সেই মাটি থেকে বেছে বেছে আলাদা করা পাথর নিজের এক্তিয়ারে ডাঁই করে রাখে, নিজেরই খোঁড়া গর্তে। তারপর জনার্দনের মতো দালালেরা এই ভাঙা পাথর ক্রয় করে বিক্রয় করে।

'পাথুরে মাটি ছেনে' যে গুটি গুটি ছোটো পাথরগুলো পাওয়া যায় সে গুলোয় আর হাতুড়ি লাগাতে হয় না, ঐ অবস্থাতেই সেগুলো বিক্রি হয়ে যায়। ছোট পাথর দিয়ে মেঝের কাজ হয় আর ছেঁচা পাথর দিয়ে ছাদ বানানো হয়। জলধর সিংহ ও তার বউ সরস্বতীদের চার ছেলে মেয়ে। পাথর ভেঙে সংসার চালাতে হয়। সরস্বতীও পাথর ভাঙে। ছোট মেয়ে ভারতী কান্না শুরু করলে দড়ির খাটে শুইয়ে দেয়, কখনো বা 'ঘরের ভেতর— মেঝেতে পড়ে থাকা— একটা শুকনো তালের আঁটি', মেয়ের হাতে ধরিয়ে দিয়ে হেঁসেলের কাজে যায়। এদের হেঁসেল বলে কিছু নেই— কেবল বড়ো মত একটা ঘর। সেই ঘরের

এক কোণে দেয়াল ঘেঁষে মাটির উনুন, ছড়িয়ে থাকা দু-একটা কাঁসা আর টিনের বাসন। উনুনের সামনে মাটির বেদিতে কালি পড়া ভাতের হাঁড়ি, খাপরি। ঘরটিতে একটিই পাল্লাহীন জানালা, আগল হিসেবে দেয়ালে রয়েছে গোটা পাঁচেক বাঁশের ফালি। এই ঘরই এদের হেঁসেল, আর এখানেই এদের দিন যাপন। অভাব থাকলেও খাদানকে ঘিরে গড়ে ওঠা জীবন বড় আনন্দের, অন্তত হাবলের কাছে। সারাদিন বাড়িতে বসে থাকার চেয়ে সাঁওদা আর বুড়ি শহরের মানুষেরা (জলধর ও তার বাবা মৈৎলাল) পাথর ছেঁচার মধ্য দিয়ে কাজ করার আনন্দ পায়। তাদের গ্রাম তাদের কাছে পারিপার্শ্বিক রুক্ষতা ও ধূসর ডাঙাজমিগুলোর থেকে যথেষ্ট প্রাণবন্ত। পাথর ভাঙলেই কাঁচা টাকা হাতে পায় তারা। চঞ্চল আবেগপ্রবণ হাবলের মনে তাই আনন্দ নিত্য সঙ্গী—

> "এখানে সবকিছুতে সে টের পায় হৃদয়ের নৈকট্য। যখন ঢালুতে আনমনে চরে বেড়ায় লোমকাটা ভেড়া, যখন গোধূলির মলিন আলোয় ছলকে ছলকে ওঠে দূরবর্তী ড্যামের জল, যখন মৃদু হাওয়ায় রিঙ-রিঙ করে কাঁপে খেজুরের পাতাগুলি, তখন খাদানের ওপরে দাঁড়িয়ে, হাবলের ইচ্ছে হয়, উত্তোলিত দু-হাত নিয়ে সে গেয়ে ওঠে পাথর ভাঙার গান।" [১৮৩]

মৌরসি পাট্টার মতো খাদানের কাজে পূর্ব পুরুষেরাও হাত দিয়েছে বলে এদের গর্ব হয়। জলধর-ভীমা-রামপদ-মৈৎলাল সিং অথবা হাবল বাউরি-নন্দ বাউরিরা তাদের মেয়ে বউদের খাদানের কাজে লাগিয়ে সংসার চালায়। পঞ্চায়েতের তরফে পাথর না কিনলেও এদের দুঃখ নেই। কারণ পাথর তো নষ্ট হবার নয়। সুড়ঙ্গ কাটা, হাতুড়ি মারা এদের যেন বংশগত অভ্যাসে ও অধিকারে পৌঁছেছে, তাদের অদৃষ্ট যেন ঠিক হয়েই রয়েছে। লেখক গূঢ়ার্থে বলেন—

> "তাদের প্রতিটি উদ্ধত আঘাতের মধ্য দিয়ে তারা যেন ভাঙতে চেয়েছিল নিজস্ব অচলায়তনকে, তাদের জীবনের সীমাবদ্ধতাকে। যে প্রয়াস আজও অক্ষুন্ন। তা অদৃষ্টকে খন্ডন করার যে সাধন এখনও অব্যাহত। অথচ তা যেন কিছুতেই খন্ডিত হয় না। খন্ডিত হওয়ার নয়। তখন মনে হয়, এই ধাতব অস্ত্র তবে কীসের জন্য ? কাদের জন্য ভেঙে ভেঙে গাদা করে রাখা এই পাথর ?" [১৮৪]

এটাই তাদের অখন্ড জীবন কথা, খন্ড পাথরের কথা নয়। প্রকৃত জীবন কথা, যে জীবন জুড়ে শ্রমের কথা ছোটো পাথরের মধ্য দিয়ে ছোটো ছোটো প্রত্যাশার কথা। হাবলের বউ রাধী গুগলীর খোল ছাড়িয়ে রান্না বসায়, মাঠ থেকে কুড়িয়ে আনা দু-লাদা গোবরে শুকনো ঘাস আর খড় মিশিয়ে সে ঘুঁটে দেয়। আর খাদানের সুড়ঙ্গে হাবল চাপা পড়ার খবর পেয়ে উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ছুটতে থাকে। ছেলেকে কাঁখে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বিহ্বল মুখে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হাবল বাউরি শেষ পর্যন্ত মারা যায়। কয়েকটা দিন পাথর ছেঁচার কাজ বন্ধ থাকে। আবার স্তব্ধ জীবনযাত্রায় যেন হাতুড়ির ঘা পড়ে। চলমান জীবনে হাবলের তীব্র অন্তর্জ্বালা যেন আকাশে বাতাসে মুখরিত হয়— 'বাবু হে, বল হামি বাঁচি কী উপায় ?'

'দাহভূমি' গল্পের মুটুক রলাডির কাছে বয়ে চলা টট্‌কো নদীর দিকে তর্জনি বাড়িয়ে জানতে চায়—

'ই লদী ত রোজই বঁহে যাছে ? কিন্তুক রোজই কথাকে যাছে ? কথাকে ?'— এ অনন্ত জিজ্ঞাসার কোন উত্তর নেই। আধ্যাত্মিক অজ্ঞানতায় তাৎক্ষণিক আবেশে গানের ভাষায় ক্লান্তি, অবসাদ ও অনাহারকে ভুলে থাকে মুটুক ও তার সঙ্গীরা। মুটুক ছেলে হলেও অদ্ভুত পেশায় দিন কাটায়। সে মেয়েদের সাজ পোষাক পরে নাচতে নাচতে দর্শকদের আনন্দ দেয়। দু'পয়সা দর্শকদের কাছ থেকে পায়, সংসার চালাতে সুবিধা হয়। প্যামচাদ, যুধিষ্ঠির, রূপচাঁদরা সংসার চালাতে অদ্ভুত পেশা বেছে নেয়। নদীর হাঁটুজলে নেমে জল খেলিয়ে খেলিয়ে সোনার রেণু ছেঁকে জড়ো করে—

> "কেউ খাদের মাটি ধসকায়। ঢ্যালা ভাঙে। কেউ সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকে তারের কাঁত্তকা দিয়ে মাটি চেঁছে নামায়। পাথর আলাদা করে দেয়। আর দু'জন এক এক পাটা করে সেই মাটি নিয়ে স্রোতে গিয়ে দাঁড়ায়। তারপর মাটিসুদ্ধ পাটাটাকে চালুনির মতো খেলাতে খেলাতে, একেক বার তার ওপর দিয়ে স্রোতের জলটাকে পার করে দেয়। তাতে একদফা মাটি ধুয়ে যায়। আবার সেটাকে খেলায়। আবার ধোয়।" [১৮৫]

এইভাবে মাটি থেকেই ধোয়া মিহি মিহি কালো বালির সঙ্গে মুটুক দেখতে পায় চিক চিক করা সোনার রেণু। এক জায়গায় সোনার সন্ধান না পেলে নদীর কোল বরাবর আরেক জায়গায় খাদান বানায়। কেবল মুটুকরাই নয় টট্‌কো নদীর দুই পারের লোকেরা নদীর ধারে ডেরা বেঁধে এই কাজ করে। সারা বছর এই কাজ হয় না তাই মুটুকের ছেলে হারামনকে সে কয়েক মাস খাওয়াতে পারেনি এমন কি তার মা গুপ্তমণিও অনাহারে দিন কাটায়। খরা পীড়িত গরীব-দুখীদের খেঁচুড়ি বিতরণের খবরের সন্ধান নেয় রূপচাঁদের কাছে। বড় অসহায় মানুষগুলি পার্টির তরফে রাস্তা মেরামতের কাজে যোগ দেয়— মাটি কাটে, রাস্তায় ফেলে আর দু'পায়ে মাড়িয়ে সমান করে দেয়। কিন্তু এই কাজ স্থায়ী হয়নি মুটুকের। হাজিরা খাতায় তার নাম বাতিল হয়, অথচ বাদ যায় না রূপচাঁদের নাম। যে কিনা পঞ্চায়েত বাবুর তোষামুদে ব্যক্তি। তাই মুটুকের মতো সরল মানুষেরা চেষ্টা করেও বুঝতে পারেনি কাগজে নাম না ওঠার কারণ। লেখক বলেন— 'তবু রাস্তা তো এগিয়ে যাচ্ছে ? আর তাই নিয়ে এই খরাপীড়িত দরিদ্র মানুষগুলোর খাওয়াখায়িও বেড়ে চলেছে।'

রলাডিগ্রামের অভাবী মানুষেরা মরেও শান্তি পায় না। ভূমিহীন দরিদ্র বলে কোনো লোক মারা গেলে গ্রামবাসীরা তাকে দাহ করে না। দাহ করার খরচ তাদের নেই। তাই তারা মৃতদেহকে মাটি চাপা দেয়। তবে পরিত্যক্ত ও নির্জন জায়গায় শ্মশানটি। প্যালারামের মতো মানুষেরা ভয়ে এই স্থানের পাশ দিয়ে যায় না— ভূতের ভয়। মুটুক বহুরূপী পোষাকে নৃত্যের তালে তালে মানুষদের আনন্দ দেয়। কুড়ি টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক কর্মীদের কথা মতো তাকে নাচতে হয়। সারাবছর সোনা বাছার কাজ নেই। তাই ভিন্ন পেশায় তাদের পেট চলে। মুটুকেরা অন্য পেশায় কাজ পায় না। সত্যি সত্যিই নাচতে না চাইলে উপায় নেই—

> "এই খরা অনাবৃষ্টি আর অবহেলিত গ্রামীণ জীবন তাকে নাচনি করেই রাখতে চায়। সে নাচেও। সব প্রতিকূলতার মধ্যেও।" [১৮৬]

এটাই তাদের দৈনন্দিন জীবন। যে জীবনে নাচতে গেলে সুরমা পরার জন্য— 'লম্ফ রাখা কুলঙ্গি থেকে ভুসা নিয়ে কাজল হয়।' সেই কাজল পরতে পরতে ব্যস্ত হয় নাচনির পোষাকের জন্য। পাউডারের সাথে সিঁদুর মিশিয়ে দু'হাতে মুখে গালে আর কপালে ভালো করে বুলিয়ে নেয়। ছিট কাপড়ের একটা ছোট প্যান্ট পায়ে গলিয়ে সে লুঙ্গিটা আলগা করে কোমর থেকে ফেলে দেয়। লাল সায়া পরে, নাভিতে টান দিয়ে গিঁট বাঁধে। শক্ত করে ব্লাউজ পরে। শাড়ি পরে, চুল বসায়। চুলে ঘাড়ের কাছে আটকে নেয় একটা সোনালী ক্লিপ। এরূপ বেশধারী স্বামীকে গুপ্তমণি যেন চিনতেই পারেনি। তার না চেনার কারণ এত সাজের পারিশ্রমিক মাত্র 'কুড়ি টাকা দিয়ে গেছে আর নাই দিবেক ?' আর ক্ষুধাতুর মুটুকের পেটে দেবার মতো কিছুই নেই। সকালের দিকে দুহাতে জামবাটি ধরে যেটুকু বাসি মাড়ভাত খেয়েছিল, তার ভরসাতেই সে চৌকাঠের বাইরে পা দেয়। লেখক এদের চিরন্তন পথ চলার সাথী হয়ে গেছেন—

> "আল থেকে নেমে, মুটুক হেঁটে যায় পাকদন্ডী ধরে। ঘুঙুর বাজে।" [১৮৭]

রাঢ় অঞ্চলের লোকক্রীড়া কেন্দ্রিক একটি গল্প 'বয়ার কাড়া'। গল্পকার সৈকত রক্ষিত কৃষিভিত্তিক জীবনযাপনে নিঃসঙ্গ ও একঘেয়ে মানুষের প্রতিনিধি হয়ে চলমান সভ্যতার প্রত্যক্ষ ছবি এঁকেছেন। স্বাস্থ্যবান লড়াকু কাড়া (মোষ) হল 'বয়ার কাড়া'। সাগরাম সর্দার খরার সময় কাজ না পেয়ে গ্রাম ছেড়ে বর্ধমানে কদিন খেটে একটা মোষ কিনে আনে। এই মোষের শিংগুলিই বয়ার কাড়ার প্রধান শর্ত—

> "শিংদুটো ছোটো এবং অবশ্যই অর্ধবৃত্তাকার হবে। আগা হবে ছুঁচলো। তবেই সে লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে তেড়ে গিয়ে ঘায়েল করতে পারবে। মাথার সঙ্গে মাথা বসিয়ে তাকে চেপে ধরতে পারবে তাকত দিয়ে।" [১৮৮]

সাগরাম তার কাড়ার মধ্যে লড়াইয়ের সমস্ত বৈশিষ্ট্য দেখতে পায়। আর তার জন্য ভাদ্র থেকে দেড়মাস ধরে মোষকে মাঠে ছেড়ে রাখতে হয়। ঘাসপাতা আর শীত-শিশির খেয়ে স্বাস্থ্য ফিরে। লড়াকু কাড়া হয়ে ওঠে। গ্রামের মানুষদের মধ্যে কাড়া তৈরির কথা হয়। তারা সবাই পিয়ারশোলের। কাড়া লড়াইয়ের আয়োজনের পাকা কথা স্থির করে। আর ধান পাকার সাথেই খামারে তোলে, ঝাড়ে। প্রকৃতির সৃষ্টি ও প্রাচুর্যের প্রতি বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে ধানের দিকে। গতবারের খরার কথা ভেবে নিজেদের অদৃষ্টের দোহাই দেয়। এত ধানের উৎপাদন সত্ত্বেও কেন যে দারিদ্র্য তা ভেবে পায় না—

> "এই ধানেই নিহিত থাকে যত বিস্ময়। যত করুণ কাহিনীও। তথাপি, কোনো কারুণ্যই স্পর্শ করতে পারে না সাগরামকে। গ্রামের অনেক মানুষের মতো, সে— ও, তার জীবনের প্রতিকূলতাকে স্বাভাবিকভাবে এবং ঐতিহ্যময় মনে করে।" [১৮৯]

সাগরামের মধ্যে কোনো প্রতিবাদ বা প্রশ্নের উদয় হয় না। আসলে সৈকত রক্ষিতের চরিত্রগুলি চলমান সমাজের জীবন্ত মানুষ। কোন প্রতিবাদের ভাষা তাদের মধ্যে দেখা যায় না। যেমন সাগরামও প্রকৃতির পরিচালনায় প্রকৃতির সন্তানের মতোই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে বেঁচে থাকে। তবে যে কোনো পরিস্থিতিতে সাগরাম হুল্লোড়, ফূর্তি করে, ঝুমুর গায়, হাঁড়িয়া খেয়ে তুলকালাম নাচে। নিজের জোড়া-বউকে খেমটি নাচিয়ে সেই পয়সায় হাঁড়িয়া খেয়ে মেতে থাকে। আর এই মেতে থাকার জন্যই কাড়া লড়াই। কাড়া

লড়াই-এ প্রাইজ হিসেবে 'টেবুল ঘঁড়ি' 'তিন সেলের টচ্‌লাইট' ঘোষণা করে।

নির্দিষ্ট দিনে শিঙা বাজিয়ে লড়াই শুরু হয়। লড়াই-এর মাঠে দোকান বসে। জিলিপি, চপ, আটার গুলগুল্লা, মিঠাই সাজায় দোকানিরা। জড়ো হয় লোকজন। ঢোল-ধামসা বাজলেও লড়াইয়ের সময় থেমে যায়, মোষগুলি ভয় পাবে বলে। পরপর লড়াই চলে, তর্কাতর্কি হয় আবার থামে। অবশেষে সাগরামের কাড়া যুদ্ধে নামে। এই যুদ্ধ কাড়ার নয় মানুষের সঙ্গে মানুষের ইজ্জত বাঁচানোর। সাগরামের কাড়া প্রতিপক্ষের কাড়াকে হারিয়ে দেয়। গ্রামবাসীরা উল্লাসে মেতে ওঠে। সাগরামকে সবাই বাহবা দেয়। দারিদ্র্য আর ঝুমুর সাগরামের নিত্যসঙ্গী। তাই এই আনন্দ তার চোখে জল এনে দেয়। এই জয় ও সম্মান কেবল ধনী গরিবের জন্য নয়— ভালোবাসার ও মানবিকতার জন্য। যে কাড়াকে সে পাঁচদিন ধরে বর্ধমান থেকে নিয়ে এসে বয়ার কাড়া করেছে। আজ তারই জয় বিশ্বাসের ও কর্মের জয়। ভালোবাসার মানুষগুলির সমবেত জয়। তাই পিয়ারশোলে ফিরে ওরা ফূর্তিতে কাড়া-নাকাড়া বাজায়। নিমগাছে হ্যাজাক লাইট টাঙিয়ে মাগনের চালডালে কাঙালি ভোজন করিয়ে আনন্দ পায়। 'দীর্ঘদিনের অভুক্ত অনাহারী গ্রামবাসীরা সেই প্রথম সুযোগ পেল দশে মিলে পেট পুরে খাওয়ার।'— অভাবী মানুষগুলির এই মিলনোৎসবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী যেন সৈকত রক্ষিত। মাদলের তালে তালে নিমতলার আসরে সাগরাম গানে সবাইকে মাতিয়ে রাখে—

> "সারারাত ধরে চলে জমজমাটি আসর। সেই একটি রাত। গ্রামবাসীদের সরব উপস্থিতিতে ডুংরির চাটান পাথরে ডেকে ওঠে না কোনো ধূর্ত শেয়াল। সেই একটি রাত, মাদলের শব্দে তারা জাগিয়ে রাখে নিজেদের!" [১৯০]

বিবাহিতা নারীর সন্তান না হওয়ার যন্ত্রণা নির্ভর গল্প 'বাঁজা'। খাদানের কাজে ব্যস্ত গুড়ধন বাউরির বউ বালিকা বাউরি চারবছর ধরে নিঃসন্তান। দেখতে দেখতে বালিকার বয়স ষোল পেরিয়ে গেছে। বাঁজা বউয়ের কপালে নিন্দা-কলঙ্ক লেপন গ্রামের মানুষের কাছে আনন্দের ও মুখরোচক বার্তা। গুড়ধনের মনে তাই কোন সুখ নেই, বাঁচার ইচ্ছে নেই। 'সুন্দর লাজুক এবং অন্তর্নিহিত আবেদন সর্বস্ব এই কোমল মেয়ে মানুষটির কোনো কদর নেই তার স্বামীর কাছে। স্ত্রী'র কাছে এর চেয়ে চরম অবমাননা কী হতে পারে?'— এমন সহানুভূতির বার্তা ঘোষণায় লেখকের দরদীমন ধরা পড়েছে। নারী পুরুষের ভালোবাসার সংসার জীবনে নবজাতকের আবির্ভাব যে কত সুখ শান্তি এনে দেয় এই গল্পে তারই ছবি আঁকা হয়েছে—

> "যে সংসারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম নেই, প্রাণের উচ্ছ্বাস নেই, নবজাতকের ক্রন্দনধ্বনি নেই, যেখানে ভালোবাসাহীনতায় নারী তার পুরুষকে দেখলে প্রতিদিন অল্প অল্প করে সংকুচিত করে নেয় নিজেকে, সেটা শ্মশান ছাড়া আর কী?" [১৯১]

শাশুড়ির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বালিকা একদিন মা হতে পারে। সে এক সাধুবাবার কাছে বালিকাকে নিয়ে যায়। কারণ বউ ব্যাটার তিক্ত সম্পর্কে মা-ও অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। সাধুবাবা মাদুলি দিয়ে বালিকাকে ভরসা যোগায়। বটগাছের তলে জমাট অন্ধকারে সাধুবাবার সাথে সাক্ষাত করতে যায় বালিকা। ভয় অপবাদ চোখে জল দেখে সাধু বলে— 'তোর ক-ন দোষ নাই। তুঁই পবিত্র। নিষ্পাপ। পাপিষ্ঠা নারীর

চোখে কখনও জল আসে না। তাহলে তোর কাকে ভয়।' বালিকা দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করে তার স্বামীকেই ভয়। অশিক্ষার অন্ধকার থেকে আলোকিত সমাজে চিরাচরিত অজ্ঞতাকে দূর করার চেষ্টা করেছেন গল্পকার। সমাজের এক অন্ধ বিশ্বাসে অপবাদময় জীবন যন্ত্রণায় মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যর্থতায় পৌঁছে যায়। দাম্পত্য জীবন আকণ্ঠ জ্বালায় বেঁচে থাকে। যে সমাজের আলোকিত অংশ থেকে নারীকে অন্ধকারে হাত ধরে পৌঁছে দেয় সুখের আশায় পবিত্র হবার জন্য সেই সমাজের একজন স্বামী হিসেবে গুড়ধনই তো প্রকৃতপক্ষে অপরাধী। আর বালিকা নানান পরীক্ষায় উত্তীর্ণা দুঃসাহসিনী। তাই সাধুবাবা নিজেকেই অপরাধী বলেছে। 'নিপীড়িত নারীর ভেতর যে তেজ, যে সর্বগ্রাসী আগুন রয়েছে তাকে তাচ্ছিল্য করা যায় না।' তাই সে বালিকার চোখে জল মুছিয়ে দেবীত্বের প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। নারীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় বাঁজা গল্পের মূল ভাবনা যথেষ্ট তাৎপর্যে পৌঁছেছে। যে স্বামী, স্ত্রী'র সম্ভ্রম রক্ষায় অপারগ, সে স্বামী হিসেবে কতটা সমাজ সচেতন ও ভালোবাসার প্রতি দায়বদ্ধ সে কথা সাধুবাবাই বলে দিয়েছেন—

> "পতি দেবতা ? যে স্বামী বিয়ের চার-চারটা বছরেও বউয়ের পেট ভরাতে পারে না, সে আবার কী দেবতা ? সে তো চন্ডাল! তুই চন্ডালকে ভয় পাস ? তাহলে তোর পেটে কোনোদিনই সন্তান আসবে না! চন্ডালের ঘরে ভগবানের দান আসে না। যাহ্ তুই!"[১৯২]

আসলে সাধুবাবাকে মেয়েটি ভয় পায় নি। এই সমাজ, স্বামী, ঘর-সংসারে তার ঘৃণা জন্মেছে বলেই নির্ভয়ে রাতের অন্ধকারে ঘর থেকে বেরিয়ে সাহস দেখিয়েছে বালিকা দুঃসাহসিনী নারী। এই সাহস ও প্রতিবাদী মানসিকতার জন্যই তার বদনাম চিরতরে মুছে যাবে বলে সাধুবাবা আশ্বস্ত করে চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন।

সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার নিয়ে তারাশঙ্করের 'ডাইনী', মহাশ্বেতা দেবীর 'ডাইনী' গল্প বাংলা সাহিত্যের অন্যতম গল্প হিসেবে বিবেচিত। এইসব গল্পে দেখা যায় চিরকালীন প্রথার কাছে অসহায় হয়েছে কোন না কোন মানুষ। যেখানে গল্প বয়ানে কুপ্রথার ভয়াবহ রূপ জীবন্ত। সৈকত রক্ষিতের 'ছল' গল্পটি ডাইনী প্রথাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। তবে এখানে গল্পের মূল ভাবনায় মানুষের মধ্যে হত্যা নয় ভালোবাসার প্রচার ও বেঁচে থাকা বা বাঁচিয়ে রাখার বার্তা শোনা যায়। ডাইনী প্রথায় একই সমাজের মধ্যে বসবাসকারী মানুষেরা অশিক্ষার অন্ধকারে বোধবুদ্ধিহীনতার জন্য সামান্য সমস্যাকেই ব্যক্তিগত রোষানলে ঠেলে দেয়। একঘরে করে সেই পরিবারের সদস্যকে। তাছাড়া সামাজিক বয়কট, বিতাড়ন, প্রহার, অগ্নি সংযোগ ইত্যাদি ভয় দেখিয়ে সমাজচ্যুত করে। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাপনের পথ দুর্গম হয়। হত্যার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্তি ঘটে। কারো অসুখ, মৃত্যু বা ফসলহানির মতো সমস্যা দেখা দিলে তা কোন না কোন মানুষের চক্রান্ত বলে এদের সমাজ অতি সহজে বিশ্বাস করে। আলোচ্য 'ছল' গল্পে জারাটাঁড় গ্রামের সাঁওতাল পরিবারের সদস্যরা প্রাকৃতিক কারণে চাষের ক্ষতির জন্য চিন্তিত হয়। সঠিক তথ্য জানতে তারা দূরবর্তী দুলদুলি গ্রামে সখাবাবার কাছে যায়। সখাবাবা বলে 'গ্যারামে নাশন আছে। এই নাশন আইসেছে পূবের গাঁয়ের ল্যা। আজ লয়, ঢের দিন ল্যা উ তদের গাঁয়ে ঢুকে আছে। মানুষের দল করে।'

গ্রামে ফিরে এসে সাঁওতালরা মিটিং বসায়। রামলাল হাঁসদা গলা ফুলিয়ে সখাবাবার কথা ঘোষণা করে, সে নিজেই সবার সামনে বলে ধলডাঙি থেকে যে 'বিটিছেল্যা আইসেছে হামাদের গ্যারামে' সেই প্রকৃতপক্ষে ডাইনী। আসলে কালসুলি হাঁসদা ধলডাঙি গ্রামে বিয়ে হওয়ায় তার বউ-ই ডাইনী। সে সকলের সামনে প্রতিবাদ করে বলে—

''নাই! নাই! তুমরা হামার বউকে মিছামিছি ডাইন করে দিঅ না!'' [১৯৩]

কালসুলির কথায় কেউ কর্ণপাত করল না। রামলালের পাশাপাশি গ্রামের অন্যান্য মোড়লরা বলে—

''উ হামাদের জারাটাঁড়কে শ্মশানপুরী করে দিবেক। যদি বল্, ক্যানে ? উয়ার ভিতরে ডাইন আছে। ভূত আছে।'' [১৯৪]

কিন্তু এই অপবাদের বিচার ব্যবস্থাকে কালসুলি ও তার বাবা মানতে চায় না। উপস্থিত গ্রামবাসীরা অবিশ্বাসের কথা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে তাদের প্রহার করে। কালসুলির বউ কালিন্দীকে টানতে টানতে পাঁচ জনের বিচারালয়ে আনা হয়। একটি পরিবারের সবাই সকলের সিদ্ধান্তের কাছে মাথানত করে মেনে নিতে বাধ্য হয়— ডাইন, ভূত আছে। আর স্বীকারের সাথেই জরিমানার কথা ওঠে। কালসুলির বুড়ি মা হাতজোড় করে মাফ চায়। কিন্তু রেহাই পায় না। গ্রামবাসীরা কালিন্দীকে গ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দূরে তাড়িয়ে দিতে চায়। কালসুলি তা চায় না, জরিমানা হলে তাড়িয়ে দেওয়া কেন, তাছাড়া সে তো মানুষ খায়নি আর মানুষ খেলেই কালসুলি নিজের হাতে ডাইনীকে (কালিন্দীকে) মেরে ফেলার প্রতিশ্রুতি দেয়। তাতেও গ্রামের লোক মানে না। তবে পুনরায় সিদ্ধান্ত হয় ডাইনী একা পেলে মানুষ মারে তাই একটা ঘরে ডাইনীর সাথে রাত কাটালে তার প্রমাণ মিলবে। স্বামীর অধিকারের সীমানায় বিচার চলে এলে কালসুলি আপত্তি জানায়। কিন্তু আপত্তি টেকে না। পরপুরুষের সাথে কালিন্দীকে রাত কাটিয়ে প্রমাণ করতে হবে সে ডাইনী নয়। গল্পকারের এই সিদ্ধান্ত সমাজভাবনায় নতুন পথ দেখায়। সমাজের মোড়লদের চিন্তার স্তরকে বিচলিত করেছে। ডাইনীর মতো দেখতে কালিন্দী ছিল না—

''বর্ষার বানডাকা কাঁসাইয়ের মতো তার শরীরে যৌবন অবিরাম কুলুকুলু করছে।'' [১৯৫]

হয়তো সেই আকর্ষণেই রামলাল কালিন্দীর সঙ্গে রাত্রিবাসের পরীক্ষায় রাজি হয়। যে রামলালের চিৎকার ও যুক্তিতে কালিন্দী ডাইনীতে পরিণত হয়েছিল। তার সত্যতা প্রমাণের জন্য রামলালই একমাত্র যোগ্য বলে লেখকের সুস্থির সিদ্ধান্তে পাঠক যথেষ্ট কৌতূহলী হয়ে পড়ে। রামলাল একটি টাঙি হাতে কালিন্দীর সাথে রাত কাটাতে ঘরে ঢোকে। বাইরে জনতার জাগ্রত দৃষ্টি, কোলাহল। কালিন্দীর ভয় রামলালকে। কালিন্দীর কাতর আবেদন ছিল— 'হামি ডাইন লই গো! কপাট খুল! হামকে খাইতে দে!' লেখক এই নারীর গৃহত্যাগের পর সামাজিক অবস্থানকে নানা প্রশ্নে বেঁধে রেখেছেন। কালিন্দীকে ডাইনী অপবাদে জরিমানা নেওয়া হয়। রাতের পর ডাইনী প্রমাণ না হলে জরিমানা ফেরত দিতে হবে। আবার সকালে ডাইনী ঘোষিত হলেও জরিমানা পুনরায় দিতে হবে। তার সাথে প্রহার, মৃত্যু। এইসব সমস্যা কালিন্দী রামলালের কাছে শুনে বুঝেছে বড় ফাঁদে সে পড়েছে। এমনকি জরিমানার ভাগ রামলাল পাবে। আর ডাইনী বউ নিয়ে কালসুলির জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। এই অন্ধকার ঘরে বসে রামলাল

কোনটাই চায় না। সে চায় কালিন্দীকে যা কিনা তার দীর্ঘ দিনের 'গোপন চাওয়া।' এই কঠিন সমস্যার হাত থেকে প্রাণে বাঁচাতে পারে একমাত্র রামলাল। রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাওয়া ছাড়া কালিন্দীর কোন পথ ছিল না। সামাজিক সমস্যাকে একটি ঘরে আবদ্ধ করে ভালোবাসার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়েছেন গল্পকার।

দোষী ও বিচারক যেন একঘরের আলোয় নিজেদের মানুষ বলে ভাবতে পেরেছে। বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার একটি সমাধান সূত্রে গল্পকার মনুষ্যত্বের জয় ঘোষণা করেছেন। রাত্রি জমাট অন্ধকারকে দূর করার জন্য যে ডিবার আলোটি প্রজ্জ্বলিত ছিল তা নিভে গেলেও ভালোবাসার বন্ধনে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। আর সেইজন্যই কালিন্দী পরপুরুষের সাথে রাত্রিবাসে সংকোচ, ভয় ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণের কথা ভেবেছে। আর ভেবেছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। এখানেই ডাইনী প্রথার বিপরীতে লেখকের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়েছে। কেবল পুড়িয়ে মারা বা বিতাড়ন, অপবাদ নয়; সমস্যার গভীরে না গিয়েও গল্পকার গল্পের বয়ানে মানুষের সহমর্মিতা ও সহানুভূতির প্রকৃত স্বরূপ জাগিয়ে ভালোবাসার বেষ্টন তৈরি করে দিয়েছেন। রামলাল ও কালিন্দী গাঁ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। আর রামলালও তার বাঁচার সঠিক পথের সাথী হতে চেয়েছে চিরদিনের মতো—

> "কালিন্দী কিছুই বলে না। সে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার কান্নার শব্দ গোপন করতেই রামলাল তাকে বুকের কাছে চেপে ধরে। আর ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দেয় ডিবার আলোকটিকে।" [১৯৬]

অন্ধবিশ্বাস চিরতরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে প্রেমের রসঘন পরিবেশে গোপন প্রদীপটি জ্বালিয়েছেন গল্পকার। এভাবেই পাঠকের মনোভূমিকে আচ্ছন্ন করে রাখেন সৈকত রক্ষিত। রাঢ়বঙ্গের মানুষের প্রিয় সাথী হয়ে গল্পকার শিল্পের রূপটিকে মানুষগুলির সাথেই ফুটিয়ে তুলেছেন। লেখকের এই জীবন দৃষ্টি ও সমাজ ভাবনায় গল্পের সৃষ্টি কৌশল আজও অম্লান রয়েছে।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়

রামকুমার মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের সত্তরের দশক পরবর্তী সময়ের একজন বিদগ্ধ ও সমাজ সচেতন লেখক। নিজের সময়ের গন্ডিতে সৃষ্টির পরিসরকে বিশ্লেষণের আলোয় উপস্থাপিত করার জন্য বহমান জীবনে ডুবুরির মতো তাঁর উপস্থিতি। তাঁর আখ্যান-বিন্যাসে সামাজিক অন্তঃস্বরের উপস্থিতি যেমন আছে তেমনি নির্মিত প্রকরণের গুরুত্বকে তিনি সযত্নে লালন করেছেন। তাই ছোটগল্পের তত্ত্বরূপের মধ্যেই গল্প বিশ্ব নির্মাণ করেন। তিনি গ্রামীণ জীবনের গল্প লেখেন। গল্পের অন্তর্বয়নে বিভিন্ন স্তরের মানুষ পাঠকের অনুভবে জাগ্রত থাকে। যেখানে লেখক সেই আবহ নির্মাণের কৌশলে গ্রামীণ জীবন বৃত্তান্ত কথা, কঠিন সংগ্রামী মানুষদের কথা, ফুটিয়ে তোলার আনন্দে বেঁচে থাকেন— বাঁকুড়ার লোকসংস্কৃতি ও লোকজীবনের মধ্যে। 'প্রতিক্ষণ' (১৯৯৪) প্রকাশিত 'রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প' সংকলনের ভূমিকায় লেখক অন্তরের কথা বলেছেন—

> "আমার বেড়ে ওঠা বাঁকুড়া জেলার একটি গ্রামে, রাঢ় বাংলার সংস্কৃতি ও সমাজের মধ্যে। তুসুগান, বাউল, রামায়ণ, কীর্তন এসব নিয়ে আমার শৈশব ও কৈশোরের জগৎ।"

এ দেশে কংগ্রেসি শাসনের আলগা সময়ে এ রাজ্যে বামপন্থীদের ক্ষমতায়ন, নকশাল আন্দোলন, জরুরি অবস্থা, পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার ইত্যাদির মধ্যে গ্রামীণ জীবনে অতি সাধারণ মানুষের সামাজিক অবস্থানের নিখুঁত পরিচয় দিয়েছেন গল্পকার। অর্থনৈতিক পরিকাঠামো, উদারনীতি, রাজনীতির খেলায় হারজিত আমাদের জীবনের প্রত্যন্তে যে প্রভাব ফেলে তা যেমন বহিরঙ্গ তেমনি অন্তরঙ্গে মনের গহন প্রদেশে বহমান জীবনের ছবি আঁকেন রামকুমার। সেখানে কেবল গ্রামীণ জীবন নয় সময় ও স্থান পরিবর্তনের ফলে নিজের অবস্থানের সাথে চরিত্রেরাও সচল গতিশীল সজাগ ভাবে অঙ্কিত। তাই গল্পের মধ্যে শিষ্ট ও লোকায়ত সমাজের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন ধরা রয়েছে। বাঁকুড়া জেলা বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে যত গরম হয়, পৌষ-মাঘ মাসে ঠিক ততটাই শীত হয়। রামকুমার বলেন—

> "এ সবই বাঁকুড়া জেলার পাথর-কাকরের কারণে। তাই হাসি কান্না, শোক-আনন্দ, সুখ-দুঃখ সবই খানিক বেহিসেবি। অন্যদিকে ঘর ও পথ, সংসার ও বৈরাগ্য, জীবন ও মৃত্যু কেমন যেন জড়াজড়ি থাকে। কে যে কবে ঘর বাঁধে আর কবে ছাড়ে, কে কখন প্রাণ দেয় আর কখন কাড়ে তারও হিসেব মেলে না সময়ে সময়ে। এ— জীবনেরই কিছু কথা তিন-সাড়ে তিন দশকের এই সব গল্পে।" [১৯৭]

তবে কেবল বাঁকুড়া জেলার মধ্যেই গল্পের প্লট সীমায়িত নয় পড়শি পুরুলিয়া, বর্ধমান জেলার কথা পূর্ব

বাঁকুড়ার গাঁ-ছুঁয়ে হুগলি জেলার সাথে লেখকের যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল।

ভারতে আর্যবর্ণীয়রা দীর্ঘকাল আধিপত্য বিস্তার ও ক্ষমতার শীর্ষে থাকার ফলে অন্যদের নীচ করে, ছোটো জাতি করে, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য দলিত করে সমাজ নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি কুক্ষিগত করেছে। আর অন্যরা অবহেলিত ও শোষিত হয়েছে। রাজনৈতিক শাসন কিংবা ধর্মীয় বা অর্থনৈতিক শাসকের ভূমিকায় একশ্রেণির মানুষ অন্যদের বঞ্চিত করেছে বাঁচার স্বাভাবিক অধিকার থেকে। অবশ্য ভারতীয় সাহিত্য সাধকরা উচ্চবর্ণের মানুষ হয়েও প্রান্তিক মানুষদের কথা সাহিত্যের পাতায় তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' নাটক, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'মেথর' এবং নজরুলের কবিতায় সম্প্রীতির ভাবনায় প্রকৃত পক্ষে মানবহৃদয় ও মানব চরিত্রের কথা উঠে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে প্রান্তিক দলিত মানুষদের নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী, অনিল ঘড়াইরা শিল্প রচনা করেছেন। যেখানে কষ্ট, অভাবের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর সাথে রামকুমার যুক্ত করলেন গভীর অনুভবকে, ঘাস কাদামাটি ঘাম রক্ত জল ভরা চোখের মুখাবয়বের বাস্তব চিত্রকে। তাঁর ছোটগল্পের কথন ভঙ্গিতে পৌঁছে পাঠক অজান্তেই গল্পের অন্তরভুবনে রূক্ষ মাটির স্পর্শ গন্ধে বিভোর হয়। এই আবহ নির্মাণ কৌশল রামকুমারের নিজস্ব সৃষ্টি। গল্পে গ্রামীণ জীবনের নানা কথা উপজীব্য হলেও নগর জীবনের নানা প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। নিজের মধ্যবিত্ত সামাজিক অবস্থান কিংবা পেশাসূত্রে যে সব নাগরিক মানুষের সান্নিধ্যে এসে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তারাই গল্পের মানস সন্তান।

'পিকনিক' গল্পের মাধ্যমে লেখক পিকনিক পার্টির এঁটো-উচ্ছিষ্টের লোভে বেঁচে থাকা গ্রাম বাংলার নিরন্ন মানুষের প্রকৃত অবস্থানকে তুলে ধরেছেন। আর মিলিয়ে দিয়েছেন গ্রাম ও শহরের মানুষদের। যাদের ক্ষুধা এক হলেও জীবনযাত্রা খাদ্যসামগ্রী ও খাদ্য সংগ্রহের উপায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ গল্পে পদি বউ আর ফুল নগরের বউ-এর আলাপচারিতায় শহরের মোটরগাড়ি বর্ণিত হয় কাছিম গাড়িতে। শহরের ছেলে মেয়েদের যে উজ্জ্বল মেলামেশা, সেখানে পদি বউ লজ্জায় রাঙা হয়। সে দাম্পত্য জীবনের স্বাধীনতার ভাবনায় সুখ অনুভব করে। এই সুখানুভবের আবহে কলকাতার মুরগির মাংসের অসাধারণত্ব তাকে বিহ্বল করে—

> "ভরভর করে মাংসের গন্ধ আসে। পদি বউ বলে, 'কেমন বাস ছাড়ছে দেখছো দিদি!' বাস মানে! কত মশলা দিয়েচে! কলকেতার লোক!— " [১৯৮]

এই বিস্ময়ের বিপরীতে রয়েছে শহর থেকে আসা পিকনিক দলের সুস্বাদু খাবারের প্রতি গঙ্গি, সুদি, নেড়া, পদা, মদনা, গোবরাদের অপরিসীম অভুক্ত লালসা। পাতে ভাত তরকারি, মাংস, চাটনি, মিষ্টি, দই দেখে এরা লোলুপ দৃষ্টিতে অপেক্ষা করেছে উচ্ছিষ্টটুকু গলাধকরণ করার জন্য। কেবল এই ক্ষুধার্ত মানুষগুলি নয় এদের সাথে দুটো কুকুরও জিভের লালা ঝরিয়েছে। শহর থেকে আসা গাল ফোলা ছোট্ট মেয়েটির মাংস চিবানো, লালদই খাওয়া, চাটনি ও মিষ্টি গালে পোরার সাথে অভুক্ত গঙ্গির চোখ খাবারের পাতা ও মেয়েটির মুখ দেখে স্তম্ভিত। গঙ্গিও চোয়াল নেড়েছে সমান তালে মেয়েটির সাথেই। কিন্তু শহরের মেয়েটির স্বাদ কোরক তৃপ্ত এবং উদর স্ফীত হলেও গঙ্গি কেবল অভিনয় করেছে। গঙ্গি অবাক

হয় মেয়েটি পাতে খাদ্যের কোন অংশ না রাখার জন্য। সে বিস্মিত হয়— 'ভাবে কলকেতার তেঁতুল টক হয় না'। কিংবা টকটকে লাল দই দেখে সে অবাক হয়ে বলে— "কলকেতার গোরু' কেমন দুধ দেয় কে জানে!"

শহুরে মানুষেরা গ্রামীণ জীবনে প্রকৃতির সাহচর্য নিতে এসেছে। আর অন্যদিকে গ্রামে হত দরিদ্র অভুক্ত, অনাহারী মানুষগুলির কাছে সেই খাবার ও মানুষজন সবই যেন অলৌকিক। তাই এই বিস্ময়, এত কৌতূহল—

> "গঙ্গি মেয়েটার পাতের আরো কাছে গিয়ে দেখে এক কুচি মাংস। ক-খানা হাড়, আধ খানা মিষ্টি পড়ে রয়েছে। দইয়ের শেষটুকু পাতার পাশ দিয়ে গড়িয়ে গেছে। পাতাগুলোর দিকে চেয়ে আছে নেড়া, নেড়ার খুড়ি, গোবরা, মদনা সব্বাই।" [১৯৯]

পাতা ছেড়ে সবাই উঠে গেলে এরা সবাই দৌড়ে যায়— পাতায় পড়ে থাকা খাবারগুলোর দখল নেওয়ার জন্য। ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোও সামান্য খাবারের আসায় ছুটে যায়— পাতা চাটাচাটি করে। ক্ষুধার্ত মানুষ ও ক্ষুধার্ত কুকুরের সামীপ্যে সামাজিক বিন্যাসে মানুষের প্রকৃত অবস্থান পরিচয় ও পরিবারতন্ত্রের নিরিখে অর্থনৈতিক কাঠামোকে তুলে ধরেছেন গল্পকার।

'হাভাতে' গল্পে গ্রামীণ জীবনকথার বেদনাময় চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। ছটি সন্তানের পিতা টেলু চক্কোত্তির পারিবারিক দৈন্যদশার কাহিনির সাথে কলকাতায় সন্তান হারানোর প্রসঙ্গ গল্পের বর্ণনাকে চূড়ান্ত মাত্রায় ঠাঁই দিয়েছে। দরিদ্র ব্রাহ্মণের বারবার সন্তান লাভ তাকে জীবন সংকটের মুখোমুখি করেছে। মন্দিরের গায়ে মাথা ঠেকিয়ে চক্কোত্তি বলে—

> "এত জন্মাচ্ছে, আর বুড়োটারে কেনে ? আমাকে নাও ঠাকুর।" [২০০]

তাঁর এ কথা দারিদ্র্যের অসহায়তা জনিত। পিংলের ভাই ডিংলে ঠাকুর মশায়ের দ্বিতীয় ছেলে। অতি লোভী ও রাক্ষুসে হওয়ায় টেলুর দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। 'ডিংলেটা হল বামুন ঘরের এঁড়ে'। সে তেলি, বাগদি, তাঁতিদের ছেলের সাথে ঘোরে, ঝরে পড়া আম কুড়োয়, হাত থেকে কেড়ে নিলে খিস্তি দেয়। বাপের কাছে (টেলুর কাছে) দিনরাত মার খায়। এতজন সন্তানকে সামলানোর দায়িত্ব টেলুর নেই। তাই ডিংলেকে কলকাতার মিষ্টির দোকানে রেখে আসতে চেয়েছে। বাসে করে আরামবাগ পর্যন্ত গিয়ে বাস বদলে আবার কলকাতার উদ্দেশ্যে ভরদুপুরে যাত্রা করে। সাথে গোবিন্দ গয়লা। ডিংলে খিদের জ্বালায় অস্থির হয়। সামান্য মুড়িতে তার পেট ভরে না। সে জ্বলজ্বল করে দেখে দোকানে কত ভালো ভালো খাবার অন্যরা খাচ্ছে। তাকে বুঝিয়ে মাইল স্টোন গুণতি করতে করতে কলকাতায় পৌঁছায়।

সূর্য ডোবার মুহূর্তে গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হয় চক্কোত্তিরা। গঙ্গায় স্নান সেরে তাদের চেনা মানুষ গৌরের বাসায় যাওয়ার কথা ভাবে। ডিংলে সিঁড়ির ধাপে বসে ছিল মুড়ির গামছা দুটো নিয়ে। গোবিন্দ গয়লা ও চক্কোত্তি স্নান সেরে পাড়ে এসে ডিংলেকে দেখতে না পেয়ে চমকে ওঠে। ডাক পাড়ে, খোঁজাখুঁজি শুরু করেও তাকে পায়না। অবশেষে ডিংলে হারিয়ে যায়। দরিদ্র চক্কোত্তি মনখারাপের পরেও বাড়ি ফিরে আবার নবজাতকের মুখ দেখে আঁতকে ওঠে। গল্পকার অভাবী মানুষের দৈনন্দিন জীবনকথাকে অতি

স্বাভাবিক বর্ণনায় নাটকীয়তা এনে সুখ-দুঃখের অবস্থানকে অনায়াসে চিহ্নিত করেছেন। সন্তান সুখের পাশাপাশি সঠিক প্রতিপালন ও সন্তান হারানোর মানসিক অবস্থাকে তুলে ধরেছেন লেখক।

'বউ, মেয়ে, অ্যালসেশিয়ান ও পাইপ' গল্পে নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে গ্রামীণ জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য ধরা রয়েছে। নিতান্ত সহজ, সরল তুচ্ছ প্রাণের সুখ-দুঃখের মতো গল্পের কুশীলব তাদের সাবলীল জীবনকথা বলেছে। মিলিটারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়া নিমাই বিশ্বাস মিলিটারি মেজাজসহ বউ, দুই মেয়ে আর একটা অ্যালসেশিয়ান কুকুর সমেত গাঁয়ের মাটিতে পা দিতেই গ্রামের সরল সাধারণ মানুষেরা তার আগমনকে সানন্দে গ্রহণ করে। উৎসুক্যে জানতে চায় ও দেখতে চায় এই নতুন পরিবারটিকে। দু'দিক থেকে সমস্যা দেখা দেয়। এক, বিশ্বাস মহাশয়ের দাম্ভিকতার জীবন। দুই, সহজে মেলামেশার অসুবিধে। আর গ্রামের মানুষেরাও অতি সহজে মিশতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে আপমান ও অভিজ্ঞতার তালিকায় জেরবার হয়েছে। কখনো কুকুর, বিশ্বাস মহাশয়ের বউ, আবার কখনো তার দুটি মেয়ে যেন গ্রামের লোকের কাছে রাজা ও রাজকুমারীর গল্পের মতো মনে হয়েছে।

শহুরে জীবন কাটানোর পর বিশ্বাস মশায় গ্রামের আটপৌরে জীবনে দীর্ঘদিন অনভ্যস্ত ছিল। বিশ্বাস মশায়ের দুই মেয়ের পোষাক, প্রসাধন জামা দেখে গ্রামের লোক চোখ তুলে তাকায়। কেবল মেয়েদের জ্ঞানচর্চা ও সৌন্দর্য বিবাহচর্চাই নয় কুকুরের নানা কাহিনিতে পাড়া ও গ্রামের লোক মজে থাকে, আনন্দ পায়, অনেক অজানা গল্পের শ্রোতা হয়। গ্রামের ছেলে হরিপদও ভালো জাতের কুকুর দেখে হাড় জিরজিরে কুকুরগুলোর বদনাম করে ঘৃণায় ভুলে থাকে। গল্পকার হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো শহুরে জীবনের সাথে গ্রাম্য জীবনের মেলবন্ধনের সুবিধা অসুবিধার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন এই একটি পরিবার ও তাদের সাথে থাকা একটা কুকুরের কর্মকথায়।

'দায়বদ্ধ' গল্পে কৃষক জীবনের সংগ্রামশীলতার পরিচয় ধরা পড়ে। গরীব কৃষক নিতাই ব্যাঙ্কের ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে বলদ কিনে সুখস্বপ্নের জাল বোনে! কিন্তু বলদটির অকাল প্রয়াণে স্বপ্নের বিভোরতা কেটে যায়। স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টায় কৃষক পরিবারের এইরূপ স্বপ্ন দেখা ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি লেখকের বাস্তব জীবনদৃষ্টির সার্থক রূপায়ণ। সামান্য জমিতে ভালো চাষ করে ফসল তোলার আশায় ব্যাঙ্কের ঋণে একটি বলদ কিনেছিল নিতাই। বাড়িতে ছিল একটি এঁড়ে বাছুর। সে ভেবেছিল বদল ও এঁড়েতে মিলে নিজের হালে নিজের জমি চষবে। গোরু থেকে হাল— হাল থেকে জমি— জমি থেকে মরাই— মরাই থেকে বস্তা বস্তা ধান, আর ধান থেকে— বউয়ের রঙের কাপড়, বাস সাবান আর যশুরে খরখরে চিরুণি। তখন বউ সোহাগে গলে যাবে। তিন ছেলে, বউ ও মাকে নিয়ে নিতাই-এর সংসার। অভাবের সংসারে সুদিনের আশায় বলদ কিনেছে সে।

এদিকে নেতাইয়ের বলদটার কদিন ধরে চোখ দিয়ে জল পড়ে। ঘাসে মুখ দেয় না। বদ্যিও দেখে যায়। একে পেটে টান তার উপর বলদের অসুখ, সংসার টানতে নাজেহাল নেতাই। শেষে পাঁঠাছানা বেচে বলদের ঔষধের ব্যবস্থা হয়। ব্লক থেকে ভেটেরেনারী ডাক্তার এসে গ্রাম্য জীবনের মানুষদের মানসিক চিন্তাভাবনার পরিচয় তুলে ধরেন। বকুনির সুরে বলেন— 'গাঁয়ের লোকের বদরোগ মরণ সময়

ডাকবে ডাক্তার।' আসলে আর্থিক সামর্থের সাথে খরচের ভাবনা চলে আসে বলেই গ্রামের মানুষের প্রতিনিধি নিতাই ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারেনি। তা না হলে ডাক্তার ঘরে যাওয়ার পরই বলদটিও ঝুলতে ঝুলতে ভাগাড়ে গেল চিরবিদায় নিয়ে। চাষ করে ফসলের অর্থ দিয়ে ব্যাঙ্কের ঋণ শোধের স্বপ্ন নিতাইয়ের অধরাই থেকে যায়। গ্রামের মানুষকে আর্থিক সহায়তার সুযোগ দিলে তার যথাযথ ব্যবহার ও পরিণামের কথা শুনিয়েছেন গল্পকার। আর গ্রামের কাপড়ের দোকানদার নিত্য মড়লের স্পষ্ট উক্তি—

> "সাধে কি আর লোন দিতে চায়নি, তোরা তো শোধ দিবি নি। সে দিন ব্লকে গেছলুম ম্যানেজার বলছিল— হাড় হাভাতেদের দিলে এই তো গোলমাল।" [২০১]

নেতাই সত্যিই অতিসরল ও সাধারণ মানুষ। গরুর স্বভাবের মতো গরুর দৃষ্টি নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অভাব তাকে সমস্যার কিনারায় নিয়ে গেছে। সে এখন 'মাটিতে হাতদুটো গাড়তে পারলে বাঁচে'। আর নিত্য রাতে জাবর কাটা জীবন বেছে নেয়। দোকানদার নিত্য মোড়ল, ব্যাঙ্কের ম্যানেজার, গ্রামের মানুষদের দিকে না তাকিয়ে সে আল দিয়ে হাঁটে আর ঘাসের দিকে মুখ করে তাকায়— 'তাকায় গোরুর মতো ঘোলাটে চোখে।' গল্পকারের বীক্ষায় ধরা পড়ে খেত মজুরের মনোবেদনা, আশাভঙ্গের কাহিনি। আর গ্রামীণ অর্থনীতির অন্তর্গতি ও বাইরের আরোপিত ব্যবস্থার ফল। বাইরের ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক পরিষেবা থাকলেও গ্রামের মানুষের কাছে তা সহজলভ্য নয়। বরং টাকা ওড়াতে গ্রামে মেলা বসে, পরবে, গাজনে রাস, বাউল, লক্ষ্মী পূজা, অষ্টম প্রহরে (= অষ্ট প্রহর ব্যাপী হরিনাম কীর্তনে)। এভাবেই লেখকের সংবেদনশীলতায় বিধৃত হয়েছে গ্রাম্যজীবনের ছবি।

'গোষ্ঠ' গল্পে সামন্ততান্ত্রিক নিষ্ঠুরতার পরিচয় এক রাখালের মধ্য দিতে ব্যক্ত। গল্পকার বাস্তব জীবন দর্শনের সাথে গল্পের প্রেক্ষাপটে উজ্জ্বল রয়েছেন। বাঁকুড়া-পুরুলিয়া অঞ্চলের এক রাখাল বালকের জীবন কথা মহাকাব্যের ব্যাপ্তি পেয়েছে। গল্পকার চিরন্তন রাখাল বালকটিকে গল্পে তুলে ধরেছেন—

> "কত্তাদের দেওয়া টেরিলিনের আধছেঁড়া জামার উপরের বোতাম দুটো আঁটে। আটকে কি হয়, আবার বেরিয়ে আসবে। ঘর দুটোর ব্যাত এমন ফাঁড়া বোতামটি ঢুকবে ফুস করে, আবার বেরিয়ে আসবে ফচ করে।...জামাটা বড় পছন্দ হয়েছে লক্ষ্মণের— বেশ বড় সড়। হাঁটু পর্যন্ত শীত লাগবেনি।" [২০২]

কেবল পোষাক নয়, ঘরে ঢুকলেই মা-এর ঘনঘনানি, কখন বেতন হবে। সম্বৎসরে লক্ষ্মণের বেতন ছত্রিশ টাকা। তবে মনিব মাহাতোরা এখন পেটের খাবারটুকু দেয়। তাই খেয়ে শীতে কাঁপতে থাকে লক্ষ্মণ। আর অন্য ছেলেরা শীত কাটাবার জন্য পড়ন্ত বিকেলে বাঁশি বাজায়, সমবেত হয় ছৌনৃত্যের আসরে— 'যত লাচে গা তত গরম হয়।' হঠাৎ হারিয়ে যায় মাহাতোদের গাভীন ভেড়া। ভয়ে সংকোচে বাগাল লক্ষ্মণ বালক হয়েও দায়িত্ব পালনে তৎ পর হয়। ভেড়ার খোঁজে পাগলের মতো ছোটে। পুরুলিয়ার প্রাচীনতম মৃত্তিকায় ভারতবর্ষের এক নবীন প্রতিনিধির অনন্ত অনুসন্ধানের শরিক গল্পকার যেন নিজেই। সে ছুটছে, সন্ধ্যার মুখে গাঁ-সীমান্তের বটগাছতলায় টেরিলিনের ঢিলেঢালা জামার বুকটা মুঠি করে ধরে।

আর দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর একসময় ভেড়াটি খুঁজে পায় লক্ষ্মণ। শীতার্ত, ক্ষুধার্ত, ক্লান্ত, অসহায়, একাকী লক্ষ্মণ তার সারা দিনের খিদে মেটায় ভেড়ার স্তনে মুখ দিয়ে। বেঁচে থাকার চেষ্টায় বোধহয় পশুস্তন্য পানের সহজ উপায় সে বেছে নেয়। মাহাতোরা লক্ষ্মণদের কাছে যতটা না প্রিয় তার চেয়ে ভেড়া অনেক বেশি জীবনদায়ী পশু। অন্তত মানুষের জটিল ও কুটিল মানসিকতার থেকে সহজ সরল লক্ষ্মণ বাগালের দৈনন্দিন জীবনবোধ তাই প্রমাণ দেয়। মানব শিশুকে দুধ খাইয়ে ভেড়াটির দুটি বাচ্চা হয়। একটি মরা বাচ্চা। ভয়ে বুক সিঁটিয়ে ওঠে লক্ষ্মণের। মাহাতো গিন্নির কাছে জবাবদিহি করতে হবে। লক্ষ্মণ ভেড়ার দুটি বাচ্চা নিয়ে ভোর রাতে চাঁদের আলোয় বাড়ি ফেরে।

পোয়াতি ভেড়া হারানোর সময় থেকেই লক্ষ্মণের উপর মাহাতো পরিবারের সবাই রেগে ছিল। তার উপর একটি বাচ্চা মৃত হয়েছে খবর পেয়ে লক্ষ্মণকে সবাই মারতে থাকে। কেউ বা বলে— 'ওর বাপের তেলে ভাজার হাঁড়িকড়া কেড়ে নে আয়।' আর বড়োকত্তা জবাব দেয়—

> "তোর পারা বাগাল আর ঘরে ঢুকতে দুবোনি। দূর হ। ভেড়া ছাগলের কাছে ঘেঁষবিনি। তারপর টাকা সে আমি ঠিক তুলে লুবো।" [২০৩]

দীর্ঘদিন এ বাড়িতে থাকায়, বাগালির কাজ করার ফলে কেমন যেন একটা মায়া পড়েছে লক্ষ্মণের। কিন্তু লক্ষ্মণের কথা কেউ শুনল না। গাল মন্দ, মার ক্রমশ বৃদ্ধি পেল। অবশেষে লক্ষ্মণের মা খবর পেয়ে 'বাঁ বগলে ছেলেটাকে নিয়ে কাপড় সামলাতে সামলাতে ছুটে আসে।' লক্ষ্মণ কাঁদতে থাকে। রাগে বিরক্তির সুরে লক্ষ্মণের মা শুনিয়ে দেয়—

> "তোদের ঘরে না খাটলেও আমার ব্যাটার ভাত জুটবে বটে। তোদের ঘর না থাকলি আর কি আমার ব্যাটার বাগাল খাটার ঘর নাই।" [২০৪]

চরিত্রেরা প্রতিবাদী হয়ে তাদের সঠিক জীবন পথ খুঁজে নিয়েছে যেন। একটি মরা বাচ্চার অপরাধে লক্ষ্মণের চাকরি যায়। এটাই চিরন্তর সত্য। কিন্তু গল্পকার যেন আরও একটু সাহসী করে তুলেছেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে। ফলে স্বাভাবিক অবস্থানের বিপরীতে মায়া-মমতাময় জীবনকে সামনে রেখে গল্পকার পাঠকের মনের শক্তিকে জাগ্রত করেছেন।

রামকুমার দেখার পরিসর থেকে আবিষ্কার করেন অদেখা জীবনের বয়ান। তাঁর গল্পত্বের আশ্রয় ও বিচরণ ক্ষেত্র দৈনন্দিন জীবনের যত বিচিত্র বিশ্বাস, সংস্কার, বিপত্তি অসহায়তাময় জীবনকথা— যা গল্পের প্রয়োজনে পরম যত্নে ঠাঁই পায়। রামকুমার বিদগ্ধ ও এ সচেতন লেখক। আর সে জন্যই ছোটোগল্পের তত্ত্বরূপ সম্পর্কে অবহিত থেকে তিনি গল্পবিশ্ব নির্মাণ করেন।

'শাঁখা' গল্পের শুরুতে দেবী সায়েরের স্থান ও অমূল্য শাঁখারি সংক্রান্ত কিংবদন্তির মধ্যে বাস্তব ও কল্পনার সীমা মুছে যাওয়াতে পাঠকৃতির সূচনা হলেও ক্রমশ অমূল্যের উত্তরপুরুষ শুভ্রের উপস্থাপনায় বাস্তবতার রং বদল ব্যক্ত হয়। সামাজিক সত্যকে ব্যক্ত করার জন্য গল্পকার দেবীর প্রকৃত অবস্থানের সঠিক পরিচয় হিসেবে রামতারকের উত্তমপুরুষদের ঠিকানা বলেছেন। যেখানে 'রামতারকের সংসার এখন ভূ-গোলকের নানান দিকে মৌমাছির মতো ভোঁ ভোঁ করে। মানুষ গড়ালে দেব-দেবীও গড়ায়।

যতদূর যাওয়া যায়।' দেবীকে তাই কেউ কেউ সঙ্গে নিয়ে গেছে। যেমন— পাত্রসায়রের কমল ঠাকুর ঘরের অভাবে দেবীকে নিয়ে যায় নি। কিন্তু পায়রাশোলের কার্ত্তিক কাঠ-চেরাই কলেই দেবীকে রেখেছে। আসলে উত্তরপুরুষের বাসস্থান ও প্রযোজনের নিরিখে দেবীর অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য ক্রমশ অবান্তর হয়ে যায়। রামতারক চাটুজ্জে একদিন আকাশ থেকে পড়েছিল। যেদিন অমূল্য শাঁখারী চৌদ্দ পনের বছরের একটি মেয়ের ডানহাতে শাঁখা পরিয়েছিল। তারপর মেয়েটি দেবী সায়রের ঘাটের দিকে হেঁটে গিয়ে অদৃশ্য হয়। অমূল্যের কথায় রামতারক অবাক হয়।

ইতিমধ্যে অমূল্যের উত্তরপুরুষ শুভ্র এবং তার ভাইয়েরা কলকাতায় থাকে। তারা শাঁখার ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বুড়ি মায়ের মন রাখতে শুভ্র বছরে একবার দেবী সায়রে শাঁখা ফেলে যায়—

> "ভারতবর্ষ একটি গ্রামভিত্তিক দেশ। গ্রামের অবস্থার উন্নতি না হলে দেশের উন্নতি ঘটবে না। শুভ্র এ-গাঁয়ের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের কান্ডারী। প্রকৃতি প্রেমিকও। শুভ্র দেবী সায়েরের পাড়ে বসে থাকে। চারপাশটা চোখমেলে দেখে।" [২০৫]

গল্পে দিবাকর, তার ছেলে ও ছেলের বউ— প্রত্যেকেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ফসল ও সূত্রধার। শাঁখার বন্ধনীতে পরম্পরাকে, সংস্কারকে বাঁধতে চেয়েছেন গল্পকার। সংস্কারের অভ্যাস কীভাবে নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যে অপ্রতিরোধ্য, লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে। সুফল তাঁতির বউ গঙ্গা ছেলের কিডনীর রোগ সারাতে দেবী সায়রের জল ঘটি ভরে নেয়। অভাবী খেত মজুর সুফলকে বাঁকুড়ার ডাক্তার ভেলোরে যেতে বলেছিল। কিন্তু দেবী সায়রের জলে রোগ মুক্তির বিশ্বাসে ছেলের মৃত্যু পর্যন্ত মিথ্যে আশায় বুক বাঁধে গঙ্গা।

গল্পের শেষে দেবী সায়রের পাড়ে গো-হাট বসে। ১৩ই ফাল্গুন উৎসব পালিত হয়। নাগরদোলা পাক খায়। বেলুন ফাটে। জিলিপির দোকান বসে। উৎসবের আনন্দে প্রাণের জোয়ার আসে। একদিকে দেবীর নামাঙ্কিত উৎসবের অজুহাতে অবক্ষয়ী আধুনিকতাবাদের বান ডাকে— তাপস নন্দী চোলি গানে ছেলে ছোকরাদের মাতায়। দেবী সায়রের শালুক ফুল তোলার প্রত্নকথা সময়োপযোগী বিনির্মাণের মধ্যে ব্যক্ত হয়।

রাসমঞ্চের অন্ধকারে ক্ষুদিরাম চৌধুরীর মেয়ে ছন্দার সঙ্গে শুভ্র যৌন মিলনের পুলক অনুভব করে, আর 'ভোর রাতে সায়েরের জলে দেবীর উদ্দেশ্যে দুটো প্লাস্টিকের শাঁখা ছুঁড়ে দেয় শুভ্র।' পুঁজিবাদ ও সামন্ততন্ত্রের গাঁটছড়ায় ব্যক্তির অস্তিত্ব কিভাবে স্থান বদলে সময়োপযোগী হয়ে টিকে রয়েছে গল্পকার নিজস্ব ভাষায় তা তৈরি করে দেখিয়েছেন।

'পেয়ারা বুড়ো পান্তাবুড়ি' গল্পে কথকতার ভঙ্গি অতি সাবলিল—

> "এক গাঁয়ে এক পেয়ারা বুড়ো আর এক পান্তাবুড়ি থাকে। তাদের ঝুপড়ি দুটো গাঁয়ের একেবারে এক কোণায়। পেয়ারাবুড়োর ঝুপড়িটা পুবমুখো আর পান্তাবুড়ির ঝুপড়িটা পশ্চিমমুখো। দুটো ঝুপড়ির তফাত একটা পুকুরের।" [২০৬]

পেয়ারা গাছের গর্বে বুড়োর দিন কাটে আর পান্তাবুড়ি হাপুস হুপুস শব্দে পান্তা খেয়ে দিন কাটায়। অভাবের তাড়নায় দুজনেই বাটি হাতে কীর্তনের প্রসাদ বিতরণের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকে। তিনকূলে দুজনেরই কেউ নেই। একদিন মাঝরাতে বুড়োর ইচ্ছে হয় গুগলির ঝাল দিয়ে বুড়ির পান্তা ভাত খাবে চুরি করে। আর বুড়িও ভাবে পেয়ারা চুরি করে খাবে। চুরির সময় পরস্পরের চিৎকারে গাঁয়ের লোক জড়ো হয়। গল্পকার কথকতার ভঙ্গিতে সরলতা এনে চুরি ঘটনার বর্ণনায় গ্রামের লোকের হাতে নিগ্রহের প্রসঙ্গে লেখেন— 'শিলিগুড়ি থেকে আনা ভজহরির জাপানি টর্চটা ঝলসে উঠল।' 'জরুরি অবস্থা ঘোষণায় পাঁচ মাসের মধ্যে তিন তিনখানা চাকরির চিঠি দেখে সবাই ভাবল এরপর সব বেকারই চাকরি পাবে। পান্নালালের পেছনে এখন অমন বিশজন ছেলে ঘোরে।' 'বিজন ঘোষ খানিক পরে মোটর সাইকেল নিয়ে এল। খদ্দরের পাজামা, পাঞ্জাবিটা একটু তুলে পেট চুলকোতে লাগল। হাতের যথেষ্ট ফাঁক দিয়ে দেখা গেল পিস্তল খানা।'—গল্পে সমকালীন প্রাসঙ্গিকতা এভাবেই উঠে এসেছে। এমনকি দু'জনের পরস্পরের চুরি সমাজের মানুষের কাছে সম্মিলিত চুরির অপরাধে সম্মিলিত প্রতিবাদের বিষয় হয়— গল্পকার সূক্ষ্ম বয়ন নির্ভর ঘটনাকে প্রতীকায়িত করেছেন। গ্রামের দুই দরিদ্রতম মানুষের পারস্পরিক দৈনন্দিন সম্পর্ক, তাদের অভাব পেটের জ্বালা, ও মনের জ্বালার পরিচয়ে সামাজিক বিধিনিষেধ সক্রিয় হয়ে গেছে।

পেয়ারা গাছহীন বুড়ো ও পান্তাহীন বুড়ির খিদেই একমাত্র সম্বল হয়। অপবাদ, গালমন্দ বদভ্যাসের দিন গেছে ফুরিয়ে। অবশ্য অভাব নিত্য সঙ্গী তাদের। খিদের জ্বালায় বুড়ো ফুটি চুরি করে পালাতে গিয়ে পাহারাদারদের হাত থেকে বাঁচতে বুড়ির ঘরে ঢুকে পড়ে! 'শেষে পড়ি কি মরি করে একেবারে বুড়ির কাঁথার নিচে।' এবার দুজনে মিলেই গ্রামের লোককে শাপশাপান্ত করতে থাকে। আর বুড়িকে বুড়ো বলে— 'তোর জন্যে পরানটা বাঁচল। ফুটিটা তুই খা।' পান্নালাল, বিজন ঘোষদের ভয়ে সামাজিক অনুশাসনে, অর্থনৈতিক টানাপোড়েনে বুড়ো, বুড়ির দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হলেও বাঁচার সাধ সব মানুষের মতো এদেরও রয়েছে। তাই চুরির ফুটি দুজনেই খেয়ে তৃপ্ত হয়েছে আর অন্যদের মতো সমান অংশীদারের আশায় রাত কাটিয়েছে একসাথে।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হারানের নাতজামাই' গল্পের কাহিনিতেও একসাথে কিছুটা সময় কাটিয়েছিল জনগণের নেতা ভুবন মন্ডল ও ময়না। সেখানে ময়নার স্বামী জগমোহন ময়নার প্রতি অবিশ্বাসের মনোভাব দেখানোয় ময়নার মা বলেছিল— 'খালি জন্ম দিলেই বাপ হয় না, অন্ন দিলেও হয়।' দরিদ্র মানুষের মুখে প্রতিবাদ ও বিশ্বাস যখন চিরস্থায়ী হয় তখন অভাব ও অবিশ্বাস দূরে চলে যায়। কিন্তু সামাজিক সাম্যের অভাবে শুভবুদ্ধির উদয় হয় না বলে একশ্রেণির মানুষের জন্য অন্য শ্রেণির মানুষ চক্রান্তের শিকার হয়েছে। যেমন— ৬৯ সালে পেয়ারা বুড়ো সাক্ষী দেবার অপরাধে সুদে আসলে বদলা নিতে চেয়েছে পান্নালাল। বুড়োর অপরাধ ছিল ভাগচাষীদের দলে ভিড়ে কোর্টে সাক্ষী প্রদান। গল্পকার গল্পের প্রথম অংশে মূল ঘটনার বর্ণনায় কৌতুকের অবলম্বন নিলেও গল্পের দ্বিতীয় অংশে স্বার্থপরতা, সামাজিক সংকট, গ্রাম্য জীবনের হৃদয়হীনতা ও পারস্পরিক সমাবেশ গল্পের সরলরৈখিক গতিকে প্রাঞ্জলতা দিয়েছে— আর এভাবেই গ্রাম্যজীবন-অভিজ্ঞতার সরল রূপটি উজ্জ্বল হয়েছে।

'বনমালীর পৃথিবীতে ফেরা' গল্পে জীবন মৃত্যুর টানাপোড়েনে জীবনকেই সুন্দর ও সার্থক রূপে উপস্থাপিত করেছেন গল্পকার। অভাবী বনমালীর দু'দিন কাজ না জোটায় জীবনে প্রথম তালগাছে ওঠার দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তালগাছের ওঠার সানুপুঙ্খ বর্ণনায় যেন অভিযানের প্রস্তুতি পর্ব—

> "হাত দুটো মাটিতে ঘষে বনমালী। কাটারিটা শিরদাঁড়ার মাঝামাঝি ঢুকিয়ে দেয় কোমনির তলায়। তারপর গাছের গায়ে আসে। থমকে দাঁড়ায়।" [২০৭]

তালগাছের গোড়ায় প্রণাম সেরে উঠতে থাকে বনমালী। বুকের ধুকপুকানি, ভয়, পাছার দুই ঢিপিতে সামান্য চিনচিন ব্যথা, কপালে পিঠে ঘামের ফোঁটার নোনতা স্বাদ নিতে নিতে গাছের ওপরে ওঠার চেষ্টা। 'চারদিকটা একবার ঘুরে বনমালী বোঝে ব্যাপারটা কত গোলমেলে। নিচের থেকে মনে হয় কেমন সুড়সুড় করে উঠে যাচ্ছে কিন্তু যে ওঠে সে বোঝে কত ধানে কত চাল।' প্রাণপণ পরিশ্রমে হাত ও পা কে নিয়ন্ত্রণে এনে গাছের বেল্লোর উপর বসতেই বনমালীর দুচোখ বন্ধ হয়। বুকটা জোরে জোরে ধকধক করে তার। আর 'ভয়টা গায়ের ভেতর ঢুকে গেছে।' গাছে ওঠার মুহূর্তে হাত-পা এর প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে লেখকের জীবনদর্শন ধরা পড়ে— 'হাত আর পায়ের মাঝে যে এতখানি ফারাক বনমালী আগে কোনদিন বুঝতে পারেনি।'

গাছে ওঠার এত ঝক্কি নিয়ে বেঁচে থাকার মানে খুঁজে পায় না বনমালী। তার এই জীবনযুদ্ধ কীসের জন্য ? নিজের পেট ? বউ ? ছেলেমেয়ে ? অন্য পাঁচজন ?— এইসব নানান প্রশ্নের মুখোমুখি পাঠককে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন লেখক। কারণ বনমালী এই পৃথিবীর একজন কেজো মানুষ—

> "চাষের কাজ পেলে চাষের কাজ করে, শীতে খেজুর গাছে রস দেয়। অনেকের সঙ্গে মিলে মহল্লা করে, মোচ্ছবে খিচুড়ি বানায়, লোকের গোরু আবাদ করায়, গলায় তুলসীর মালা পরে হরিনামের দলে খোল বাজায়।" [২০৮]

অবশ্য মাঝেমধ্যে সে চুরি চামারিও করে। তার এই অভ্যাস কেবল পেটের জ্বালায় নয়— স্বভাবের জন্য— লোভের তাড়নায়। সে নানান পথে নিজের আর্থিক অবস্থাটা ফেরাতে চেয়েছিল। বিশেষ করে দুবেলা ভাতের জোগাড় করতে। জুয়া খেলত, লটারির টিকিট কিনত, মিটিং-মিছিলে পা মেলাত সে। সে দেখেছে ভাগচাষিরা রেকর্ড করে জমি চষতে পারে, কিন্তু জনমজুরের কোন রেকর্ড নাই। এমনকি খাটার লোক চাহিদার চেয়ে বেশি বলে আসল দাম দেয় না। চাষের সময় দু-পয়সা হাতে এলেও বাকি মাসাধিক কাল শূন্য হাতে বেঁচে থাকা। বেঁচে থাকা তার কাছে যন্ত্রণার হয়েছে। গাছের ওপর থেকে এইসব ভেবে বলতে পেরেছে— "বাঁচার পথ নিচে, এখান থেকে সোজা নিচে।"

সাতপাঁচ ভেবে আর দেখে জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। তাই ওপর থেকে পড়ে মরতে চায় সে। বনমালীর মনে দুটি বিপ্রতীপ স্রোত ক্রিয়া করেছে— একদিকে বাঁচার তাগিদ, অন্যদিকে জীবনের প্রতি অসীম বিতৃষ্ণা। কেননা গভীর রাতে সে ঘরে ফিরে দেখেছে—

> "কিষ্ট চৌকিদার দিব্যি তার বৌকে রাধা করে শুয়ে আছে।" [২০৯]

বনমালী, কিষ্ট, রাধা নামগুলির মধ্যদিয়ে লেখক ভালোবাসার মধ্যে বিতৃষ্ণাকে তুলে ধরেছেন সাবলীল ভাষা প্রয়োগ ও বর্ণনা কৌশলে। আর তালগাছের মাথায় উঠে বনমালীর চেনা পৃথিবী একেবারে অচেনা হয়ে যায়— নিচের পৃথিবীটা মায়াময় পুতুলের সংসার মনে হয়। বনমালী তালগাছের মাথা থেকে নিচে বহমান জীবনকে যেভাবে দেখেছিল— লেখকের দেখাটাও তেমনি— দূর থেকে দেখা। কিন্তু এই দূরদর্শনে জীবনের আস্বাদ গ্রহণে তেমন কোনও ঘাটতি পড়ে না। গল্পের চরিত্র জীবন যন্ত্রণায় যেমন অতিষ্ঠ তেমনি জীবনের প্রচুর ভান্ডার শূন্য করে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত। আবার জীবনকে নতুন উদ্যমে আলিঙ্গন করে উপভোগ করার ইচ্ছা প্রবল হয় বনমালীর। সে গাছের উপরে বসে আকাশকে কাছ থেকে দেখেছে। আর সেই সময় নিচের মানুষগুলো পুতুল পুতুল, এমনকি বঁইচি ফলগুলো চোখে পড়ে না। ঘরগুলো ঝুপড়ি, আর মানুষগুলো পুতুলনাচের রাজা, রানি, সর্দার কিংবা ভিখিরি। সব চেনা জগত অচেনায় পরিপূর্ণ—

> "বনমালী নিচের দিকে তাকায়। সব ছবি ছবি। জগৎটা বোধহয় বদলেই গেছে। নাচা, কাঁদা, বকা, গাল দেওয়া, পুকুরের জলে কাপড় তুলে পেচ্ছাব করা, ঠাকুর ঘরে ঢোকা, গোরু তাড়ানো, ছেলেকে মাই দেওয়া, শালে বলদ ঘোরানো, মাছ ধরা প্রভৃতি এইসব করতে হচ্ছে।" [২১০]

বনমালী জেনেছে জীবন মানে খেলা আর সেই খেলা পুতুল নাচের কাহিনির মতো। পরিচিত জগতের বিপরীতে ইহজগৎ থেকে দূরে থেকে বনমালীর ভাবনার বদল ঘটেছে। নতুন করে ভাবতে ভাবতে পুরানো জীবনের ভাবনায় জীবনের সার্থকতা খুঁজে পায়। চলমান জীবনকে শূন্য থেকে দেখে আনন্দ পায়—

> "বউ ছেলে-কোলে গাছের তলা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। নেড়াকে বউ জিজ্ঞেস করে কত্তাকে দেখেছে কিনা।" [২১১]

এই অন্বেষণেই বনমালীর মন বুঝেছে দু'দণ্ডের শান্তি আসলে জীবনের সাথে জীবনের মেলবন্ধনেই। যেমন— পুকুরের সাথে মাছের, জলের সাথে ঢেউ-এর কিংবা আকাশের সাথে পাখির। তাই তালগাছ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার চিন্তাটা হঠাৎ দূরে চলে যায়। সে গাছ থেকে নেমে চারপাশকে আগের মতোই পুরানো দেখে। তাই নতুন অভিজ্ঞতার আনন্দে আবার গাছে চড়তে চায়। কিন্তু দম হারিয়ে ফেলায় সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চেনা ছন্দে জীবনকে বাঁচিয়ে রাখার আনন্দের অনুসন্ধানে মগ্ন থাকে। বউ-এর মাথায় তেল জোটাতে না পারা, এমনকি রোজ ভাতের ব্যবস্থা করতে না পারা সত্ত্বেও ছেলে কোলে বউ বনমালীর সন্ধানে বেরিয়েছে।— এই সম্পর্ক ও যোগসূত্র, এই অন্বেষণ বাঁচার পথ দেখিয়েছে। গল্পে জীবন ও মৃত্যু বার বার মুখোমুখি হলেও লেখক জীবনকেই জিতিয়ে দিয়েছেন।

'পরিক্রমা' গল্পে সংঘাতময় জীবনের নানান জটিলতা থেকে ভালোবাসার জয় ঘোষিত হয়েছে জীবনের সঙ্গে জীবনের সহাবস্থানে। ময়নার মা তাঁর সন্তান সন্ততিদের নিয়ে নবীনগঞ্জে থাকতে চেয়েছিল। কিন্তু সাফল্যের হাতছানিতে সবাই যখন দূরে চলে যায়, তখনও ময়নার মা সবাইকে নিয়ে বাঁচার স্বপ্নে বিভোর

থেকেছে। স্বামী শ্রীনাথের মৃত্যুর পরেও নিঃসঙ্গ হয়নি ময়নার মা। কারণ ভগবান পান্ডার সঙ্গে শ্রীক্ষেত্র যাওয়ার স্বপ্ন, টিয়ে রঙের বেনারসীর স্বপ্ন সার্থক হয়নি। তা সত্ত্বেও ময়নার মা স্বপ্ন দেখে বাঁচার স্বপ্ন, প্রত্যাশা পূরণের স্বপ্ন। এক অনিবার্য অবক্ষয়ের যুগে গ্রামীণ নারীর জীবন সংগ্রামের কাহিনির মধ্যে রামকুমার অস্তিত্বের সাধনায় ঐতিহ্যের পরম্পরায় অবগাহন করেছেন অক্ষয় মন্ত্রে।

স্বামীর অকাল প্রয়াণের পর বিধবা নারীর জীবন যুদ্ধে ঘটে গেছে মেয়েদের বিবাহ, তিন ছেলেকে প্রাণপাত করে মানুষ করা— এ সবই। পারিবারিক বন্ধনের বুনটকে প্রমাণ হিসেবে তুলে ধরেছেন গল্পকার। স্মৃতির ঝাঁপি খুলতে খুলতে উদাসীন মনে একটি নারী মানবিকতায় সম্পর্কে সংসর্গে সৌহার্দ্যে অন্যের কাছে অন্য মনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় তারই উপাখ্যান 'পরিক্রমা'য় পাওয়া যায়। লেখকের ব্যক্তি জীবনের একটি অভিজ্ঞতার পরিচয় ধরা রয়েছে এই গল্পে। গ্রাম্য জীবন কথা ও পারিবারিক সুখ দুঃখের কথা পরম স্নেহে লালিত ছিল লেখকের মনে। তাঁর দিদিমার স্মৃতি ভ্রংশের কারণ অনুসন্ধান করতে পেরেছিলেন লেখকের মা। তিনি বলেছিলেন—

> "দিদিমা কেমন করে স্বামীর মৃত্যুর পর নানান প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে। মৃত স্বামী থেকে ছেলেমেয়ে নাতি-নাতনীরা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল দিদিমাকে। বলেছিল গাঁয়ে বিঘের পর বিঘে জমি কিনবে; নদীর চর ভর্তি গোরু কিনবে। দিদিমা যা ভাবেনি তার চেয়ে অনেকখানি উঁচুতে প্রতিষ্ঠা পায় ছেলে মেয়ে নাতি-নাতনীরা। প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ছড়িয়ে যায় তারা। সে প্রতিষ্ঠার কাছে জমি, পুকুর, গোরু তুচ্ছ।" [২১২]

দিদিমার মতো এই গল্পের নারীও ক্ষুদ্র পরিসর থেকে বের হয়নি আবার অতি পরিচিতও হয়নি। ফলে গল্পে তার তেমন কোন নাম নেই। সে শ্রীনাথের বউ, যাদু-ভাদু, মাধো-ময়নার মা, ভানু-কানুর দিদিমা। বড়োছেলে ইঞ্জিনিয়ার, মেজো ডাক্তার আর ছোটো অ্যাসিস্টেন্ট হেডমাস্টার। যাদু থাকে বোম্বেতে, ভাদু কলকাতায়, ভানু মেমকে বিয়ে করে আমেরিকায়, জমি নিয়ে বিবাদের সময় কানুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যায়— ফেরত দেয়নি। বাড়িতে সাজানো ইট, অর্জুনের গুঁড়ি রয়ে গেছে বাড়ি তৈরী হয়নি। কিন্তু দেশান্তরী ছেলেরা ঘরে ফেরেনি। যাদুর ছোট ছেলে বোম্বেতে ভিডিও পার্লার করে লালে লাল। ভাদুর মেজোছেলে কম্পিউটার ট্রেনিং দিয়ে মাসে বিশ হাজার টাকা রোজগার করে। মেজোছেলের বৌয়ের ব্যবসা, আলমারি ভর্তি শেয়ারের কাগজপত্র। এদিকে সাঁওতাল পাড়াতেও এখন আলো এসেছে, মাঠে শ্যালোর সাহায্যে জলের ব্যবস্থা, নবীনগঞ্জের মধ্যে এখন পাখা, আলো, টি .ভি, ফ্রিজ। কিন্তু পুত্রবধূরা এখন আর গ্রামে আসে না। দেখতে দেখতে মারা যায় বড়ো ছেলে; মেয়ে ময়নাও। এইভাবে ছড়িয়ে যাওয়া আর হারিয়ে যাওয়া মানুষের মাঝে অদৃশ্য লোকে শূন্যে ঝোলে একটি বুড়ি মানুষ। যে কিনা কাপাস তুলোর মতো উড়ন্ত। বাতাসে দোল খেতে খেতে তালগাছের মাথা পেরিয়ে উড়ে যায়। আর নিচে পড়ে থাকে নবীনগঞ্জের খেত-খামার, বালির চর, নদীর জল, ঘর-সংসার, কাশের বন, আম-কাঁঠাল, অর্জুন-আমলকির জঙ্গল। খেজুর তলায় পাকা খেজুর পচে, শুকোয়, গাছের পেঁপে কাকে ঠোকরায়।

পেয়ারা পেকে পড়ে, আম খাওয়ার লোক নেই, দুধ দোওয়ার সময় মাছি তাড়ানোর ছেলে নেই, সাত দিনের বকনা ছুটে বেড়ায়, রান্না চালায় বেড়াল বাচ্চা ঘুরে বেড়ায়, খড়ের গাদায় মেটেলি সাপের বাচ্চা, ওলগাছের গোড়ায় বেঙাচির ঘর গেরস্থালি। একশ বছরের বুড়ির ছড়ানো সংসার—

> "ছড়িয়ে যাওয়া ঘর সংসারকে কেমন করে জুড়বে বুড়ি ? কখনো হারিয়ে যাওয়া মানুষজন মনের ভেতর ভিড় জমায়। ছড়িয়ে আর হারিয়ে যাওয়া মানুষ জনের মাঝে শূন্যে ঝোলে বুড়ি।" [২১৩]

কারণ, নদী সরে গেছে দক্ষিণে, অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে সময়ের সাথে সাথে। বাস্তবের ছড়ানো সূত্রগুলোকে একসঙ্গে গাঁথতে পারেনি বুড়ি।

'শিল্পী' গল্পটি শিল্পের সাথের সম্পর্কযুক্ত এক আশ্চর্য বৃত্তান্তের কথাশিল্প। পুরুলিয়ার ভাদুতলা গাঁয়ের দেহাতি দীনদয়াল ও তার পত্নী ভানুমতী আর মহাদেব সর্দারের কথন নির্মাণের ফসল। সৈনিক স্কুলে চাকরি করে— দীনদয়াল ছবি আঁকে। সে ও তার ভানুমতী ভাদুতলা গ্রামে এসেছে গ্রাম্য শিল্পের সন্ধানে। বিশেষ করে দেয়াল চিত্রের সৌন্দর্যে মোহিত হয় ভানুমতী। গ্রামের মানুষ মহাদেব সর্দার দীনদয়ালদের বোঝায় 'ছবি, আজ্ঞে, ভগবান আঁকি দেন। যার হাতে আঁকি দিবেক সে শিল্পী।' হাতের কথায় কুকুর, গোরু, ছাগল, পুকুর পদ্মডাঁটি এমন কি জলও চলমানতা পায়। মহাদেবের কথার সঠিক অর্থ এরা বোঝে না তাই অবাক হয়। মহাদেব জলের কথা প্রসঙ্গে বলে 'গাড়ু লিয়ে ভগবান বইস্যা আছে। চাতক ডাকলে গাড়ুর ললটা বাঁকায় দিবেক।' মহাদেবের হেঁয়ালি ভাসায় শিল্প সৃষ্টির তত্ত্ব শুনে ভানুমতী আশ্চর্য হয়। এই আশ্চর্যের সত্যানুসন্ধানের জন্য তাদের গ্রামে আসা। কাঁচা দেওয়ালের গায়ে, রঙ ছাড়া শুধু আঙুলের টানে কেমন করে মানুষজন ছবি আঁকে তাই দেখতে ও জানতে চায় তারা। গল্পের কাহিনিতে উঠে আসে মহাদেবের পারিবারিক অভাবের প্রসঙ্গ। তারা ভাবে পার্টি বা সরকারের তরফে দীনদয়ালরা গ্রামে এসেছে। ভোট-চাল ইত্যাদির জন্য। কিন্তু দীনদয়াল ও ভানুমতীকে মহাদেবের বউ স্তম্ভিত করে দেয়। দীনদয়াল যে অন্ধ চোখে কালো চশমা থাকায় মহাদেবের বউ জানতে পারে না। গ্রামের মানুষ এবার সন্দেহ করে যে এরা আসলে কি উদ্দেশ্যে গ্রামে এসেছে। আর না হলে দীনদয়ালকে ছবি এঁকে দেখাতে হবে। গ্রামের মানুষদের কাছে এরা অসহায় অবস্থার সম্মুখীন হয়। জল মাটির মিশ্রণে দেয়াল চিত্র অঙ্কনের অভিজ্ঞতা ছিল না দীনদয়ালের। তা সত্ত্বেও জানার আগ্রহে একজন শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় জানতে চায় গ্রামের মানুষ। গাঁয়ের অসহিষ্ণু মানুষদের কাছে ছবি প্রমাণ দিতে হবে তারা ছেলেধরা নয়। অবশেষে শিল্পীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়—

> "লণ্ঠন তিনটে নেভে। দেয়াল ছুঁয়ে দীনদয়ালের দশ আঙুল এগোয়। আমানি, মহাদেব, মহাদেবের বউ, সবাক কুকুর, কুঁদরি গাছ, ঝিঙে ফুল, ছুটন্ত কাঠবেড়ালি, উইঢিপি শরীর গড়ছে দেয়ালে।" [২১৪]

আর এই অঙ্কনের সাথে সাথে বৈচিত্র্যময় পৃথিবী যেন হাতের রেখায় উজ্জ্বল হয়। দীনদয়াল ও ভানুমতীরা বিশ্বাসের জগতে পৌঁছায়— তারা চোর বা ছেলেধরা নয়— এক অলৌকিক জাদুমন্ত্রে অন্ধ

দীনদয়াল যেন মহাদেবের কথা মতো— 'ছবি আজ্ঞে, ভগবান আঁকি দেন' প্রমাণিত হয়। সৃষ্টির পরম আনন্দে মহাদেব— মাতাল মহাদেব বউ-এর গলায় হাত দিয়ে সুরের মহিমায় গলা মেলায়। এক অপার্থিব রহস্যের কিনারে গল্পের ভাবনাকে লেখক পৌঁছে দিয়েছেন শিল্পী সত্ত্বার মাধ্যমে।

'আমাদের গ্রাম' গল্পের বিষয় তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষের চোখে দেখা গ্রামীণ জীবন কথা। গল্পটি অনুপুঙ্খের নিরবচ্ছিন্ন বিন্যাসে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিচ্ছিন্ন পাঠকৃতির মধ্যে লেখক খানিকটা স্যাটায়ারিস্ট হয়ে গেছেন। উত্তম পুরুষের জবানিতে একটি গ্রামের বামুন-তেলি-কামার-কুমোরপাড়া এছাড়া হাঁড়ি-বাগ্‌দি-ধোপা-ডোম পাড়া রয়েছে। গাঁয়ের আটচালায় সপ্তাহে দুদিন হাট বসে। এছাড়া যাত্রা, মিটিং, ক্লাবের একাঙ্ক নাটক থেকে বিচারের আসর বসে আটচালায়। এমনকি সাক্ষরতার মিটিং এই প্রসাদপুরেই হয়েছে। এ গ্রামে বামুনপাড়ায় আম, জাম, কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের গাছ রয়েছে এখানে কাঠবেড়ালি ও কাক পাখিরা বাধাহীনভাবে সব পাড়ায় ও গাছে ঘুরে বেড়ায়। কামার পাড়ার থেকে তেলিপাড়ার বাড়ি-ঘরের নির্মাণ ভাবনা অন্যরকম। 'আধকাঠা বাড়ি হলে, এক কাঠা গোয়াল।' আবার খামারের ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়—

> "ধান-গম ঝাড়া, কলাই রোদে দেওয়া, পালু করা, রান্নার জন্যে শালের পাতা রাখা।"[২১৫]

গোয়ালে থাকে— লাঙল, মেসিন, মই, ঝুড়ি, কোদাল, বিড়ি ধরানোর বেনা, আখড়ার বস্তা, ডুঙি ইত্যাদি। বাঁশের ব্যবহার প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন— 'চালা বাঁধতে বাঁশ, মাথা ফাটাতে বাঁশ, ঠ্যাং ভাঙতে বাঁশ, শ্মশানে মড়া বইতে বাঁশ— পিছনে ঢুকোতেও লাগে।'

অসংখ্য গাছের পরিচয় রয়েছে এখানে। যেমন— শিমূল, বাবলা, খেজুর, পাঁকুড়, তেঁতুল, বট, চালতা, কয়েত, ক্যাওড়া, আমড়া, সিরিষ, নিম ইত্যাদি। এই গ্রামে লাউ লংকা যেমন হয় তেমনি শালপাতা পচে, পোয়াল পচে, গমের আঁটি পচে ছাতু হয়। 'সে ছাতু সর্ষে বাটা দিয়ে রাঁধলে কিলো-চালের খিদে ওঠে।' লেখক সামাজিক অবস্থানের পরিচয় তুলে ধরেছেন—

> "বামুন পাড়ায় মুগের গন্ধ আর তেলিপাড়ার ছাতুর ঝালের বাস— যে পায়নি তার জন্ম বৃথা।" [২১৬]

একটি গ্রামের মধ্যে সব রকমের ব্যবস্থা ও বেঁচে থাকার আনন্দধারা নেই বলে লেখক আক্ষেপের সুরে বলেন— 'আমাদের পাড়া বললে বিষয়টি ঠিক হত। আমাদের গ্রাম— এ ব্যাপারটি লেখাপত্র থেকে তুলে দেওয়া দরকার।' কিন্তু সম্পূর্ণ সহাবস্থানগত সবরকমের মানুষের ভালোবাসার অভাবহীন জীবন অসহায়ে পরিণত। গল্পের মধ্যে আর এক গল্পের আগমনে রামকুমার নতুনভাবে ধরা পড়েছেন পাঠকৃতির উপসংহারে।— উত্তম পুরুষের কথক যেন রামকুমারে মিলে গেছে—

> "আমি আট বছর আগে সাক্ষর হয়েছি। তারপর বিস্তর বইপত্র পড়েছি। লেখার একটি খাতাও করেছি। রামকুমারকে দেখালুম! রামকুমার বলল লেখাগুলি খুব ভাল হয়েছে। দুটি সিগারেট আর একতাড়া বিড়ি খাইয়েছে।" [২১৭]

এভাবেই রামকুমার পাঠকের অতিকাছে অবস্থানের মাহাত্ম তুলে ধরেছেন— গল্প বলার সারল্যে।

দরিদ্র তাঁতি বাঁকুর গেরস্থালির ইতিবৃত্তই হল 'বাঁকুচাঁদের গেরস্থালি' গল্প। বাঁকু বিশ-পঁচিশ বছর আগে তাঁত বুনত, হাটে গামছা কাপড় বিক্রি করত। তারপর সব গোলমাল— সুতোর দাম বাড়ল, লোকে তাঁতের জিনিস ছেড়ে মিলের জিনিস কেনার ফলে বাঁকুর ব্যবসা মার খায়। বাঁকুর ঘরে অন্নাভাব দেখা দেয়। সংসার বাড়ে বাঁকুর। পেটের দায়ে নানা কাজ করে—

> "চাল ছাওয়া, পুকুরে জোঁতা রাখা, বিয়ে-পইতে-শ্রাদ্ধে উনুন করা, লোকের গোরুর পাল ধরানো।" [২১৮]

এই সব বাঁকুর নতুন জীবিকা। কিন্তু তা সত্ত্বেও সংসারে বড়ই অভাব। যোগেন চা দোকানির সাথে পরামর্শ করে বাঁকু বউ নন্দরানি (নোদি)-কে কলকাতায় কাজ করতে পাঠায়— রোজকারের উদ্দেশ্যে। যোগেনের বউও কলকাতায় থাকে, তাই সেই সূত্রে নোদি কলকাতায় গেলে খেয়ে মেখে থাকতে পারবে। যোগেনের বউ ও নোদি বাসে চড়লে যোগেন ও বাঁকু বিড়ি ধরায়, দুর্ভাবনা মুক্ত হয়। কিন্তু কিছুদিন পরে বাঁকু দেহের বস্ত্র আর হাতের খঞ্জনি সম্বল করে মানুষের দোরে দোরে নামগান করে ঠাকুরের বাণী পৌঁছে দেয়। গ্রামের অনেক বাড়ির চাল ছেঁদা হয়ে জল পড়ে। গেরুয়াধারী বাঁকুর মন গলে যায়। সে গেরুয়া ছেড়ে বিরিঞ্চি মেদ্যার রান্নাঘরের চালে ওঠে। এই কাজে সে আনন্দ পায়, রাধাকৃষ্ণের নামগান করে গুনগুন করে। আর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে—

> "সাধক রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধতেন। মা কালী দড়ি ধরতেন। আহা! সে ভাগ্যি কি আমার হবে?" [২১৯]

ফাল্গুন মাসে জগদীশ রায়ের ছেলের বিয়েতে বাঁকু কোমরে গামছা বেঁধে চাল ছাওয়া, উনুন করায় হাত লাগায়। বিয়েবাড়িতে আসা আত্মীয়দের কাছ থেকে একটা পুরানো পাঞ্জাবি আর একটা পুরানো ধুতি সে জোগাড় করে। সে লুচি খায়, সিগারেটে টান দেয়, বিয়ে দেখে। আর উদাসী মন অস্থির হয় পুরানো স্মৃতিতে। বাঁকু ভোর রাতে ফিরে বেলা পর্যন্ত ঘুমায়। উঠে চান সেরে চেনা ডাকপিওন গোঁসাইকে দেখে দৌড়ে যায়। দেখে সত্যিই তার নামে চিঠি এসেছে। গোঁসাইকে চিঠিটা পড়তে অনুরোধ করে। গোঁসাই পড়ে—

> "তোর বউ বাবুদের ছেলেকে ইস্কুলে দিয়ে ফিরছিল মাস তিনেক আগে। বাসে চাপা পড়ে মারা গেছে। আমার বউ সাহস করে তোরে লিখতে পারেনি। আমি জানালুম। তোর মেয়ে মাস দেড়েক নিখোঁজ। বাবুদের ঘরে খোঁজ নিতে গিয়ে জানলুম এক রাতে বাবুর ড্রাইভার আর তোর মেয়ে দুজনেই পালিয়েছে।" [২২০]

এ সব শুনে বাঁকু মাথা নাড়ে বোকার মতো। পাঁচজনে রায় দেয় বেঘাতে মরার জন্য ভিটেয় তুলসী দিতে হবে। সে বামুন ঘরে লম্বা লিস্ট পায়। পাঁচ সের চাল ও আট টাকার দক্ষিণায় পুজোর কথা পাকা করে। পুজোর পরে তার ঘরের টুকিটাকি জিনিস চুরি যায়। গ্রামের অনাথ মুখুজ্জের বাড়ি পাহারার কাজ পায়। সে মুখুজ্জে বাড়ির মেয়েকে গল্প শোনায়— রাজপুত্রের হারিয়ে যাওয়ার গল্প—

"চারদিকে কোথাও মানুষের চিহ্ন নাই। রাজপুত্রের গলা তখন কাঠ। সে রাজভোগ চায় না, রসগোল্লা চায় না, মাছের মুড়ো চায় না, তার দুটি ভাত কি মুড়ি হলেই চলে।"[২২১]

বাঁকুর রাজপুত্র আসলে অতি চেনা সাধারণ মানুষ। সে আরাম বা বিলাস চায় না, সামান্য দুটি খেয়ে পরে বাঁচতে চায়। রানিকে ধমকে সে বলে— 'জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।' রানির জ্বর হয় বাঁকু দেখে। আবার বাঁকুর জ্বর হয়, রানি বলে আমি সুস্থ করবই। এরা মুখুজ্জে বাড়ির চাকর। কাজ করে খেতে পায়। খেতে থাকতে এদের সদ্ভাব হয়, ভালোবাসা জন্মায়। নতুন করে বাঁচার আশায় বাঁকু চাঁদ রানির সাথে ঘর বাঁধতে চায়। সমস্ত দুঃখ আঘাতের পরেও বাঁকুর জীবনে রাজপুত্রের অভিযান ও স্বপ্নাতুর মন বাস্তবের রাজপুত্রের মতো বেঁচে থাকে।

'রঙ' গল্পে অজিত কামার জীবনধারণের তাগিদে এক জীবিকা থেকে অন্য জীবিকায় যেতে বাধ্য হয়েছে নিজের ভাগ্যান্বেষণের তাগিদে। সে তেলিপাড়ায় জনমজুর খেটেছে। বিজন ছুতোরের ঘরে ঠাকুর গড়েছে, গোরুর গাড়ির চাকা বানিয়েছে নিজের খরচে। সে নিজের শ্রমে সব বানাতে পারে—

"সবাই বলে এসেছে অজিত কামার বিশ্বকর্মা। কাস্তে-কুড়োল, গাড়ির চাকা, দরজা-জানালা, বোঁটি-ছান্তা— সবেতেই ফাস্ট। যখন যা করেছি আমার রেট সবার থেকে চড়া। তবু জোগান দিতে পারিনি। শুধু রঙটাতে গুলিয়ে গেল।" [২২২]

লাভ-ক্ষতির হিসেবে সে ক্ষতিই দেখেছে জীবনে। সোনালী, রূপোলীর সাথে বড় বউয়ের কালো রঙের রহস্য অজানা ঠেকেছে তার কাছে। তাই রঙের হাজারো বৈচিত্র্যে এবং বৈপরীত্যে অজিত কামারের শিক্ষা অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে। ভিন্ন ব্যঞ্জনায় রঙের গুমোরে তার ঘর ভেঙেছে ছোটবউ। আলো-অন্ধকারের মধ্যে কালোর যে কদর আছে অজিত কামার প্রৌঢ় বয়সে তা উপলব্ধি করেছে।— চিনে ফেলেছে কালোর নানান স্তর—

"অজিত জেনে ফেলে একই কালো জন্মসূত্রে অর্জন করে আনে কালোর রকমফের। বউয়ের অনাবৃত শরীরে অজিত আবিষ্কার করে সূর্য কেমন করে মানুষের শরীরের রঙ ভাঙে এবং গড়ে।" [২২৩]

সোনা, রূপো নয়, কৈশোর থেকে যৌবনের দিনগুলোয় ভালোবাসার সাথে ভালো লাগার মুহূর্তগুলোই সুখ স্মৃতি হয়ে অজিতের জীবনে আস্বাদ দেয়। শেষ পর্যন্ত প্রতিমা গড়ার কাজে মন দেয় অজিত কামার। কেননা সময়ের সাথে সমাজের নানান নিয়মকে মেনে সে বুঝতে শিখেছে সূক্ষ্ম অনুভবের জায়গা ও স্বার্থহীন ভালোবাসার বন্ধন। তার দুই বউয়ের ভালোবাসার দোটানায় রঙিন হয়ে উঠেছে অপরিণত জীবন। তাই সে চিনতে পেরেছে জীবনের রঙকে— বাঁচার ও বাঁচিয়ে রাখার রঙিন স্বপ্নের দিনগুলির সাথে নিজেকে।

অনিল ঘড়াই

বাংলা ছোটগল্পের ভুবনে যে সব গল্পকার বিশ শতকের আশি ও নব্বই দশকে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, অনিল ঘড়াই তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অনিল ঘড়াই অন্ত্যজ সমাজের মানুষ। প্রখর বাস্তববাদী ও মানবদরদী লেখক অনিল ঘড়াইয়ের জন্ম ১ নভেম্বর, ১৯৫৭ সালে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলার এগরা থানার রুক্মিণীপুর গ্রামে। ১৯৭৯ সাল থেকে তিরিশ (১৯৮০-২০১৪) বছরের অধিক সময় ধরে অনিল ঘড়াইয়ের লেখনি থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রায় তিনশোর বেশি ছোটগল্প। সেই সব ছোটগল্পে মূর্ত হয়েছে হরেক রকমের বাস্তব ছবি। কলেজে পড়ার সময়ে 'কোয়েল' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করেন সাহিত্য সাধনার জন্য। তাঁর প্রথম গল্প 'আমরা কোথায়' প্রকাশিত হয় একুশ বছর বয়সে কলেজ ম্যাগাজিনে। পরে 'পরীক্ষিৎ' ও 'শব্দযুগ' এই দুটি স্বসম্পাদিত লিটল ম্যাগাজিনের মাধ্যমেই বাংলা কথাসাহিত্যে অনিল ঘড়াইয়ের আত্মপ্রকাশ।

স্বাধীনতাত্তোর ভারতের আর্থ-সামাজিক প্রভাবে ক্লিষ্ট মানুষের জীবনেতিহাস এড়িয়ে সাহিত্য সৃষ্টি কোনো সাহিত্য-শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব ছিল না। ফলে দেশের দারিদ্র্য, বিত্তহীন জনগোষ্ঠী, সামাজিক অন্যায়ের চিত্র ও বিশ্লেষণ তাঁদের লেখার বিষয় হয়ে উঠেছিল। যাদের হাড়হাভাতের জীবন, দারিদ্র্য সীমার নিচে যাদের অবস্থান, যারা বুভুক্ষু, মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার— এমন মানুষদের সাক্ষাত মেলে অনিল ঘড়াইয়ের গল্পগুলির মধ্যে। অনিল ঘড়াইয়ের লেখনি থেকে বেরিয়ে এসেছে প্রায় সাড়ে তিনশোর বেশি ছোটগল্প। সেইসব ছোটগল্পে মূর্ত হয়েছে হরেক রকমের বাস্তব ছবি। গল্পকার নিখুঁত বর্ণনায় তুলে এনেছেন মাটির কাছাকছি মানুষের নিটোল সমাজজীবন। তাঁর দু-চারটি গল্প ছাড়া বাকি সব গল্পে বিস্তৃত পরিসরে বিকশিত হয়েছে এই বাংলার গ্রামীণ জীবন, বস্তি জীবন, খেটে খাওয়া, হত দরিদ্র, অসহায় মানুষের প্রকৃত সংগ্রামী জীবন। যাদের মধ্যে কেউ প্রান্তিক, কেউ আবার নিম্নবর্গীয় অথচ নিরীহ। সেই সমাজে বসবাসকারী মানুষদের অদ্ভুত জীবনযাত্রা, বিচিত্র পেশা আমাদের দেশের অনাবিষ্কৃত মানুষগুলির পরিচয় দেয়। যাদের কাছে 'বেঁচে থাকা মানে পেটপুরে খাওয়া,— নেশার সময় বান্ডিল দেড়েক বিড়ি, সের খানেক পাঁচুয়া আর লজ্জা ঢাকার আটহাতি ধুতি নয়ত খাকি প্যান্টলুন। ব্যস এতেই তার (নিধুর) দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে, রাত গড়িয়ে ভোর। ল্যাটাং ল্যাটাং গতরটা কেবল টেনে নিয়ে যাওয়া আর আসা' (লাস খালাস)। অনিল ঘড়াই জন্মসূত্রে দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ ছিলেন। তাই হয়তো স্বশ্রেণির দুঃখ, যন্ত্রণার অনুভূতি তাঁর গল্পগুলির মধ্যে রক্তিম হয়ে উঠেছে। তাঁর ছোটগল্পের প্রধান অবলম্বন দলিত, অন্ত্যজ, খেটে খাওয়া, ব্রাত্য জীবন ও নিম্নবর্গের মানুষ। সাহিত্যে এরূপ মানুদের জীবনীকার— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়েরা ছিলেন উচ্চবর্ণের মানুষ। অনিল ঘড়াই অন্ত্যজ মানুষের

প্রতিনিধি হয়ে তাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে সত্য অথচ শাণিত অভিজ্ঞতা ও মনন সঞ্জাত জীবনানুভূতি প্রকাশ করেছেন। যেখানে মানুষই তাঁর সমস্ত লেখার প্রধান উপজীব্য।

গল্পকার অনিল ঘড়াই নিজের লেখালেখি প্রসঙ্গে গল্পগ্রন্থের ভূমিকা 'আমার কথায়' বলেছেন—

> "মানুষ স্মৃতি নিয়ে বাঁচে, স্মৃতি তার সম্বল, অনেকটা মূল্যবান গয়নার মতো। স্মৃতির চোখ থাকে, দাঁত, মুখ, নখ সব। সাহিত্যে হেরে যাওয়া বলে কোনো শব্দ নেই। উৎসাহ প্রতিটি হৃদয়ে ঘুমন্ত নদী, সে জেগে উঠলে বসন্ত সমাগত হয়। দূর্বাঘাসের সংসারও মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। আমার ধারণা, গল্প তার নিজের পথ চিনে এগোয়। সকলেই জানেন সব লেখকের প্রতিটি লেখাই যন্ত্রণার ফসল।" [২২৪]

—এ হল গল্পকার অনিলের শিল্প পরিচয়ের রূপরেখা, প্রথানুগত গল্পকারদের বিপরীতে শিল্পী হয়ে ওঠার সুদৃঢ় প্রত্যয়। তাঁর গল্পগুলি যেন সত্যিই-'গল্প নয়, ভাঙা চোরা মানুষের সম্পূর্ণ হয়ে ওঠার মরণ পণ লড়াই।'

অনিল ঘড়াইয়ের গল্পের বেশিরভাগ চরিত্র খুবই জীবন্ত ও বাস্তব। নানাপেশায় যুক্ত অভাবী মানুষগুলির নিত্য সঙ্গী তাদের দারিদ্র্য। তাদের কেউ ভিক্ষা করে, কেউ পাতাল রেলে মাটি কাটে, কেউ চামার, কেউ ডোম হিসেবে বাঁশের শিল্পী, কেউ পাল্কি বাহক। তাছাড়া রয়েছে— চর্মকার, ঢাকী, কাকমারা, বাসের খালাসী, অন্ধ ভিখারী, যাত্রা শিল্পী, কাঁকড়া শিকারী, চোলাই মদ প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতা, কেউ হাপু খেলা দেখায়, কেউ আবার চোর।— এরা সবাই প্রকৃতি নির্ভর ভূমিহীন অসহায় অশিক্ষিত অথবা অল্পশিক্ষিত দরিদ্র মানুষ।

অনিল ঘড়াই অতি সাধারণ জীবনের কথা, জীবন সংগ্রামের কথা তাঁর গল্পে লিখেছেন। যে জীবনের ভেতর বিষাদ-বিরহ-দুঃখ-দারিদ্র্য-লাঞ্ছনা-ঘাত-প্রতিঘাত যেমন আছে তেমনি রয়েছে অকৃত্রিম প্রেম। বেঁচে থাকা ও বাঁচিয়ে রাখার স্বপ্নে বিভোর মানুষগুলির প্রতি দরদী মানসিকতায় অনিল পর্যবেক্ষণের সত্যকে প্রতিবেদনে রূপ দিয়েছেন। তাঁর গল্পে অবস্থিত চরিত্রগুলি অন্ত্যজ বা নিম্নবর্ণ সম্প্রদায়ের। সেই সব সম্প্রদায়ের নাম গৃহীত হয়েছে নদী, পাহাড়, পশু-পাখি, দেব-দেবী প্রভৃতির নামে। তাই কেউ জগা, কেউ বা ছকু, নিধু, কদমা, মেনীবুড়ি, ঢেঁকি, বঁচু, বাদলা, সনাতন, লারান, নুনা সামাড, বদনা, টিকলি, ভোগা, জগাই, কুনু, নোনা, ঠকরি, ঝগড়ু, বুদনি, ফেলনা, বুধরাম, লালী, ঘেরি, মুচিয়া, দশরথ, রামলাল— ইত্যাদি নামের ভেতর যেন স্বতন্ত্র ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। তাছাড়া তাঁর গল্পে নিজেদের পেশাসহ আচার-আচরণ, অভ্যাস, জীবন-চর্চা ও সংস্কারসহ উঠে এসেছে— বাগদী, ঝি, চাকর, চাষা, বাউল, খালাসী, কুষ্ঠরোগী, হাড়ি, ডোম, জেলে, দিনমজুরের মতো মানুষ তারাই স্বমহিমায়, অকপট ও বাস্তব চরিত্র চিত্রণে, গল্পের বয়ানে, উত্থানে-পতনে, ঘাত-প্রতিঘাতে, লড়াইয়ে ও প্রতিবাদে গল্পের বিন্যাসে ও নির্মাণ শৈলীতে জীবন্ত মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। এইসব মানুষদের প্রতি লেখকের আন্তরিকতা ধরা রয়েছে—

''আমাদের সমাজে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনধারার মধ্যে যে রকম বিদ্রোহ লক্ষ্য করি, সেটাই দেওয়ার চেষ্টা করি। এই দেশের শোষিত নির্যাতিত নিরানব্বই ভাগ মানুষ বিদ্রোহ করে পরোক্ষভাবে, আর প্রত্যক্ষভাবে শতকরা একজন। প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহ করতে চাইলেও অশিক্ষা, সংস্কার, দারিদ্র্য এবং একশ্রেণীর মানুষের ছলছাতুরির কাছে হেরে গিয়ে বিদ্রোহ রূপ বদলায়— প্যাসিভ হয়। আমার গল্পে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহ আছে। কিন্তু কম— যেহেতু মানুষগুলোর মধ্যেই সেই বিদ্রোহ কম। আমি আমার মস্তিষ্কেকে কোন চরিত্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিই না, বরং তাদের সমস্যা বুক দিয়ে অনুভব করার চেষ্টা করি। তাদের চোখ দিয়েই তাদের দেখার চেষ্টা করি।'' [২২৫]

বস্তুত এই সব মানুষগুলির প্রতি লেখক মনোযোগী থেকে সত্যের শিল্পরূপ দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে মহাশ্বেতা দেবী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ রায়, অভিজিৎ সেনেরা, এবং এদের কিছুপরে অনিলের সমসাময়িক ভগীরথ মিশ্র, নলিনী বেরা, সৈকত রক্ষিতেরা প্রায় একই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সমাজের নিচু তলার দলিত ও দরিদ্র মানুষদের কথা সাহিত্যে প্রতিফলিত করেছেন। তবে সেই বৃত্তের মধ্যে অনিল অবস্থান করে উপলব্ধির অন্তর্বয়নে গল্পের পরিধিকে যথেষ্ট সম্প্রসারিত করেছেন।

প্রকৃতি প্রেমিক অনিল ঘড়াইয়ের ছোটগল্পে মানুষের অন্তরঙ্গ যোগের পরিচয় রয়েছে। অপ্রাকৃত সংস্কার, অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের লৌকিক সংস্কার, বিশ্বাস ও জীবনযাত্রা তার অধিকাংশ সৃষ্টির পটভূমি। অন্ত্যজ শ্রেণির সামাজিকতা, অর্থনৈতিক দৈন্যতা, সামাজিক কুসংস্কার, তাদের লৌকিক জীবন, সমাজপতিদের অত্যাচার ও নিষ্পেষণ, অন্ত্যজ সমাজের প্রতি তীব্র অবজ্ঞা— এইসব প্রসঙ্গ তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তারই প্রতিফলন ঘটেছে ছোটগল্পে। এখানে তার বেশ কয়েকটি ছোটগল্প আলোচিত হল।

অনিল ঘড়াইয়ের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'কাক' (১৯৮২) প্রকাশকালে তাঁর বয়স ছিল চব্বিশ-পঁচিশ বছর। প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের ভূমিকায় লেখক লিখেছেন : 'একজন নতুন গল্পকার হিসেবে নিজের প্রথম গল্পগ্রন্থের ভূমিকা লিখতে ভয় হয়। জানি না পাঠক কিভাবে নেবেন, তবে তাঁদের কাছে আমার প্রত্যাশা অনেক। এই বিশ্বাস নিয়ে আমি গল্প নির্বাচন করেছি।' লেখকের সংশয় ও প্রত্যাশার সাথে দীর্ঘস্থায়ী এবং বাস্তবায়িত হয়েছে পথ চলার স্বপ্ন। তার অসংখ্য গল্প সৃষ্টি সে প্রমাণ দিয়েছে। 'কাক' গল্পের কাহিনি বিন্যাস, শব্দ নির্মাণ কৌশল সহজেই অনিলের যুগ ও অবস্থান চিনিয়ে দেয়। কাক গল্পের বক্তব্যটি ছিল পরিষ্কার। ক্ষুধার্ত দুপুরে গেঞ্জির কারখানায় ফিরে দেখে সমস্ত খাবার খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে কাক—

''আবর্জনার স্তূপের মধ্যে আমি দিব্যি শুনতে পাই, ঘড়ির পেন্ডুলামের মত ঘাড় নাড়িয়ে আমাদের আট বছরের ছোট ভাই পড়া মুখস্থ করছে : কাক জাতীয় নোংরা এবং পচা পশুপাখি খেয়ে সমাজের এবং আমাদের আশেপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার রাখে, এইজন্য কাককে ঝাড়ুদার পাখি বলা হয়। প্রভু আমাকে কাক করে দাও।'' (কাক)

শহর কেন্দ্রিক জীবন ভাবনার পাশাপাশি গ্রাম-শহরের মধ্যবর্তী নারী পুরুষের লোভাতুর জীবনের বিশ্বস্ততার প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন অনিল ঘড়াই। যখন পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে, মাথার উপরে চেনা আকাশ হারিয়ে যাচ্ছে তারই মধ্যে অস্তিত্বের মর্যাদা রক্ষায় কেউ কেউ নিজেকে ও নিজেদের প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। অখ্যাত কুশীলবদের ভাঙাচোরা জগতেই লেখক খুঁজেছেন। সংকেতবাহী ও রূপকের আধারে 'কটাশ' গল্পের কটাশ ও হংস লোক— অভিব্যক্তির সংরূপ বহন করে। গল্প কৃতিতে স্পষ্ট হয় নিছক দুর্গন্ধ ছড়ানো শিকারী পশু কটাশ নয়; সমাজে অবস্থিত লোভী বিবেকহীন নির্লজ্জ সুযোগসন্ধানী মানুষদের সার্থপরতার কথাই বলেছেন— 'কটাশ হল ভাম। ধূর্ত, সুযোগসন্ধানী পশু। জলে-স্থলে-বৃক্ষে সর্বত্র তার বিচরণ।' পরীযান ও কটাশ গল্পে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ভাষা নিম্নবর্গের মানুষদের অন্ত:স্বরের বিন্যাসে চলমান গানে জীবন্ত হয়েছে—

'পটাশপুরের কটাশ গো, ধড়িবাজের রাজা
কুঁকড়া ধরে, মৎস্য মারে,
তার হবে কি সাজা ?
বলি চলো গো, চলো গো— ও-ও
ধরিতে— এ-এ-এ।' [২২৬]

লেখক ব্রাত্যজনদের কথকতায় নাগরিক চাতুর্যকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। ফলে পাঠক অতি সহজেই নিরালোক ও নৈঃশব্দে চেতনার চারণভূমিতে পৌঁছে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির উৎস অন্বেষণে তৎপর হবেন।

'পরীযান' গল্পগ্রন্থের সব গল্পই গ্রাম্য জীবন নির্ভর। 'পরীযান' আসলে পাল্কী। বাংলাদেশে লুপ্তপ্রায় একটি লোকযান। এই গল্পে লেখক প্রতিকারহীন যন্ত্রণাদগ্ধ নারীর লাঞ্ছনার নিশ্ছিদ্র প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। হাগুরি-ময়না-মুচিয়া নামের মধ্যেই রুগ্ন ও অন্ধকার জীবন আভাসিত। গল্পে পরীযান এগিয়ে যায় বেহারাদের কাঁধে কাঁধে দুলকি চালে। আর সাথে সাথে এগিয়ে চলে একটি অঞ্চলের মানুষের আশা-হতাশা, দুটি গ্রাম্য প্রেমিক-প্রেমিকার ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস। দারিদ্র্যের তাড়নায় সুরেন জানা পরীযান কিনে নিয়ে পুরানো ভোল পাল্টে চাকচিক্যে সাজিয়েছে। হাত বদলের মতো পাল্টেছে দেশ-কাল-সমাজের ছবি, পথের ছবি। যে পথ মলিন হতশ্রী ব্রাত্য— সে পথে ছায়ারূপ মানুষেরা ধীর পায়ে হেঁটে যায়। সে পথে নতুন রূপে গোছানো পালকি অবাস্তবের উপস্থিতি নিয়ে বিরাজ করে। লেখক পরীযানের উজ্জ্বল উপস্থিতির বিপরীতে দেখিয়েছেন ময়না-হাগুরি-মুচিয়াদের প্রতিকারহীন অন্ধকারময় জীবনের রিক্ততাকে।

মূল্যবোধহীন সমাজের মৌলিক আবেদন ও মানবিক সম্পর্কগুলি অসাড় ও কুষ্ঠরোগের মতো জটিল সমস্যায় মূর্ত হয়েছে 'কুঠ' গল্পে। নিজের ছেলের বিয়ের ভোজে অনাহূত অবাঞ্ছিত, পরিত্যক্ত কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দশরথ আস্তাকুঁড়ের মধ্যে খাবার খুঁজতে গিয়ে অন্ধকারে ঠিকরে পড়ে যায়, আর এঁটো খাবার লোভে সেখানে কুকুর গুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে— এই উপস্থাপনায় শ্লেষ যেন তীব্র কশাঘাতে ঝলসে

ওঠে। সমাজ ও জীবনের প্রতি দশরথ ও রামচন্দ্র প্রশ্ন তুলে ধরেছে। লেখকের অন্তিম বাক্য— 'নিমেষে পশু আর মানুষের লড়াই-এ জমে উঠল আস্তাকুঁড়। মানুষের আর্তনাদ ক্রমশঃ টুঁটি টিপে ধরল সানাই-এর।'

'লাসখালাস' গল্পে নিধুডোম পুরুষানুক্রমে লাশ টানে। থানার বাবুদের কথা মতো চলতে গিয়ে, হাসপাতাল থেকে লাশ বহন করতে করতে ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্যের সঠিক সত্য পরিচয় সে পেয়েছে। গল্পকৃতির অন্তিমে নিধু ডোম নতুন মানুষ রূপে উপস্থিত হয়েছে গল্পকারের বাস্তবতার গুণে শৈল্পিক প্রতিবাদে—

> ''গোলামী করতে গিয়ে শিরদাঁড়া হারিয়ে ছিল তার বাপ। সেই দুঃখ সে এখনো ভোলেনি। তাহলে কেঁচোর মতো বেঁচে থেকে কি লাভ ? মস্ত ছাতির গাং'-এ নেমে নিধুর বুকের ছাতি বেড়ে যায়। 'ঢেউ'-এর মাথায় বাবুকে ভাসিয়ে দিয়ে টান টান হয়ে দাঁড়ায় বেত নুয়ানো ছিপছিপে মানুষটা।'' [২২৭]

'বগলাহুট' গল্পে দরিদ্র গ্রাম্য বালিকা গংগার ক্ষুন্নিবৃত্তির তাড়নার সুযোগে মালবাবুর যৌন নিপীড়নের নির্মম পরিচয় উপস্থাপিত। জেল ফেরৎ গংগার বাবা বদনা গংগার অন্তঃসত্তার খবর শুনে মালবাবুকে খুন করে। গংগারও সলিল সমাধি ঘটে। পুলিশ অত্যাচারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় পঁচিশটি চালাঘর পুড়িয়ে দেয়। রাজনৈতিক আবর্তে গংগার মতো গ্রামীণ মেয়ের জীবন ও যৌবন বাবুদের শিকারে পরিণত হয়, হারিয়ে যায়। গল্পকার মানবিক মূল্যবোধহীন অন্ধকারময় নগ্ন পচনশীল সমাজের কদর্য চিত্রকে ক্যামেরা বন্দি করেছেন। গল্পকারের শেষ কথা— 'মেয়েটির একটা ছবি নিলাম। পানা পুকুরের জল খেয়ে পেটটা একেবারে ঢোল। নো ড্রেস। যা কচি কচি বুক না . . .।'

'ভোটবুড়া' গল্পে কু-সংস্কার আচ্ছন্ন আটকুড়ো বুড়োও ভোটের বাজারে অপয়া না হয়ে পয়মন্ত ভোটারে সম্মানিত। সে ভোটার হিসেবে টাকা পায়। অন্যের বিবাহের বন্দোবস্ত করে দেয়। রাজনৈতিক চোরাপথে বাঁচার উপায় হিসেবে সংগ্রামী মনোভাব ও সংশয়কে লেখক তুলে ধরেছেন। 'বালিয়াড়ি' গল্পে অজ্ঞতার অন্ধকারে অবস্থিত মানুষগুলি কুষ্ঠ-বসন্তের মতো রোগকে পাপ বলে মনে করে। ঠাকুর দেবতার প্রতি অপবাদ ও অশ্রদ্ধার ভয়ে আতঙ্কিত হয়— 'বুড়ো শিবের অপনিন্দে করিসনে, মরবি। জিভ কাড়। নাক-কান ধর। তবে যদি তোর অপরাধ মার্জনা হয়।' 'লু' গল্পে লাল্টু-লালীর জীবনের দারিদ্র্য পীড়িত ভাঙাচোরা দুঃখের অন্ধকারময় ছবি পাঠককে অসহায় বিপন্ন বিস্ময়ে পৌঁছে দেয়। গল্পকার আঁচ ধরানো উনুনের ধোঁয়ায় নিম্নবর্গীয় সমাজ জীবনের প্রলয়কে ঢেকে দিয়েছেন— 'এত ধুঁয়ো তো আগে ছিল না ? চোখ দুটো আমার পুড়ে যাচ্ছে লালী। লালী শূন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে বলল, আমারও। বলেই সে আঁচলে চোখ মুছে নিল সহসা, লাল্টু দেখল— ধোঁয়া নয়, শোকের গরম কাজলে চোখ পুড়ে গেছে লালীর, তবু সেই চোখের আলোর জন্য কত তীব্র ছটফটানি।'

অনিল ঘড়াইয়ের শ্রেষ্ঠ একটি গল্প 'ন্যাসা বাগদি শেয়াল ধরতে যায়'। ন্যাসা বাগদি শেয়াল ধরতে গিয়ে শেয়ালের কামড় খায়, ক্ষতবিক্ষত হয় তার শরীর। কিন্তু তাতেও তার রাগ বা দুঃখ নেই। দুঃখ

তার অন্য জায়গায়। শেয়াল শিকারে বাবুর পিছু পিছু ন্যাসা গিয়েছিল। গামবুট পরে, ন্যাকড়ার টুপি মাথায় দিয়ে বাঁশ পাতার উপর মচর মচর শব্দ তুলে বাবু এগিয়ে চলেছেন। ন্যাসা শেয়াল ধরতে যায় আর তার দৈন্যদশা তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। যে দৈন্যতার সুযোগ নিয়ে বর্বর মানুষের দল প্রতিনিয়ত নিজেদের ভোল বদল করে। ন্যাসা স্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে দেখতে পায় বনের শেয়ালের মতো ভদ্র সমাজের মধ্যেও অনেক ভদ্র প্রতারক ছদ্মবেশী মানুষরূপী শেয়ালরা রয়েছে। সেই মানুষের প্রতিনিধি বাবু শেয়াল ধরতে গিয়ে ন্যাসা বাগদির থেকে বিশহাত দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। এমনকি বিষ্ণুপদও শেয়াল ধরেনি। কিন্তু বিষ্টুপদ শেয়ালটার গলায় দড়ি বেঁধে টানতে টানতে গাঁ-মুখো নিয়ে যায়। এই দৃশ্য দেখে গাঁয়ের জনা পঞ্চাশেক লোক। আর বাবু শেয়াল ধরে বউকে দেখাতে চেয়েছে বীরত্বের পরিচয় স্বরূপ। আর বাবুর বউ শহরের মেয়ে বলে শেয়াল দেখেনি তাই এই শেয়াল ধরা।

শেয়াল ধরে বিষ্টু গাঁমুখো হতেই রক্তাক্ত শরীরের যন্ত্রণা নিয়ে ন্যাসা ভেবেছে— 'তাকেই দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।' শেয়ালের কামড় খেলে কি হয় তা ন্যাসার যেমন জানা ছিল তেমনি বাবুও জানতেন। বাবু অভয় দিয়ে বলেছেন ক্ষতস্থানে লোহা পুড়িয়ে ছ্যাঁকা দিলে বিষ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে ন্যাসা কেবল বাবুদের কাছে জীবন বন্ধক রেখে বাঁচতে চেয়েছিল এভাবে ক্ষতবিক্ষত হতে চায়নি। সে বিষ্টুপদর কথায় গর্জে উঠেছিল। কিন্তু সে অসহায় সমাজের কাছে। আর এই সব শোষকদের কাছে। তাই ভেবেছে 'শুকিয়ে মরার চেয়েও শেয়ালের কামড় ঢের ভাল।' নিষ্পাপ অসহায় ন্যাসা— "মেয়ের হাতটা জড়িয়ে ধরে হাউ-হাউ কেঁদে ওঠে, 'এ বিটি, সর্বত্র ক্ষেপা শেয়াল, আমি কুথায় পালাই বলদিনি ?'' এই জিজ্ঞাসার উত্তর সে পায় না। কিন্তু তাকে শান্ত করার জন্য তার বিক্ষত শরীরে সাময়িক প্রলেপ দিতে বাবু ন্যাসাকে বলে, 'তোর মেয়েটাকে আজ রাতে পাঠিয়ে দিস্। একটা ধুতি আর দু'সের চাল দেব।' তখন ন্যাসার শেয়াল চেনা যে কত সঠিক, সত্য ও স্পষ্ট, অর্থবহ, তা পাঠকের দৃষ্টির সামনে উজ্জ্বল হয়ে যায়— এই প্রত্যক্ষ সত্য ছবির রূপকার অনিল ঘড়াই। এ গল্প যেমন সুবেশধারী সামাজিক মানুষদের ভদ্র মুখোশ টেনে খুলে দেয়, তাদের ঘৃণ্য ও নগ্ন চেহারা বেরিয়ে পড়ে তেমনি আমাদের প্রতিবাদী সত্তা সচেতন হয়— জাগ্রত হয়।

গল্পকারের নির্মিত চরিত্রগুলি সংস্কারহীন মুক্তবিশ্বে ডানা মেলতে চায়। কিন্তু সামাজিক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও অজ্ঞতায়, অল্পশিক্ষিত অশিক্ষিত দারিদ্র্যপীড়িত ভুখাতুর রাঢ় বঙ্গের প্রকৃতিনির্ভর মাটির কাছাকাছি অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষগুলি ক্রমশ অস্তিত্বের সংকটে দিশাহীন। এইসব মানুষেরা নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-নীতি, জিনচর্যা, অতিপ্রাকৃতশক্তিকে সম্বল করে জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব সংস্কৃতি বহন করে চলে। গল্পকারের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি ও মননে সূক্ষ্ম ক্যামেরায় সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলি বৃত্তায়িত হয়েছে নানাভাবে। এই সংস্কারের সজীব ও সচলধারা শিক্ষিত সমাজে চরম বিস্ময়।

আজ বিশ্বায়ন ও উত্তর আধুনিকতার এই যুগে অধরামাধুরীকে যেন অতি সহজেই ছোঁয়া যায়, পাওয়া যায়। কিন্তু হাজার বছরের সুপ্রাচীন মনুস্মৃতির শেকড় ও তার ক্রমবর্ধমান সম্ভাবনা যেন অত্যন্ত সহজ ও নগ্নভাবে অনিল ঘড়াই তার গল্পে তুলে ধরেছেন। পরীযান, কাঁকড়া, কুঠ, চাতক, লাসখালাস,

উরাঙ্গাড়া প্রভৃতি গল্প পড়লে মনে হবে সমাজের অগ্রগতি যেন স্লথ হয়ে গেছে। আসলে অনিলের পৃথিবী অন্য এক পৃথিবী। যে পৃথিবীর মানুষেরা অনিলের পূর্বে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মন-এর মতো লেখকের কলমে বেঁচে রয়েছেন। অনিল সমকালের অসাধারণ প্রতিকৃতিতে প্রতিটি তুলির টানে অত্যন্ত মুন্সিয়ানার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন দলিত, অন্ত্যজ, ব্রাত্যজীবনে খেটে খাওয়া, নিম্নবৃত্ত মানুষদের দুঃখ-দুর্দশা। যা অনিলের শৈল্পিক লেখনি কৌশলে নন্দনতত্ত্ব ও সৌন্দর্য সুষমায় উজ্জ্বল।

সূত্রনির্দেশ

১. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, ২য় খণ্ড, রবীন্দ্র লাইব্রেরী, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৫২

২. আদিত্য মুখোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর : সময় ও সমাজ, পান্ডুলিপি, ২য় সং, ২০০৫, কলকাতা-৯, পৃ. ১১

৩. পশ্চিমবঙ্গ, সম্পাদক- দিব্যজ্যোতি মজুমদার, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা, বর্ষ- ৩১, সংখ্যা ৫-৯, ১৯৯৭, পৃ. ৩৮

৪. তদেব, পৃ. ১৮

৫. তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ, (তৃতীয় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, ২০০৫, পৃ. ১০৫

৬. তদেব, পৃ. ৯৭

৭. তদেব, পৃ. ৯৯

৮. তদেব, পৃ. ১০১

৯. তদেব, পৃ. ১০৯

১০. তদেব, পৃ. ১১৪

১১. তদেব, পৃ. ১১৭

১২. তদেব, পৃ. ১১৮

১৩. তদেব, পৃ. ৮৩৫

১৪. তদেব, পৃ. ১৩২

১৫. তদেব, পৃ. ১৩২

১৬. তদেব, পৃ. ১৩৩

১৭. তদেব, পৃ. ১১৯

১৮. তদেব, পৃ. ১২০

১৯. তদেব, পৃ. ১২১

২০. তদেব, পৃ. ১২৩

২১. তদেব, পৃ. ১২৩

২২. তদেব, পৃ. ১২৪

২৩. তদেব, পৃ. ১৭৬

২৪. তদেব, পৃ. ১৮৯

২৫. তদেব, পৃ. ১৯৩

২৬. তদেব, পৃ. ১৮২

২৭. তদেব, পৃ. ১৯০

২৮. তদেব, পৃ. ২২৮

২৯. তদেব, পৃ. ২৩১

৩০. তদেব, পৃ. ২৩৭

৩১. তদেব, পৃ. ২৩৯

৩২. তদেব, পৃ. ২৪৫

৩৩. তদেব, পৃ. ২৫০

৩৪. তদেব, পৃ. ২৫০

৩৫. তদেব, পৃ. ২৫১

৩৬. তদেব, পৃ. ২৫৩

৩৭. তদেব, পৃ. ২৫৬

৩৮. তদেব, পৃ. ২৫৭

৩৯. তদেব, পৃ. ২৬৪

৪০. তদেব, পৃ. ৩১২

৪১. তদেব, পৃ. ৩৫৪

৪২. তদেব, পৃ. ৩৫৬

৪৩. তদেব, পৃ. ৩৫৭

৪৪. তদেব, পৃ. ৩৫৮

৪৫. তদেব, পৃ. ৩৬১

৪৬. তদেব, পৃ. ৩৬৩

৪৭. তদেব, পৃ. ৮৪৩

৪৮. তদেব, পৃ. ৮৫২

৪৯. তদেব, পৃ. ৪২২

৫০. তদেব, পৃ. ৪২৮

৫১. তদেব, পৃ. ৪৩০

৫২. তদেব, পৃ. ৪৫৪

৫৩. তদেব, পৃ. ৪৫৫

৫৪. তদেব, পৃ. ৪৫৬

৫৫. তদেব, পৃ. ৪৬৪

৫৬. তদেব, পৃ. ৫০৫

৫৭. তদেব, পৃ. ৫১০

৫৮. তদেব, পৃ. ৮১২

৫৯. তদেব, পৃ. ৮০৩

৬০. তদেব, পৃ. ৮০৫

৬১. তদেব, পৃ. ৮১২

৬২. তদেব, পৃ. ৮১৮

৬৩. গুণময় মান্না, গল্প সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, এবং মুশায়েরা, প্রথম প্রকাশ, ২০১২, পৃ. ১৪৪

৬৪. তদেব, পৃ. ২১৪

৬৫. তদেব, পৃ. ৩৯২

৬৬. তদেব, পৃ. ৩৮

৬৭. এই সময়, সংবাদপত্র, ২৯ জুলাই ২০১৬

৬৮. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, অষ্টম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৩, অগ্নিগর্ভের ভূমিকাংশ, পৃ. ৩২৫

৬৯. তদেব, পৃ. ৩২৫

৭০. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, নবম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৩, গ্রন্থ প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৫৬

৭১. তদেব, পৃ. ৪২১

৭২. তদেব, পৃ. ৪১৫

৭৩. মহাশ্বেতা দেবী, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ২য় সং, জানুয়ারি, ২০০৯, পৃ. ৪৯

৭৪. তদেব, পৃ. ৯

৭৫. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, দ্বাদশ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৩, পৃ. ৫৯০

৭৬. মহাশ্বেতা দেবীর প্রেমের গল্প, বাণীশিল্প, ২০০৪, ভূমিকা, পৃ. ২০

৭৭. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, ত্রয়োদশ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৪, পৃ. ৫০৬

৭৮. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, নবম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৩, পৃ. ৫১২

৭৯. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, দশম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৩, পৃ. ৪৩০

৮০. মহাশ্বেতা দেবী, রচনাসমগ্র, চতুর্দশ খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, ২০০৪, পৃ. ৩৬৮

৮১. তদেব, পৃ. ৩৬৮

৮২. তদেব, পৃ. ৩৭৪

৮৩. তদেব, পৃ. ৩৭০

৮৪. ভগীরথ মিশ্র, শ্রেষ্ঠ গল্প, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ২০০২, পৃ. ২৫৯

৮৫. তদেব, পৃ. ২৫৯

৮৬. তদেব, পৃ. ২৪৯

৮৭. তদেব, পৃ. ২৪৬

৮৮. তদেব, পৃ. ১৭০

৮৯. তদেব, পৃ. ১৯৩

৯০. তদেব, পৃ. ২১৭

৯১. তদেব, পৃ. ২২৮

৯২. অমর মিত্র, পঞ্চাশটি প্রিয় গল্প, সাহিত্যম্, প্রথম প্রকাশ, ২০১০, পৃ. ৪৯৯

৯৩. তদেব, পৃ. ৫০১

৯৪. তদেব, পৃ. ৩৭৬

৯৫. তদেব, পৃ. ৩৪

৯৬. তদেব, পৃ. ৩৭

৯৭. তদেব, পৃ. ৯৪

৯৮. তদেব, পৃ. ৯৪

৯৯. তদেব, পৃ. ৯৮

১০০. তদেব, পৃ. ২৪০

১০১. মানব চক্রবর্তী, সমীপেষু, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩, পৃ. ৫৩

১০২ তদেব, পৃ. ৫৯

১০৩. তদেব, পৃ. ৬১

১০৪. তদেব, পৃ. ৭

১০৫. তদেব, পৃ. ৮

১০৬. তদেব, পৃ. ১০

১০৭. তদেব, পৃ. ১৬

১০৮. তদেব, পৃ. ১৭

১০৯. তদেব, পৃ. ২৩

১১০. তদেব, পৃ. ২৬

১১১. তদেব, পৃ. ২৮

১১২. তদেব, পৃ. ২৮

১১৩. তদেব, পৃ. ২৯

১১৪. তদেব, পৃ. ৩৩

১১৫. তদেব, পৃ. ৩৩

১১৬. তদেব, পৃ. ৩৫

১১৭. তদেব, পৃ. ৩৭

১১৮. তদেব, পৃ. ৬২

১১৯. তদেব, পৃ. ৬৪

১২০. তদেব, পৃ. ৬৭

১২১. তদেব, পৃ. ৭২

১২২. তদেব, পৃ. ৭৪

১২৩. তদেব, পৃ. ৭৭

১২৪. তদেব, পৃ. ৮২

১২৫. তদেব, পৃ. ৮৮

১২৬. তদেব, পৃ. ৮৮

১২৭. তদেব, পৃ. ৮৯

১২৮. তদেব, পৃ. ৮৯

১২৯. তদেব, পৃ. ৯০

১৩০. তদেব, পৃ. ৯২

১৩১. তদেব, পৃ. ৯৫

১৩২. তদেব, পৃ. ৯৮

১৩৩. তদেব, পৃ. ১০০

১৩৪. তদেব, পৃ. ১৭৭

১৩৫. তদেব, পৃ. ১৭৯

১৩৬. তদেব, পৃ. ১৮২

১৩৭. তদেব, পৃ. ১৮৩

১৩৮. তদেব, পৃ. ১৮৩

১৩৯. তদেব, পৃ. ১৭০

১৪০. তদেব, পৃ. ১৭৩

১৪১. তদেব, পৃ. ১৭৪

১৪২. তদেব, পৃ. ১৭৪

১৪৩. তদেব, পৃ. ১৭৫

১৪৪. তদেব, পৃ. ১৭৫

১৪৫. তদেব, পৃ. ১২৪

১৪৬. তদেব, পৃ. ১২৪

১৪৭. তদেব, পৃ. ১২৫

১৪৮. তদেব, পৃ. ১২৫

১৪৯. তদেব, পৃ. ১২৯

১৫০. তদেব, পৃ. ১৩২

১৫১. তদেব, পৃ. ১৩৪

১৫২. তদেব, পৃ. ১৩৫

১৫৩. তদেব, পৃ. ১৩৫

১৫৪. নলিনী বেরা, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. XXIII-XXIV

১৫৫. দেবেশ কুমার আচার্য, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (আধুনিক যুগ), ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, ২০১০, পৃ. ১১৯৯-১২০০

১৫৬. নলিনী বেরা, শ্রেষ্ঠ গল্প, করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, ২০০৩, পৃ. ৯২

১৫৭. তদেব, পৃ. ১০৯-১১০

১৫৮. তদেব, পৃ. ১১৫

১৫৯. তদেব, পৃ. ১৬৯-১৭০

১৬০. তদেব, পৃ. ১২৪

১৬১. তদেব, পৃ. ৪৬

১৬২. সৈকত রক্ষিত, উত্তর কথা, সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, পারুল, ২০১৫, পৃ. ৭

১৬৩. সৈকত রক্ষিতের দশটি গল্প, লেখকের কথা, পরশপাথর প্রকাশন, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ,

১৬৪. সৈকত রক্ষিত, উত্তর কথা, সৈকত রক্ষিতের নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ, পারুল, ২০১৫, পৃ. ১২

১৬৫. তদেব, পৃ. ২২

১৬৬. তদেব, পৃ. ২৩

১৬৭. তদেব, পৃ. ২৪

১৬৮. তদেব, পৃ. ৩৪

১৬৯. তদেব, পৃ. ৮৮

১৭০. তদেব, পৃ. ৮৮

১৭১. তদেব, পৃ. ৯০

১৭২. তদেব, পৃ. ৯২

১৭৩. তদেব, পৃ. ১২৫

১৭৪. তদেব, পৃ. ১২৭

১৭৫. তদেব, পৃ. ১৭২

১৭৬. তদেব, পৃ. ১৭৬

১৭৭. তদেব, পৃ. ১৭৫

১৭৮. তদেব, পৃ. ৪১-৪২

১৭৯. তদেব, পৃ. ৪৪

১৮০. তদেব, পৃ. ২৪৮

১৮১. তদেব, পৃ. ২৫৩

১৮২. তদেব, পৃ. ২৯৮

১৮৩. তদেব, পৃ. ২০১

১৮৪. তদেব, পৃ. ২০৪

১৮৫. তদেব, পৃ. ৭৪

১৮৬. তদেব, পৃ. ৮৩

১৮৭. তদেব, পৃ. ৮৪

১৮৮. তদেব, পৃ. ৩৫৪

১৮৯. তদেব, পৃ. ৩৫৬

১৯০. তদেব, পৃ. ৩৬৩

১৯১. তদেব, পৃ. ৩৬৭

১৯২. তদেব, পৃ. ৩৭৯

১৯৩. তদেব, পৃ. ৩৩৫

১৯৪. তদেব, পৃ. ৩৩৫

১৯৫. তদেব, পৃ. ৩৩৭

১৯৬. তদেব, পৃ. ৩৩৯

১৯৭. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, গাঁ ঘরের কথা

১৯৮. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৪

১৯৯. তদেব, পৃ. ৮

২০০. তদেব, পৃ. ১২

২০১. তদেব, পৃ. ৭৬

২০২. তদেব, পৃ. ৭৭

২০৩. তদেব, পৃ. ৮৪

২০৪. তদেব, পৃ. ৮৫

২০৫. তদেব, পৃ. ২৪৭

২০৬. তদেব, পৃ. ৪৯

২০৭. তদেব, পৃ. ১০৮

২০৮. তদেব, পৃ. ১১০

২০৯. তদেব, পৃ. ১১১

২১০. তদেব, পৃ. ১১২

২১১. তদেব, পৃ. ১১২

২১২. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, কথাযাত্রার তিনদশক, সম্পাদনা দীপঙ্কর মল্লিক ও দেবারতি মল্লিক, দিয়া পাবলিকেশান, ২০১৩, পৃ. ১৮৪

২১৩. রামকুমার মুখোপাধ্যায়, গল্প সমগ্র, মিত্র ও ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩০৭

২১৪. তদেব, পৃ. ৪৩৯

২১৫. তদেব, পৃ. ৩৭৬

২১৬. তদেব, পৃ. ৩৭৬

২১৭. তদেব, পৃ. ৩৭৮

২১৮. তদেব, পৃ. ২৬

২১৯. তদেব, পৃ. ৩৬

২২০. তদেব, পৃ. ৩৮

২২১. তদেব, পৃ. ৩৯

২২২. তদেব, পৃ. ২৭৫

২২৩. তদেব, পৃ. ২৮৩

২২৪. সৃজন, অনিল ঘড়াই বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদক লক্ষ্মণ কর্মকার, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ২০১৪, পৃ. ৭৮

২২৫. শাশ্বত ছিন্নপত্র, সম্পাদক– ড. সুস্নাত জানা, ভবেশ বসু, শঙ্খশুভ্র পাত্র, সুনীল মাজি, অনিল ঘড়াই সংখ্যা, জুন, ২০০৪, পৃ. ৪৩৫

২২৬. অনিল ঘড়াই, পরিযান ও অন্যান্য গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১ম সং, জানুয়ারি, ২০০৩, পৃ. ২৯১

২২৭. তদেব, পৃ. ৫৭